মুক্তির স্বাদ

শংকর

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

রেল-অফিসের শিবুদা
শ্রীশিবেন বসু-কে
যাঁর একটি মন্তব্য থেকে
এই উপন্যাসের উৎপত্তি।

ওঁ নমঃ বিষ্ণুঃ।

হে ঠাকুর, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তুমি সর্বদা আমার সহায় হও, আমাকে রক্ষা করো।

—আমি সুশোভন বাগচী অনেকদিন পরে মূল্যবান সংস্কৃত মন্ত্রটা বিড়বিড় করে বলে ফেললাম।

বেশ কয়েক বছর আগে প্রথম বিদেশ যাবার সময় মা আমাকে প্রায় জোর করে এই প্রার্থনাটা শিখিয়েছিলেন। মা তখনই জানতেন, প্রার্থনা-ফার্থনা আমার ধাতে আসে না। আমি বিশ্বাস করি, ঘটনা-পরম্পরায় মহাশক্তিমান সময় এই পৃথিবীতে এগিয়ে চলেছে। কার কী হলো তা নিয়ে কান্নাকাটি করার মতিগতি এই বিশ্বভুবনে কারও নেই, এখানে যার যা হবার তাই হবে। 'কে সেরা সেরা' হোয়াটেভার উইল বি উইল বি—লর্ড বিষ্ণুর চরণকমল চোখের জলে ধুইয়ে ফেললেও তিনি অঘটন নিবারণ করতে পারবেন না।

কিন্তু আমার মা, অর্থাৎ গর্ভধারিণী জননী সেই বিদায় দিনে কিছুতেই শুনলেন না। অতি দুর্বলভাবে আমার হাত ধরে কোমল কণ্ঠে আবেদন করলেন, "আয় বাবা, আজ দুষ্টুমি করিস না।" মা তখনও ভাবছেন, মুখে যাই বলি মনে আমি ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাসী নই। আমি জানি একমাত্র পদ্মনাভ নারায়ণই স্থিতির ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আমাদের সকলকে রক্ষা করতে পারেন। আমার মায়ের অন্ধ বিশ্বাস, বিষ্ণু বধির নন, বাগচী পরিবারের সব প্রার্থনা তাঁর কানে অবশ্যই পৌঁছয়।

দেশ থেকে বিদায়ের সেই দিনে আমি অবশ্যই বেপরোয়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু মায়ের শরীরের স্নেহময় স্পর্শ আমাকে মনে করিয়ে দিলো তিনি বেশ দুর্বল, রোগজর্জরিত ক্ষীণ দেহে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, আমাকে নড়াতে না পারলেও। আমার হঠাৎ তখনই মনে হলো, আমাদের দেশের মেয়েদের যে 'শক্তি' বলা

হয়েছে ওটা বিরাট এক ধাপ্পা! সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাল বুঝে এই উপমহাদেশের মেয়েদের ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিলেও, সেই অনুযায়ী শারীরিক সামর্থ্য দেননি। আমার মনে হয়েছিল, লাল সিঁদুর পরা আমার এয়োস্ত্রী মায়ের দৈহিক সামর্থ্য থাকলে সেদিন সদর্পে আমাকে পাঁজাকোলা করে গৃহদেবতার কাছে নিয়ে যেতেন, যেমন তিনি আমাকে অবলীলাক্রমে তুলে নিতেন আমার শৈশবে।

আমি শ্রীসুশোভন বাগচী ওরফে বাদল এরপর অবশ্য অবাধ্য থাকতে পারিনি। মনকে বুঝিয়েছি, আমি কী বিশ্বাস করি তার সঙ্গে আমার কথাবার্তার মিল থাকবে এমন প্রত্যাশা এদেশে, বিশেষ করে এই হাওড়া গুলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনে কে করে? আমি মায়ের শরীরের টান অনুযায়ী এগিয়ে চললাম, খুরুটা ফ্রেমার্সে সযত্নে বাঁধানো ঘরের কোণে রাখা ভগবান বিষ্ণুর ছবির সামনে দাঁড়ালাম এবং মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী বললাম, "ওঁ নমঃ বিষ্ণুঃ…"

মন্ত্রটা কয়েকবার আবৃত্তি করিয়ে ব্যাপারটা আমার মনে স্থায়ী করে দেবার অসহায় চেষ্টা করলেন আমার গর্ভধারিণী। বললেন, "যখনই বাবা জাহাজে উঠবি, উড়োজাহাজে চড়বি, যখনই বিদেশের রাস্তায় গাড়ি চালাবি তখনই আমার ঠাকুরকে ডেকে নিস।" এরপর জননী একটা কাগজের মোড়কে আমার বুক-পকেটে কিছু শুকনো ফুল ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—পুত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য দেবাদিদেব বিষ্ণু যে জননীর কাছ থেকে আগাম পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন তার অভিজ্ঞানপত্র!

তারপর এই ক'বছরে পৃথিবীর পথে-পথে কত ঘুরে বেড়িয়েছি, হতভাগা এই দেশের বিষাক্ত বাতাস থেকে সরে গিয়ে বিদেশের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু 'বিষ্ণুবাবুকে' কখনও স্মরণ করিনি। মা যদি অন্ধ বিশ্বাসে ঠকেছেন তো ঠকুন। ওঁর আগাম ঘুষের রসিদ আমার মানি-ব্যাগের এককোণে পুঁটুলি পাকিয়ে এতো বছর ধরে রয়েছে, ঠিক হ্যায়। কিন্তু লর্ড বিষ্ণু, আমি আর গাড়িতে উঠে প্রতিবার তোমার পায়ে মাথা ঠুকছি না!

আমি একবার ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে ছিলাম। আমার পাশের সীটেই ছিলেন কলকাতার একজন আধা-বাঙালী ব্যবসাদার, লেনিনের সেবকরাও আজকাল যাঁদের 'শিল্পপতি' নাম দিয়ে লাল-সেলাম জানান! দেখলুম, এই ভদ্রলোক বোয়িং ৭৪৭ রানওয়েতে চলমান হওয়া মাত্রই অ্যাটাচি কেস থেকে একখানা পকেট-সাইজের দেবনাগরী হরফে লেখা বই বের করে কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করে বইটিকে আলতো-আলতো আদর করতে লাগলেন গার্ল ফ্রেণ্ডের মতন। বিমান আকাশে উড্ডীয়মান হয়ে নো স্মোকিং সাইন না নেভা পর্যন্ত চলতে লাগলো গ্রন্থচুম্বন প্রক্রিয়া। তারপর অধিকতর উষ্ণ আর একটি চুম্বন দিয়ে, একটু বুকে ঠেকিয়ে ভদ্রলোক বইটিকে আবার অ্যাটাচি কেসের ভিতর চালান করলেন। আন্দাজ করলাম, হয় গৃহিণী, না-হয় গুরুদেবের নির্দেশ! সাফারি পরিহিত এই ভূতপূর্ব 'বড়োবাজারিয়া' এবং বর্তমানে ক্যামাক স্ট্রীটওয়ালা চলেছেন সাগরপারে আধুনিক টেকনলজির সন্ধানে, এদেশে এখন 'হাইটেক' নামে যার অতিমাত্রায় কদর।

সাফারি স্যুটওয়ালাকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সঙ্গে এইসব ওং ভোং চলে?"

সাফারি আমার প্রশ্নে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন! নিজেকে সামলে নিয়ে যে লেকচারটি দিয়েছিলেন তার সারমর্ম হলো: "ইণ্ডিয়া হচ্ছে সমন্বয়ের দেশ, এখানে সব একসঙ্গে চলে। গণতন্ত্রের সঙ্গে ফিউডালতন্ত্র, দুধের সঙ্গে পানি, ত্যাগের সঙ্গে ভোগ, সত্যের সঙ্গে মিথ্যা —নো সমস্যা! এর সঙ্গে ওর মিশ খায় না ওসব পশ্চিমী ভুল ধারণা! মেশাতে জানলে সব মিশে যায়। হাইটেক আমি কিনতে চাই আমার কারখানার জন্যে—খরচ কমবে, উৎপাদন ভাল হবে, মুনাফা বাড়বে। কিন্তু বিপদ নাশের জন্য মন্দির থেকে পণ্ডিতজী যে বই দিয়েছেন তা পাক্কা বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে বেনারসী পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করে দিয়েছেন। ফরেন থেকে ফেরার পরে ওই বই আবার ফিরে যাবে পণ্ডিতজীর কাছে ব্যাটারির মতন রি-চার্জ হতে। বাধা কোথায়? আর

যদি স্বয়ং কিষণজীর কাছ থেকে বিদেশবিভুঁইয়ে স্পেশাল সুরক্ষা পাওয়া যায় তাতেই বা আপত্তি কোথায়?”

এই হচ্ছে আবহমান কালের ইণ্ডিয়া! বলবার কিছু নেই—একেবারে সব দিক বাঁধা। আমার মা মিনতি দেবীকে এককালে বাধা দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে, আমি ওসব ওং ভোং-এ বিশ্বাস করি না বলে কী লাভ করেছি? মনোকষ্ট ও মায়ের চোখের জল ছাড়া কিছুই পাইনি—মা আগেও যেমন বিষ্ণুকে আঁকড়ে ছিলেন আমার বিদ্রোহের পর আরও বেশী আঁকড়ে ধরলেন। ঠাকুরকে বললেন, ও এখনও বালক, ওর কোনো দোষ নিও না ঠাকুর।

কিন্তু মজাটা দেখুন! মা যখন হাল্কা নীল ফরেন এয়ার লেটার ফর্মের চিঠিতে মনে করিয়ে দিতেন, উড়োজাহাজে উঠে মন্তরটা বলিস তো বাবা? অমনি আমি আবার বেঁকে বসতাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাকে লিখতাম, “উড়োজাহাজ যখন রানওয়েতে নড়ে ওঠে তখন জেট প্লেন থেকে বেজায় আওয়াজ হয়। ঠাকুর শুনতে পাবেন তো?” মা কষ্ট নিশ্চয় পেতেন, কিন্তু কষ্টের বদলে কি করে অন্যকে কষ্ট দিতে হয় সে-শিক্ষা না-থাকায় আরও ভয় পেয়ে যেতেন। প্রতি চিঠিতে আমাকে অনুনয়-বিনয় করতেন কথা শোনার জন্যে, ঠাকুরকে না চটাতে।

বহুদিন আগে এই শহর থেকে বিমানে বিদায় নেবার মুহূর্তে আমি জানালা দিয়ে দমদম এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দোতলায় ভিজিটরস্ গ্যালারির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আমার মা যে ঐখানে গভীর রাতেও অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তা আমি জানতাম। আমি আরও বুঝতাম, আমার বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বউকে বলছেন, “আর কি? প্লেনের ভিতর থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, এবার বাড়ি ফেরা যাক।” আমি জানি, মা তার উত্তরে কিছু না বলেই হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন দূরের প্লেনটার দিকে। যতক্ষণ না ওই প্লেন বিশাল পাখা মেলে নীল আকাশে অদৃশ্য হয়ে

যাচ্ছে ততক্ষণ আমার পূজনীয় পিতৃদেব কিছুতেই তাঁকে বিমানবন্দর থেকে নড়াতে পারবেন না।

তখনও আমি মাকে ফাঁকি দিয়েছি। ওই ওং ভোং বিষ্ণুদেবতাকে আবেদন-নিবেদন করে লোক হাসাতে আমি পারবো না, সে আমার কোষ্ঠিতে যতই ফাঁড়ার ইঙ্গিত থাক।

এবার কিন্তু দমদম থেকে প্লেনে চড়েও আমি ওই দর্শকদের গ্যালারির দিকে তাকাচ্ছি না। তাকাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওখানে এবার আমার জন্যে কে অপেক্ষা করে থাকবে ?

তবু বোকামি করে কেন যে প্লেনে জানালার ধারের সীট চেয়ে নিয়েছিলাম তা একমাত্র ভগবানই জানেন ! আমি এই মুহূর্তে শরীরটাকে সীটের ওপর ভাসিয়ে রাখতে চাই। হঠাৎ যেন মনে হচ্ছিল, মনের মধ্যে এতো ভাবনা-চিন্তার বোঝা, শরীরটাও নিশ্চয় অনেক ভারি হয়ে রয়েছে। এই শরীর মহাশূন্যে ভেসে থাকবে কী করে ? ভাসা তো সম্ভব নয়।

"এক-একটা চিন্তা যেন এক একখানা ভারি পাথর," আমার মা বলতেন। কিন্তু পাথরগুলোকে লাথি মেরে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার কোনো চেষ্টা তিনি করতেন না। ডানায় জগদ্দল পাথর বেঁধে দেওয়ায় পাখির যে কষ্ট হচ্ছে তাও মুখ ফুটে পাখি বলতো না।

"এই পাখি ভারতীয় উপমহাদেশে, কেবল এই বাংলাতেই জন্ম নেয়, মা," আমি নিজের বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে একবার বিদেশ থেকে মাকে লিখেছিলুম। আমার মা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতন পরবর্তী চিঠিতে বাবার শরীরের কথা, মাথা ব্যথা বাড়ার কথা, হারুকাকার সঙ্গে বিজনেসে দুশ্চিন্তার কথা সব খুলে লিখলেন, কিন্তু একবারও নিজের পাখায় বেঁধে দেওয়া পাথরগুলোর উল্লেখ করলেন না। আমি ফরেন এয়ারলেটার ফর্মে মায়ের আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, লিখতে তাঁর কষ্ট হয়েছে—সারা জন্ম তো কাউকে প্রাণ খুলে মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ-সুবিধে পাননি। ছেলেকে যে একদিন

অনেক দূর থেকে অনেক কথা লেখার তাগিদ হবে তাও হিসেবের মধ্যে ছিল না, সুতরাং বানান ভুল হতো, হাত কাঁপতো এবং অযথা অজস্র কষ্ট পেতেন।

মায়ের ভরসা ছিল শুধু দেবতার ওপর। আর বিশ্বাস ছোটবেলায় দিদিমার কাছে শেখা ছড়ার ওপর। কত ছড়াই যে মায়ের মনে থাকতো! চিঠি লিখতে বসলেই ছড়ায় চলে যেতেন। আমার মনে আছে নিজের একমাত্র পুত্রকে মা একবার লিখেছিলেন:

"একপুত্রে আশ
নদীকূলে বাস,
ভাবনা বারোমাস।"

মায়ের চিঠিতে লেখা আর একটা ছড়া আমি এখনও সারাক্ষণ মনে রাখার চেষ্টা করি:

"মানুষের দশা,
আজ হাতি কাল মশা।"

ছড়াটা আমি মানিব্যাগে একটা কাগজের টুকরোয় লিখে রেখেছিলাম। প্রয়োজনের সময় সব শব্দ নির্ভুলভাবে মনে আসে না। মানুষের সংসারে যে মশা সে হাতি হবার আশায় ব্যাকুল। অথচ ভাগ্যচক্রে এবং পাকেচক্রে হাতিও যে মশায় রূপান্তরিত হয় এই সংসারে তার জন্য কোথাও কোনো মানসিক প্রস্তুতি নেই।

আমি একবার মাকে লিখেছিলাম, "যা আগে হয়েছে তা হয়েছে, এখন থেকে মন খুলে জীবনকে উপভোগ করো, ভোগ করো।"

মায়ের উত্তর এসেছিল পরের চিঠিতে:

"সমুদ্রে ডুবালেও ঘড়া
যা ধরবার তাই ধরা।"

যাকগে, ওসব পুরনো ব্যাপার ভেবে কী লাভ? সমুদ্র তো দূরের কথা, ঘড়ার ভিতর যতটুকু ধরতে পারতো তাও তো উপভোগ করলেন না আমার জননী।

আমার মায়ের নাম যিনি মিনতি রেখেছিলেন তিনি অবশ্যই দূরদ্রষ্টা পুরুষ—বিধাতাঠাকুরের গোপন কাগজপত্তরে আগাম নজর দেবার সুযোগ নিশ্চয় হয়েছিল তাঁর। না হলে নাম রাখবেন কেন মিনতি? সমস্ত জীবন ধরে বাঙালী ঘরের এই সব মেয়েরা মিনতি করার জন্যই তো জন্ম নেয়।

না, আমি ওসব কথা আর ভাববো না। এখন আমি মুক্ত পুরুষ। আমার পিছনে যে অদৃশ্য সুতোর দুর্বল সংযোগ ছিল তার থেকে এবার আমি ছিন্ন হয়েছি। এখন আমি দ্রুত ভেসে যেতে চাই দূরে—বহু দূরে। এই মাতৃক দেহটাকে হাল্কা ফাতনার মতন আমি জীবনসমুদ্রে ভাসিয়ে রাখতে চাই। শুধু ওই অদ্ভুত বেশে বউবাজারের নোংরা জায়গাটায় কেন ঘুরে এলাম? পিতৃদেবের দূত ওখান থেকে কতটা খোঁজ পেয়েছেন আমার সম্বন্ধে?

বাইরে আজ মা দূর থেকে মুহূর্তের জন্যে পুত্রের দর্শনের জন্যে উন্মুখ অপেক্ষায় নেই। পিতৃদেব অপরেশ বাগচী মশাই আজ ছুতো পেয়ে গিয়েছেন। এই রাতে বিমানবন্দরে তাঁর ছুটে আসার কোনো যুক্তি নেই। আমি আগের বার মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধের যোগ্য সম্মান দিইনি। এবার প্রথমে আধশোয়া অবস্থায় বিমানের স্বচ্ছ জানালার মধ্যে দিয়ে কলকাতা বিমান বন্দরের দর্শকদের গ্যালারির দিকে তাকালাম বোকার মতন।

মনটা শালা ভীষণ বদমাস, সেবার যখন ওঁরা সবাই ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তোয়াক্কাও করলাম না, আর এবারে ভিজিটরস্ গ্যালারিতে আমার জন্য অপেক্ষমান কাউকে না দেখেও খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না।

আমি নিজের মনকে প্রচণ্ড ধমকে দিয়েছি। "ওই ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়ো, বাছাধন।"

জননীর সংগ্রহ থেকে নিজেকে কোটেশন শোনালাম, যা তিনি আমাকে ছোটবেলায় শুনিয়েছিলেন:

"পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ,
সেই পিরীতে কোন্ কাজ?"

"যদি বাছাধন, ওইসব হাত নাড়ানাড়ি, রুমাল দিয়ে চোখ মোছা ভাল লেগে থাকে, তাহলে মুখ খুলে জানালেই পারতে।" মা-জননী তো দুঃখ করতেন, "আমার বাদল ওসব পছন্দ করে না।"

আচমকা গুঁতো খেয়েই আমার মনটা সামলে নিয়েছে। বেশ কুঁকড়ে হুজুরের অর্ডারের জন্যে জো হুকুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

আমার স্মরণে এলো মায়ের সেই অনুরোধ, "সাত সমুদ্র পেরিয়ে কতদূর এই যাত্রা। একবার বাবা, ঠাকুরকে স্মরণ করিস—ওঁ নমঃ বিষ্ণুঃ। হে ঠাকুর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তুমি সর্বদা আমার সহায় হও। আমাকে রক্ষা করো।"

মন্তরটা এবার আমার মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে বেরিয়ে এলো। তারপর অবশ্য ব্রেক কষলুম। বিষ্ণুবাবুর মুখখানা মনের পর্দায় ক্লোজ-আপে এনে ভদ্রভাবেই তাঁকে শুনিয়ে দিলাম, "সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করলাম বলেই আপনাকে অ্যাকশন নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই! স্রেফ আমার মায়ের স্মৃতিকে অসম্মান না-করা—কে জানে হয়তো পরলোক ফরলোক কোথাও কিছু আছে। আমার দুঃখিনী জননী সেখান থেকেও নিশ্চয় তাঁর স্নেহের বাদলের দিকে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে আছেন।"

সুদূরের যাত্রীরা প্রায় সবাই প্লেনে নিজের আসনে বসে পড়েছেন। বিমান নয় তো, একখানা রবীন্দ্রসদন! এঁর ক্ষিধে পূরণ করা কি সহজ কথা। তবু যা মনে হচ্ছে, বারো আনা সীট বোঝাই হয়ে গিয়েছে।

আমার পাশের সীট দু'খানা অবশ্য এখনও খালি রয়েছে। খালি থাক বাপু, একটু হাত-পা ছড়িয়ে এই ভিড়ের মধ্যে নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করা যাবে। আমি কয়েকদিন এদেশে বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলাম,

আমি এখন একটু নিরিবিলি থেকে মোকাবিলা করতে চাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত লোক, অর্থাৎ নিজের সঙ্গে।

নাঃ! অতো সৌভাগ্য আমার কপালে নেই যে পাশের সীটখানা ফ্রি ভোগদখলের সুবিধে পাওয়া যাবে। দু'একজন যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী আছেন, খুব পাবলিসিটি দিয়ে পাশের সীটের টিকিটখানা কিনে নিজের বাদ্যযন্ত্রটি বসিয়ে নিয়ে যান। আমি গাইয়ে নই, বাজিয়ে নই—লোকে আমার গা ঘেঁষে বসবেই।

এবার যখন হঠাৎ দেশে এলাম তখন তো আরও মুশকিল! সারা রাস্তা পাশের সীটে বসে এক ভদ্রমহিলা নবজাত শিশুকে লালন-পালন করলেন। লম্বা কয়েক ঘণ্টার জার্নিতে আমার ডবল ফায়দা হলো। বিনামূল্যে নারীদেহের উপযুক্ত ফরাসী সেন্টের সুঘ্রাণ গ্রহণ ছাড়াও আমার ট্রেনিং হলো কেমন করে বেবির কান্না বন্ধ করতে হয়, টক-টক পায়খানা সহ ডায়াপার কেমনভাবে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করে নোংরা বস্ত্রখণ্ডটি টুপ করে বেবি ব্যাগে পুরে ফেলতে হয়, কেমন করে বেবির কানে সুড়সুড়ি দিয়ে তার মেজাজ ঠিক রাখতে হয়।

এছাড়াও অসহায় সন্তানের দিকে সর্ববিধ সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রশিক্ষণ হয়েছে আমার। যে-মেয়ে কয়েক মাস আগেও পুরুষের মন হরণের জন্যে প্রজাপতির মতন কোনো দায়িত্বের বোঝা না নিয়ে হাল্‌কাভাবে উড়ে বেড়াতো সে-মেয়েই কেমনভাবে ভোল পাল্টে হোল-টাইম মাদার হয়ে যায় তা বোঝা দায়। এ কি মেয়েদের শিক্ষা? না দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি? না মেয়েদের প্রবৃত্তিই কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃত্বের এই হিমালয় শিখরে তাদের পৌঁছে দেয়?

শিশুটি ছেলে! সেক্স না বোঝা পর্যন্ত মাতৃক্রোড়ে শিশু সম্পর্কেও একটা কৌতূহল থেকেই যায়। ছেলে হলে ইণ্ডিয়ান মায়েরা বর্তে যায় —এই ছেলে-হ্যাংলামো মা লক্ষ্মী তোমাদের কেমন করে এলো? পুরুষদের হাতে বংশপরম্পরায় এমনভাবে নিগৃহীত হবার পরে এই মানসিকতা তোমাদের মানায় না!

নিপুণা নার্সের মতন সহযাত্রী মহিলা মিনিট কয়েক অন্তরই শিশুটির জন্যে কিছু না কিছু করছেন। অন্য দায়িত্বপালন না করলে জননী অন্তত টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আলতোভাবে। মাঝে-মাঝে চলেছে জলপান—বিভিন্ন আকারের নিপ্‌ল আঁটা বোতল থেকে। রমণীস্তনের বোঁটার সঙ্গে এই নিপ্‌লের সাদৃশ্য আছে কল্পনা করে অপরিপক্ক বাল্যাবস্থায় আমি ও আমার বকাটে বন্ধু গোবিন্দ অনেক রোমাঞ্চিত বোধ করেছি! এতোদিন পরে এতো কাছে নিপ্‌লের এই অরিজিন্যাল ব্যবহার দেখে তেমন বিস্ময় হলো না। যা নজরে পড়লো, শিশুর মুখ থেকে রবারের নিপ্‌লটা টেনে নিয়ে নবীনা জননী ওটিকে অতি সাবধানে ঢেকে রাখছেন।

আমি তখন ভাবছি আমার মায়ের কথা। ৬২/৩ ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনে আমার মা-ও নিশ্চয় দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্তে আমার ওপর এইভাবেই নজর রেখেছিলেন। তবেই না আজ আমি এই ইন্টার-ন্যাশনাল ফ্লাইটের জানালার ধারে সীটে বসে আছি। আমার মায়ের কষ্ট নিশ্চয় আরও বেশী ছিল। আমি লিখে দিতে পারি, আমার পিতৃদেব অপরেশ বাগচী মহাশয় স্ত্রীর প্রথম সন্তানপরিচর্যার জন্যে এতোগুলো বোতল, ফ্লাস্ক, ডায়াপার ইত্যাদির বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করেননি। আমার মা রোগা হবেন না তো কে রোগা হবে? অমন সুন্দর শরীর কেবল পরিচর্যার অভাবেই নিষ্প্রভ হয়ে থাকতো।

আমি গতবারের প্লেনযাত্রার সময় ভেবেছিলাম শিশুটির সঙ্গে একটু গোপন ডায়ালগ করবো যা তার স্তনদায়িনী মা অত কাছে থেকেও শুনতে পাবেন না। শুনলে মহা মুশকিল, ভাববেন আমি কাউকে অভিসম্পাত করছি।

কিন্তু মিসেস চৌধারী, আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে আপনার মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করবার জন্যে আমার মনের প্রশ্নগুলো জেগে উঠছে না। আমি কয়েকটা কথা তুলছি একটি নবজাত পুরুষের সঙ্গে স্রেফ ভাবের আদান-প্রদান করতে।

আলোচনার রূপরেখাটা এইরকম ঃ

"গুড মর্নিং ইয়ং মিস্টার চৌধারী, এই মুহূর্তে তুমি কেমন নিশ্চিন্তে জননীর কোলে আশ্রয় ও প্রশ্রয় লাভ করছো! নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন এই সুবিশাল দূরত্ব তুমি কেমন অনায়াসে পেরিয়ে এলে, অথচ তুমি এখনও হাঁটতে জানো না, কোনো ভাষা জানো না, এমনকি নিজে নিজে খেতে পর্যন্ত শেখোনি।

তোমার মুখে চরম প্রশান্তি, পরম নির্ভরতার ছায়া—অথচ আমি দেখছি তোমার গর্ভধারিণী মায়ের মুখে গভীর ক্লান্তি। তুমি এর মধ্যে বহুবার কেঁদেছো, নেংটি ভিজিয়েছো, দুধ তুলেছো, প্রকাশ্যে মলত্যাগ করেছো। তুমি শোওয়ার সময় জেগেছো এবং জাগার সময় অঘোরে ঘুমিয়েছো।

অথচ এখন থেকে, ধরো কুড়ি কি পঁচিশ, কি তিরিশ, কি আমার মতন এই তেত্রিশ বছর বয়সে তোমার কী অবস্থা হবে তা একবার ভেবে দেখবে কী? তুমি কি তখন তোমার মায়ের তোয়াক্কা করবে? তুমি কি একবারও খোঁজ করবে, মা তুমি কেমন আছো? তুমি কি দিনের মধ্যে একবারও ভাববে, মা তুমি এখন কোথায়? তোমার মুখে আমি কেমন করে একটু হাসি ফোটাতে পারি?

অতশত কথা থাক, মাকে তুমি নিয়মিত চিঠি লিখবে কি না সে-সম্বন্ধেও আমার ঘোর সন্দেহ আছে। তখন তুমি ফুটফুটে স্মার্ট কোনো মিস্টার চৌধারী! আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে এই সুশোভন বাগচীর মতন ব্যতিব্যস্ত থাকবে।

তোমার তখন কত কাজ! তুমি কেন দূর দেশ থেকে লেখা মায়ের চিঠিটা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ফেলে রাখবে না? উত্তর দেবার সময় পাবে কোথায়? তারপর হয়তো একদিন টেলিগ্রাম পেয়ে, মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে বিরক্তভাবে হিসেব করতে বসবে—কতকগুলো কাঁচা ডলার খরচ করে আবার ইণ্ডিয়ায় একটা খেপ মারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা। আমেরিকান সহকর্মীদের মধ্যে তোমাকে নিয়ে রস-রসিকতাও হতে পারে। 'কাম অন—পেরেন্টস্ আর নট ফর এভার।

চিরকালের জন্যে যে তাঁরা এ-পৃথিবীতে আসেননি তা পিতামাতারা জানেন। অসুস্থ অবস্থায় যা তাঁদের প্রয়োজন তা হলো ওষুধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা—ছেলে মাথার গোড়ায় এসে একটু চুমু খেলো কিনা সেটা সামাজিকতার ব্যাপার, বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

যারা আরও হিসেবী আমেরিকান তারা সোজাসুজি বলবে, সত্যি কথা বলতে কি মায়ের শেষপর্বের জন্যে আমি একটা ভিজিট বাজেট করেছি। ধরো, রোজগারপাতি বন্ধ রেখে গাঁটের কড়ি খরচ করে আমি অসুস্থ মায়ের কাছে গেলাম। কিন্তু হোয়ার ইজ দ্য অ্যাসুয়েরেন্স যে আমি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবো? এজলেস ওল্ড লেডিরা তাঁদের জীবনসীমা নিয়ে কতরকম প্র্যাকটিক্যাল রসিকতা করেন—একঘেয়ে উপন্যাসের মতন মোমবাতি নিববো-নিববো করেও বহুসময় কাটিয়ে দেয়। অথচ, তোমার অফিস, তোমার কেরিয়ার, তোমার নিজস্ব পরিবার, অর্থাৎ তোমার স্ত্রী, অথবা তোমার বান্ধবী তাদের প্রয়োজন সেইভাবে টিউন্ড্ করেনি। আসলে এটা তোমার মানসিক অধঃপতন নয়, এটা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের পাঞ্জা-খেলা। তুমি হচ্ছো বর্তমান—কিন্তু যারই জিত হোক বিলটা তোমাকেই বহন করতে হবে।

বেবি এবার হঠাৎ কেঁদে উঠলো। "কেন বাপধন? তুমি কি আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করলে? না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ওই সব জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে মা-জননীকে অবহেলা করতে হবে বুঝতে পেরে ভয় পাচ্ছ? তোমার কি আশঙ্কা হচ্ছে, মা যদি এসব আগাম বুঝে এখনই হাত গুটিয়ে নেন? যদি বলে বসেন তুমি আমার গর্ভে জন্মেছো তো কী হয়েছে? আমারও তো জীবন আছে! আমি তোমার দায়িত্ব নেবো না।"

এতোক্ষণে বেবির জননীর নজরে পড়ছে, আমি তাঁর সন্তানের হাবভাব গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছি। বেবির সঙ্গে আমার যে অকথিত সংলাপ চলেছে তা ভাগ্যে তিনি বুঝতে পারেননি।

সুদেহিনী জননী একটু অস্থির হয়ে উঠলেন। বেবি আর একবার কেঁদে উঠলো। মা নিশপিশ করলেন। তারপর নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করলেন আধুনিকা জননী। বুকের জামা খুলে বেবিকে পাঁজাকোলা করে কাছাকাছি তুলে নিলেন। মোহিনী সুন্দরী এখন স্তনদাত্রী— পুরুষের কামনার বিষাক্ত হ্রদ পেরিয়ে মাতৃত্বের মহাসমুদ্রে পৌঁছেছে নারী।

আজকাল এইটাই ফ্যাশন হয়ে ফিরে এসেছে। বুকের দুধে সন্তানকে মানুষ করার রেওয়াজ সভ্যসমাজকে আবার নাড়া দিয়েছে। মা তাঁর সন্তানকে দুধ খাওয়াবেন, এর মধ্যে লজ্জার অথবা বেশরমের কী আছে?

আমার খুব ইচ্ছে করছিল প্রাণভরে এই দৃশ্যটা দেখি খুব কাছে থেকে। আধুনিক সমাজে সভ্যতা-ভব্যতার মান অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। পুরুষের জন্য বুকের ভাস্কর্য রক্ষা করতে গিয়ে ইদানীং সন্তান বঞ্চিত হচ্ছিল মাতৃদুগ্ধ থেকে। লজ্জা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

আমি মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার কাঁচের দিকে তাকাচ্ছি। এইটাই ভব্যতা। আর ভাবছি, এরোপ্লেনে সবাই অবশ্য ব্যাপারটা মেনে নেবে। কিন্তু সাগরপারের মামলাবাজ সভ্যসমাজে এখনও ব্যাপারটার ফয়সালা হয়নি। মার্কিনী এক পাবলিক সুইমিং পুলের ধারে এক জননী বক্ষবন্ধনী সরিয়ে তাঁর সন্তানকে প্রকাশ্যে স্তনদুগ্ধ দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাধা এলো কর্তৃপক্ষের সজাগ প্রহরীর কাছ থেকে। ধন্য দেশ! রাস্তাঘাটে যথেচ্ছ দেহসম্ভোগে কোনো সামাজিক বাধা নেই, যত আপত্তি প্রকাশ্যে স্তনবৃন্তটি সন্তানের মুখে পুরে দেওয়ায়। তবে উকিলরা ছাড়েননি। মামলাবাজের দেশ তো! দিয়েছেন একখানা ক্ষতিপূরণের কেস ফাইল করে। এখন হয় জজসাহেব বলুন, পাবলিক সুইমিং পুলের ধারে মা স্তনদায়িনী হতে পারবেন না পোষাকী সৌজন্যের খাতিরে, না হয় আদেশ দিন লাখখানেক ডলার ক্ষতিপূরণের।

এরোপ্লেনের স্তনদায়িনী এরপর আমাকে প্রচণ্ড সম্মান দিয়েছিলেন। আমার কোলে বেবিকে পাঁচ মিনিটের জন্যে জমা রেখে তিনি টয়লেট ঘুরে এসেছিলেন।

ওই পাঁচটা মিনিট আমি প্রচণ্ড পুলকিত হয়েছিলাম—আমার অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ! বেবি কোলে করে শান্তভাবে বসে আছি এবং বেবি কাঁদছে না, বরং হাসছে—এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য নয়। আমার আনন্দের কারণ, একজন নারী এই প্রথম আমাকে কোনো গুরুদায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করলেন। দায়িত্ব দেবার আগে সন্দেহ করলেন না—একে বিশ্বাস করা ঠিক কিনা।

আমার মা কিন্তু বলতেন, "বাদলকে অবশ্যই দায়িত্ব দেওয়া যায়।" আর পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় অপরেশ বাগচী (অপরের ঘাড়ে লাইফ চালাবেন বলেই বোধ হয় যাঁর নামকরণ হয়েছিল অপরেশ) বলতেন, "ওকে দায়িত্ব দিয়ে কেউ কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, মিনতি।" আমার মা বেচারী কী করবেন? কারও সঙ্গে কোনো বিষয়ে লড়াই করবার মতন শারীরিক বা মানসিক সামর্থ্য তাঁর কোনোদিনই ছিল না। স্বামীর সত্য মিথ্যে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন জানালার ধারে।

প্লেনের স্তনদায়িনী টয়লেট থেকে ফিরে এসে নিজস্ব দায়িত্বভার গ্রহণের আগে দেখলেন, শিশুপুত্র তার সাময়িক ভাগ্যপরিবর্তন লক্ষ্য করেনি। জননী সুমধুর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমাকে বললেন, "তোমার ধরা দেখেই বুঝতে পেরেছি। বেবি ধরবার অনেক অভিজ্ঞতা তোমার রয়েছে।"

আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। 'ভদ্রে, বেবি তো দূরের কথা, বেবির সম্ভাব্য মাদারকেও এখনও ধরবার সুযোগ হয়নি! তবে প্রত্যেক পুরুষমানুষই তো একদিন মায়ের কোলে লালিত-পালিত হয়েছে, তাই ওই ব্যাপারটা ঠিক এসে যায়, অন্তত যারা তাদের মায়ের জন্য অনুভব করে তাদের কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়।'

অথবা আমার শিশুধারণ এমন কিছুই প্রথাসম্মত হয়নি। শিশুটি কন্যা হলে পরিস্থিতি বুঝে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতো।

"ভদ্রে, তোমার এই পুরুষ-শিশুটির ওপর একটু কড়া নজর রেখো, সে এখন থেকেই বৈচিত্র্যের সন্ধান করছে।" আমি বলে ফেললাম।

স্তনদায়িনী ফিক করে হাসলেন। বললেন, "কোষ্ঠি করিয়েছি, মায়ের খুব অনুগত হবে!"

আমার মা কি সন্তানের কোনো কোষ্ঠি করিয়েছিলেন, আমার জন্মের পরেই? ওসব করবার মতন সুযোগ বা স্বাধীনতা আমার চিরদুখিনী মা তখন কেমন করে পাবেন? বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে দু'জনে মিলে, কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় তখন কোথায়?

আমার বাবা অপরেশ বাগচী মশাই অবশ্য নিজের কোষ্ঠি থেকে সন্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন চান্স পেলেই। "পুত্রসুখ নেই আমার। পুত্র থেকে অনেক চিন্তা···।"

আমার মা বিরক্ত হতেন। "ওর জন্মের আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার সব দুঃখের বোঝা ও বইবে। শেষ বয়সে আমার কোনো কষ্টই থাকবে না।"

কী জানি, মা সত্যিই স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা। অথবা বাবাকে সামলে রেখে নিজের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখতেন।

কিন্তু এসব তো যখন মার্কিন মুলুক থেকে এই কলকাতায় হঠাৎ ফিরছি তখনকার কথা। তখন মনে ভীষণ উদ্বেগ। যে-টেলিগ্রামটা পেয়েছিলাম সেটা যতবার পড়েছি, চিন্তা ততই বেড়েছে।

আবার ভেবেছি কী আশ্চর্য! কতদিন তো মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। তাঁর অতি আদরের বাদলের কাছ থেকে দু' লাইন "আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছো" পাবার জন্যে প্রতিদিন তিনি দরজার কাছে অপেক্ষা করে থাকতেন, তারপর নিজেই লিখতে বসতেন, "আমি জানি তোমাদের ওখানে বড় বেশী কাজ। কাজ, কাজ আর কাজে তোমার শরীর স্বাস্থ্য ভাল হবে কী করে? বাদল আমার, মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নিও। ভাল করে খেও। আমি বুঝতে পারি, এখানে আমাদেরও ধৈর্য ধরতে

হবে—অনেক কাজ করার পর আমার বাদলকে বাড়িতে চিঠি লিখতে বসতে হয়।”

সবটাই হয়তো স্রেফ ফাঁকি। এবার তো আমি নিজের ডায়রিতে প্লেনে বসে-বসে এই কিছুক্ষণের মধ্যে আজে-বাজে কত কথা লিখে ফেললাম। অথচ দিনের পর দিন ধরে, বাড়িতে লিখবো ভাবলেই কুঁড়েমি জড়িয়ে ধরতো আষ্টেপৃষ্ঠে। এই তো সম্পর্ক।

তবু যখন বিদেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম এলো মা একবার আমাকে দেখতে চাইছেন, তাঁর শরীর ভাল নয়—তখনই মনটা দেশে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। অনেক দূরে থাকলেও আমার মা ছিলেন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমি মাকে চাইলে তার ঊর্ধ্বে কারও কোনো দাবি থাকতে পারতো না—সে দাবি আমি করি চাই না-করি। এই বিশ্বাস নিয়েই টগবগিয়ে চলছিল আমার জীবনটা, সেই সময় মায়ের অসুখের খারাপ খবরটা হাতে এলো।

সব কাজকর্ম ফেলে হুট করে ইণ্ডিয়াগামী প্লেনে চড়ে বসেছি। বড্ড দুশ্চিন্তা ছিল মনের মধ্যে। এই উদ্বেগ জিনিসটা কখনই ভাল নয়। মাকে বলবার জন্য আমার যে অনেক কথা জমে আছে।

কিন্তু এবার কলকাতা থেকে এই ফেরার পথে আমার কোনো উদ্বেগ নেই। উত্তাল ঝড়ের পরে প্রকৃতি যখন একেবারে শান্ত হয়ে যায় তখন কি কখনও ভাল করে তাকিয়ে দেখেছেন? বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র কী যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয় উদ্বেগ নিবারণের জন্যে। আমারও তো যা হবার হয়ে গিয়েছে। আমাকে এখন থেকে আর এতো ভাবতে হবে না।

তবু এই মুহূর্তে আমার মায়ের পুরনো অনুরোধ মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি এবারে নিজে থেকেই পবিত্র সংস্কৃতমন্ত্রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও নিরাপত্তা ভিক্ষে করে নিয়েছি। সব চিন্তার বোঝা বিসর্জন দিয়ে আমি নিজেকে এবার একেবারে পাখির পালকের মতন হাল্কা করে নেবো।

আমার চোখ দুটো বন্ধ রেখেছি। বুঝছি, আমার পাশের সীটে কে যেন বসলো। বসুক গে যাক, এ তো আমার পিতৃদেবের জমিদারী নয়, লোকে বসবেই। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যে টিকিট কাটবে সেই আমার পাশের এই সীটে বসতে পারে, আমি আপত্তি তুললেও কেউ শুনবে না।

আমি এতোক্ষণে ভিতর থেকে অনেক চেষ্টা করে নিজেকে গত কয়েকদিনের টেনশন থেকে মুক্ত করে ফেলতে পারছি। আমি ইতি-মধ্যেই বেশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছি। আমার মন বলছে, তোমার বাঁধন আলগা হলো, তোমার মুক্তি এখন তোমারই আয়ত্তে। মুক্তির স্বাদ কথাটা আমি মার্কিনমুলুকে বাঙালী মহিলামহলে অনেকবার শুনেছি। জিনিসটা যে কী তা ঠিক ওখানকার মেয়েরা আমায় বোঝাতে পারে না। এখন আমি কিছুটা বুঝছি, আমার পিছনের সব বাঁধন কেটে গেলো—মুক্তির আনন্দ এই মুহূর্তেই আমার উপভোগ করা উচিত।

কিন্তু এই সময় একটা হাল্কা রমণীশরীরের মৃদু স্পর্শ পাওয়া গেলো। ঠিক পেলব সংস্পর্শ বলতে বাংলা উপন্যাস যা বোঝায় তা নয়, একটু যাকে বলে খোঁচার মতন। কিন্তু যাই বলুন তবু তো একটি অপরিচিত পুরুষদেহকে একটি নারীহস্ত স্পর্শ করছে। এবার সংবিৎ ফিরে আসছে। মুদিত নয়নকমল বিশেষ স্টাইলে ধীরে-ধীরে বিকশিত করলাম। ব্যাপারটা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। বিমান-সেবিকা আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা জানাচ্ছেন, আমি অসাবধানী, প্লেন চলতে শুরু করেছে, অথচ আমার কোমরে কসি বাঁধা হয়নি।

আমি নড়েচড়ে উঠলুম। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী নারীর যে-কোনো নির্দেশ মানবার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। এই বিমান যখন নভোচারী হবে তখন ক্যাপ্টেন, বিমান সেবক ও সেবিকাদের নির্দেশই আমাদের আইন। আমি বিমান-বালিকাটিকে আড়চোখে দেখে নিয়েছি। আসাম অথবা মেঘালয়ের মেয়ে মনে হয়। এঁদের কর্তব্যবোধ অনেক বেশী। ঠিক খুঁজে-খুঁজে বের করেছেন, কে অসাবধানী, সীট বেল্ট লাগায়নি।

আমার ভাগ্য ভাল, সেবিকা নিজেই আমাকে মৃদু ঠোক্কর দিয়েছেন যাতে আমার সুখস্বপ্নে তেমন বিঘ্ন না ঘটে! একটু দূরেই একটি গুঁফো পাঁচফুট এগারো ইঞ্চি স্যুটেড-বুটেড পুরুষসিংহ বিশাল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—নিশ্চয় পাতিয়ালায় বডি বিল্ডিং করতো বিমান কোম্পানিতে যোগ দেবার আগে। ওই গুঁফোকে দিয়েও গিরিদুহিতা আমাকে খোঁচা লাগাতে পারতেন, তাহলে আমার কয়েক মিনিটের মিনি-স্বপ্নটার কী পরিণতি হতো?

আমি চোখ খুললাম। পাশের লোকটির দিকেই আমার মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে হলো, কারণ বিমান দিদিমণির ওপর এই মুহূর্তে একটু রাগও হচ্ছে। "কোমরে কসি না বাঁধলে এরা উঠতে দেবে না।"

ভদ্রলোক আমার মন্তব্য তারিফ করলেন। "সীট বেল্টের চমৎকার বাংলা করেছেন তো!"

আমি ততক্ষণে বাইরে নীরব হয়ে গিয়ে বুকের ভিতরে বকবক করছি, "জীবনে ওপরে ওঠবার আইনগুলো বড্ড বেয়াড়া। স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোমরে দড়ি বাঁধো, ভিতর থেকে কোনো ধোঁয়া ছেড়ো না, অর্থাৎ যেখানে যত আগুন আছে তা নিবিয়ে ফেলো। হেলিয়ে দিও না নিজের চেয়ারকে, খাড়াভাবে বোসো। তবেই নির্বিঘ্নে উঠতে পারবে ওপরে।"

আমি ভাবছি বিমান-দিদিমণিকে ডেকে বলি, 'কোমরে দড়ি পরবার কথা উঠলেই আমার আতঙ্ক হয়। আমি বিমান কোম্পানির দড়ি ছাড়াও অন্য দড়ি দেখেছি। একবার ওই অণুশ্রীর ব্যাপারে আমার কোমরে প্রায় দড়ি পড়ছিল, অনেক কষ্টে বেঁচে গেলাম বউবাজারের এক মা-লক্ষ্মীর দয়ায়। না, ওসব কথা এখন এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমি অবশ্যই স্মরণ করতে চাই না। আমার মা প্রায়ই বলতেন, "জীবনে যদি শান্তি চাও তবে অপরের দোষ দেখো না। পুরানো সব কষ্টের কথা ভুলে যাবে, তবে সুখ আসবে।'

দিদিমণি, ওই গুঁফো পাতিয়ালা-বডি বিমান-সেবকের সঙ্গে

হাসিঠাট্টা পরে করবেন। শুনুন, আপনি ভাল করেননি আমাকে খোঁচা মেরে। আমি চোখ বুঁজে একটু একান্তে আমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম। আমার কোমরে কসি বাঁধা না-থাকলে মহাভারতের এমন কিছু অশুদ্ধি হতো না—আপনাদের পাইলট সাহেব যথেষ্ট নিপুণ, স্রেফ একজনের কোমরে বেল্ট নেই বলে তাকে বেঘোরে মরতে দিতেন না।

দিদিমণি যখন আমাকে জ্বালাতন করেছেন তখন আমিও সহজে ছাড়ছি না। আমার মাথাটা বেশ ভারি হয়ে রয়েছে। একটা যন্ত্রণা নিরোধক বটিকা সেবন করা যাক, দিদিমণির শ্রীহস্তে বিতরিত একটু পানীয়ের সঙ্গে।

মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠবার এই সময় সেবাকার্য বন্ধ থাকারই কথা। দিদিমণি কিন্তু একটু বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। কিন্তু প্রতিশোধ নিলেন অন্য উপায়ে। নিজে না এসে ওই পাতিয়ালা-বাড়ির গুঁফোকে পাঠালেন পানীয়সহ।

ওই কেঠো হাতের জলে কোনো রোগীর মাথাধরা সারে? আপনারাই বলুন! বটিকা যতই শক্তিময় হোক। ছোটবেলায় বাবা একবার একটা খাবারের বাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ফেরত দিয়ে আব্দার করেছিলাম, মায়ের হাত থেকে নেবো। কিন্তু এখানে সে-প্রসঙ্গ তোলা ঠিক হবে না। ওই পালোয়ানি এগিয়ে-দেওয়া জলের গেলাস হাতে নিয়েই আমাকে বলতে হলো, মেনি থ্যাংকস। সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষের উক্তি : ইউ আর ওয়েলকাম।

না বাপু, তুমি আমার কাছে ওয়েলকাম নও। আমি একটি নরম হাত থেকে মাঝে-মাঝে স্নেহসুধা বর্ষণ চাই। কয়েকদিন আমার ওপর দিয়ে যা গেলো।

বটিকা সেবন করে আমি কখন সুষুপ্তির দেশে চলে গিয়েছি খেয়াল নেই। শুধু একবার যেন দেখলাম, আমি এখন কলকাতাতেই

ফিরে চলেছি। প্লেন থেকে নামলাম, তারপর সরকারী ঝামেলা মিটিয়ে বাইরে এলাম, আশা করেছিলাম কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

কিন্তু কে কোথায়? কলকাতায় ফিরে এসেছি অথচ আমার জন্যে বিমানবন্দরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই ভাবতে খুব কষ্ট লাগলো। তখনও ভাবছি, ভিড়ের মধ্যে থেকে চেনা-জানা মুখ একটা এগিয়ে আসবে। কিন্তু তার বদলে শুধু ট্যাক্সিওয়ালাদের টানাটানি।

বিশেষ করে যখন কেউ বলে, 'প্রাইভেট গাড়ি, চলুন না স্যার,' তখন খুব হাসি লাগে। আমি মরে গেলেও ওই হাফ-বেশ্যাগুলোকে ব্যবহার করতে চাই না। ওর থেকে মার্কামারা বাজারে-ট্যাক্সি—ভাঙা হোক, চোরা হোক, নোংরা হোক, দুর্গন্ধ হোক অনেক ভাল। ইউ নো হোয়্যার ইউ স্ট্যাণ্ড, তুমি জানো একটা ভাড়া-করা যন্ত্র-শরীর তোমাকে টানছে, মিটার উঠছে, তুমি যতদূর যাবে যত বেশী সময় ব্যবহার করবে তত বিল বাড়বে। কিন্তু এই আধা-বেশ্যাগুলো, মাই লর্ড! আমি এদের ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এদের সঙ্গে আমি ঘরের মেয়ের মতন ব্যবহার করবো? না ধরে নেবো একবার যে বাজারে বেরোয় সে আর ঘরের মেয়ে থাকে না? হাফ বলে কোনো জিনিস কতকগুলো প্রফেশনে নেই, ট্যাক্সি এবং মেয়েমানুষ তার মধ্যে দুটি।

ট্যাক্সি চড়ে খেয়াল হলো আমি কাউকে কোনো খবর না-দিয়েই দেশে এসেছি। আমি যে আসছি তা ওরা জানবে কী করে?

আমার ট্যাক্সি তখন ভি-আই-পি, মানিকতলা পেরিয়ে সোজা চলেছে হাওড়া কাশুন্দের ওলাবিবিতলার দিকে।

আমি ট্যাক্সি থেকে নামলাম। একটু থমথমে ভাব বাড়িতে। বিমলা ঝি আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো, "দাদাবাবু যে!" বিমলা তেমন কিছু খবর জানে না।

আমি ছুটলাম আমাদের বাড়ির লাগোয়া ছোটকাকিমার বাড়ির

দিকে। একখানা জমি চিরে যখন দু'ভাগ হয়েছিল তখন কত কথা-বার্তা হয়েছিল, এইটুকু জমি আবার দু'ভাগ। ছোটকাকা কান দেননি, বাড়িটা বাবাকে দিয়ে জমিটা নিয়েছিলেন। ভাগ্যে নিয়েছিলেন, কাছাকাছি অন্তত একটা লোক পাবো যে আমাকে চিনতে পারবে।

ছোটকাকিমা দেখেই বলে উঠলেন, "ওমা, বাদল যে! তুই তা হলে এলি! তোর বাবা বলছিলেন, 'বাদল আসতে পারবে না। ওর কাজ অনেক।' তোর মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে বাদল আসবে না?' আমি বরং বললাম, খবর পেলে তোমার ছেলে ঠিক আসবে। পেটের ছেলে তো? না এসে পারে?"

"কিন্তু মা কই? মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

ছোটকাকিমা বললেন, "শেষপর্যন্ত মেডিকেল কলেজে দেওয়াই স্থির হলো। এই তো পরশুদিন।"

"বাবা?"

"তোর বাবা তো এই ছিলেন, এখন দেখছি না কেন?"

আমি কল্পনা করতে পারি না, বাবা ওই মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ডের কাছে আমার অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খবরাখবরের জন্যে বসে আছেন।

যা ভেবেছি তাই। পূজনীয় পিতৃদেবকে পাওয়া গেলো পচা জেঠামশাইয়ের বাড়িতে। ওখানেই তাসের আড্ডা জোর জমেছে।

আমি আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছি জেনেও একটু আসতে দেরি হলো বাবার।

পিতৃদেব শ্রীঅপরেশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের বয়স ষাট। বর্ণ গৌর। মেদহীন পেটানো শরীর। উচ্চতা আমার থেকে এক ইঞ্চি কম; পাঁচ ফুট সাত।

পিতৃদেব বয়সকালে সুদর্শন বলে সুপরিচিত ছিলেন। মায়ের বিয়েতে যখন বিবাহ আসরে এলেন তখন সুন্দর জামাই হয়েছে বলে

খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, মায়ের মুখে শুনেছি।

আমার পিতৃদেবের তীক্ষ্ণ নাসিকাটি এক উন্নত ধরনের শিল্পকর্ম—খুব ডেলিকেট বলতে পারেন। চোয়ালদুটো একটু উঁচু। চোখদুটো একজোড়া হীরের মতন এখনও জ্বলজ্বল করছে। ওই হীরে দিয়ে সারা জীবন উনি কেবল হরতন, চিড়েতন, ইস্কাবন নির্বাচন করেছেন, সামনে তাস ছুঁড়ে দিয়েছেন, মাঝে-মাঝে বাজিমাতও করেছেন, কিন্তু সংসারের কোনো কাজে লাগেননি।

আমি প্রথমেই স্বীকার করি, আমার মায়ের কাছে তাঁর পরিচিতরা অনেকেই বলেছেন, "তোমার ছেলে কিন্তু বাপের রূপ পায়নি।"

আমার মা মিনতি জানতেন যে আমি তাঁর রূপ পেয়েছি। কেবল দেহের রঙটুকু পৈতৃক—একেবারে বাগচী স্পেশ্যাল—গিনি সোনা নয়, গায়ে-হলুদের হলুদ নয়—একটু আউট অফ দ্য অর্ডিনারি ফর্সা, যা এই গুলাবিবিতলায় বাঙালী মহলে তেমন দেখতে পাবেন না। এখানকার মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যেরাও 'কালু', দেখলে ক্লাসিকাল আর্য বিপ্রর কথা কিছুতেই মনে হবে না।

মিনতি বাগচীর রঙ একটু চাপা, কিন্তু মাধুর্য সীমাহীন। আমি যে মায়ের মতন দেখতে এটা আমার পক্ষে মস্ত এক স্বস্তির কারণ। যদি আমি ওই অপরেশ বাগচীর রবারস্ট্যাম্প হতাম তাহলে বেশ মুশকিলে পড়ে যেতাম। আমার পক্ষে হয়তো প্রত্যেকদিন বিদেশে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা শক্ত হয়ে উঠতো।

না না, আমার মা এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য কোনোদিন মুখ খুলে করেননি। ছেলের কাছেও স্বামী সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য থাকতো না—এই হচ্ছে আমার মা মিনতির স্বভাব। শত-শত বছর ধরে বংশ-পরম্পরায় চরম ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষায় মন প্রস্তুত করলে তবে মিনতিদের জন্ম হয়। ইণ্ডিয়া ছাড়া আর কোথায় এঁদের সাক্ষাৎ পাবেন আপনি?

আমি কতদিন ভেবেছি, একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করবো, "মা, তুমি সব কিছু মেনে নাও কেন? মেনে নিয়ে পৃথিবীতে কে কবে নিজেকে

রক্ষে করতে পেরেছে ?” কিন্তু আমার মা ভীষণ ডেলিকেট। খুব দামী পোর্সিলিনের পাত্র-এর মতন। শত-শত বছর ধরে রসিকজনের সংগ্রহ-শালায় অতি যত্নে রক্ষা করলে তো রইলো, না-হলে মুহূর্তের অনাদরে টুকরো-টুকরো হয়ে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে। এই ডেলিকেট কথাটার বাংলা হয়তো আছে, কিন্তু আমার জানা নেই। আপনি অভিধান খুলুন, অনেকগুলো প্রতিশব্দ পেয়ে যাবেন—যেমন, সুন্দর, পাতলা, হালকা, একহারা, নিপুণ, উপাদেয়, দুর্বল, সংকোচপূর্ণ, বিলাসী, কুণ্ঠাশীল, এর সবগুলো মিলিয়ে যেন ডেলিকেট হয়—একটা বাংলা কথায় সবটা পাওয়া যায় না।

আমার মা আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকতেন। অসহায় অথচ রহস্যময় হাসিতে তাঁর মুখখানা এক অসামান্য শিল্পকর্ম হয়ে উঠতো। কিন্তু সমাধান কিছু পাওয়া যেতো না।

আমার শুধু মনে হতো, মা মুখ ফুটে যা বলছেন না, তা হলো, “তুমি তাঁর আকৃতি পাওনি, কিন্তু ওঁর প্রকৃতিও যেন তোমার না হয়। আমি তোমার মধ্যেই আমার যা-কিছু না-পাওয়া তা সুদসমেত ফেরত পেতে চাই।”

অতীতচারণে বাধা পড়লো। ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনের ছোটকাকিমা পিতৃদেবের আসন্ন আবির্ভাব সংবাদ আগাম ঘোষণা করলেন। পিতৃদেব অপরেশ বাগচী আধময়লা বগলকাটা গেঞ্জি পরেই পচা জ্যেঠামশাইয়ের তাসের আড্ডা থেকে উঠে এসেছেন।

“হাসপাতালেই দিতে হলো,” পিতৃদেবের প্রথম বক্তব্য। “কেন যে এরা হাসপাতালে যেতে চায় না।” পিতৃদেবের তাৎক্ষণিক সমালোচনা স্ত্রী সম্পর্কে।

‘বেশ হয়েছে। কিন্তু তুমি কোন আক্কেলে এই সকালে তাসপাশা নিয়ে বসেছো ?’ এই নীরব প্রশ্ন বোধহয় আমার বিদেশপ্রত্যাগত শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল।

পিতৃদেবের পরবর্তী বক্তব্য : "তোমার মা জানে, হাসপাতালে সব সময় ঢুকতে দেয় না। তোমার মা নিজেই আমাকে বললো, সকালে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতে হবে না।"

মা বললেন এবং পিতৃদেব তা সঙ্গে-সঙ্গে মান্য করার জন্যে এক পা এগিয়ে আছেন! তৎক্ষণাৎ সব দায়দায়িত্ব ভুলে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজের চত্বর থেকে ফিরে চললেন ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের তাসপাশার আড্ডায়। ইনিই আবার বছরে এক আধবার দক্ষিণেশ্বরে এবং বেলুড়ে ট্রিপ মেরে আমাকে বিদেশেও দু'একখানা চিঠি ছাড়েন, ব্যাখ্যা করেন হিন্দুরা কেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি।

আমি একবার দাঁতে দাঁত চেপে বিদেশ থেকে উত্তর দিয়েছিলাম, "পৃথিবীতে সেরা এবং উঁচা বলে কোনো জাত নেই—সব জাতেরই কয়েকটা চরিত্র থাকে এবং সেগুলোই তাদের কখনও সামনে এগিয়ে দেয়, আবার কখনও পিছনে টানে। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের প্রাণশক্তি এতোই সজাগ যে-মুহূর্তে বুঝবে কোনো আচরণ তাদের অগ্রগতির সহায়ক হচ্ছে না তখনই তা নিষ্ঠুরভাবে বিসর্জন দেবে, আমাদের উপদেশের কোনো প্রয়োজন হবে না।"

আমি ওদেশের প্রাণশক্তিরই একটু অংশ নিয়ে হঠাৎ মাকে দেখবার জন্যে দেশে ফিরে এসেছিলাম।

আমি পিতৃদেবকে বেশী কিছু না বলে, শুধু মেডিক্যাল কলেজের বেড নম্বরটুকু লিখে নিয়ে ওলাবিবিতলা লেন থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পিতৃদেবের যা মনোবৃত্তি, ভাবলেন আমি নিজস্ব আড্ডায় বেরোচ্ছি। বললেন, "এরোপ্লেনের ক্লান্তি কাটিয়ে নিলে পারতিস একটু ঘুমিয়ে। বন্ধুবান্ধব তো আছেই।"

আমি কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করিনি। আমি সোজা চলে এসেছি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ওখানে কালীধনের খবর জোগাড় করেছি অনেক কষ্টে।

কালীধন বসু, আমাদের ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, কিছুদিন আগে একটা মেডিক্যাল সম্মেলনে ইউ-এস-এ-তে গিয়েছিল। আমি ওকে ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, গোটা কয়েক দুর্মূল্য ডলারও প্রীতি উপহার দিয়েছিলাম।

কালীধনকে পাকড়াও করলাম মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে প্রায় শেষ মুহূর্তে—প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ি চালিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অজানা থাকলে ভারতবর্ষে যা দুর্ভেদ্য দুর্গ, জানাশোনা থাকলে তাই তোমার মাতুলালয়। কালীধন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মায়ের সব খবর নিয়ে এলো। বললো, "আজ সকালেও ছোট একটা ক্রাইসিস গিয়েছে।"

আমার মা জেনারেল বেডের এক কোণে নিজের যুদ্ধ নিজেই করে যাচ্ছেন। কালীধন অসাধ্যসাধন করলো। আমার অভিলাষ এবং কালীধনের শক্তিতে রোগিণী এবার ঢুকলেন কেবিনে।

কালীধন বললো, "তুই খুব লাকি রে—এখনই একটা ঘর খালি হলো।" কালীধন জিজ্ঞেস করলো, "আয়া রেখে দিই?"

"আয়া নয়, আমি নার্স চাই। সুশিক্ষিতা। তুই তো জানিস, আমার মা সারাজীবন বড্ড কষ্ট পেয়েছেন, কোনোদিন কোনো সুখের মুখ দেখেননি।"

কালীধন জ্ঞান দিলো, "সুখ মানে শুধু পয়সার সুখ নয় রে, সুশোভন। এদেশে মেয়েদের অর্থসুখ হয়তো আমেরিকানদের মতন নেই, কিন্তু স্বামীসুখ আছে, সন্তানসুখ আছে, পরিবার সুখ আছে।"

একবার ইচ্ছে হলো বলি, "ডাক্তারসাব, বেশীরভাগ মেয়ে এসব সুখও পায় না এদেশে। অন্তত আমার মা নিশ্চয় পাননি।" কিন্তু লজ্জা লাগলো ওকে বিরক্ত করতে। আজ কালীধন আমার জন্যে অনেক করেছে। ভারতীয় নারীর সুখ সম্বন্ধে ও যদি মূর্খের স্বর্গে বসবাস করতে চায় তো করুক।

কালীধন আমাকে স্পেশাল ওয়ার্ডে ওর সিনিয়র হাউস সার্জেনের

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। "আমাদের ইস্কুলের বন্ধু ডঃ সুশোভন বাগচী। হাওড়া বলে তোমরা তো মানুষ মনে করো না, কিন্তু আমাদের ইস্কুল রত্নপ্রসব করে চলেছে। এই ইয়ং বয়সে সুশোভন ইউ-এস-এ-তে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। ডেট্রয়েটে নিগ্রো মহিলাদের যূথবদ্ধ জীবনের ওপর মস্ত সামাজিক গবেষণা করেছে। ওর মা, মিনতি বাগচী (ফিফটি ফাইভ) তোমার ওখানেই রয়েছেন। বেচারা এই সকালেই ইউ-এস-এ থেকে চলে এসেছে।"

এদেশের মানুষদের মস্তগুণ এরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্দেহ করলেও এখনও কৃতী ব্যক্তিদের সম্মান করে। অর্থবল দেখিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া কলকাতায় এখনও বেশ শক্ত। কিন্তু আপনি যদি বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ, অথবা খ্যাতনামা অধ্যাপক হন—সর্বত্র আপনার সম্মান অন্যরকম।

আমি ভাবছিলাম কখন বিকেল চারটে বাজবে, হাসপাতালের দরজা বহিরাগতদের জন্য খুলবে। কিন্তু সিনিয়র হাউস সার্জেনের সৌজন্যে প্রফেসর সুশোভন বাগচী আবার দয়া পেলেন।

আমার সঙ্গে মুখোমুখি হবার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই মা বুঝছিলেন হঠাৎ কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে। ওয়ার্ড পাল্টেছে, নতুন সেবিকা সারাক্ষণ পাশে বসে রইলেন, ডাক্তারবাবুও দু'বার দেখে গেলেন। এসব তো এ-ক'দিন ছিল না।

এবার আমি অপ্রত্যাশিতভাবে কেবিনে ঢুকলাম। "মা, আমি এসেছি! মা, তুমি কেমন আছো? এখন থেকে তোমার আর কোনো অসুবিধে হবে না, মা। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবো!"

"বাদল!" মা আমার মুখের দিকে তাকালেন। চেষ্টা করেও আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। দুটি চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

এ-দিকে ও-দিকে বোতল ঝুলছে মার বিছানা থেকে। শরীরের মধ্যে মোটামোটা ছুঁচ বেঁধানো। আমার নিজেরও চোখ দিয়ে জল

বেরুবার কথা। কিন্তু পৃথিবীর পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে আমার ভিতরটা মরুভূমি হয়ে গিয়েছে। ছুনিয়ার মানুষের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হলে বুকের মধ্যে মরুভূমিই দরকার—মনে রাখবেন মরুভূমির পথে কাদা থাকে না, পিছলে পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

মা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের যন্ত্রণার কথা অথবা আজ সকালের প্রাণসংশয় পর্ব নিয়ে একটা কথাও তুললেন না। তার বদলে জানতে চাইলেন, "খেয়েছিস ?"

মা ছাড়া এ-কথা পৃথিবীতে কে আর এইভাবে জিজ্ঞেস করবে? অনেকমাস ধরে আমি ও-কথাটা শুনিনি—কেউ যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে তুই খেয়েছিস কিনা তাই মনে ছিল না। সারা ছুনিয়া জানে, মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল—খাওয়ার প্রয়োজন হলে সে নিজেই খেয়ে নেবে, আর কারুর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।

আমি এখনও খাইনি, অথচ ছুপুর আড়াইটে বাজে—আমি কিন্তু এমন ভাব দেখালাম যে এতক্ষণ না খেয়ে কেউ থাকে ?

কিন্তু মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমার মুখের দিকে তাকালেন মা, খুব দুর্বলভাবে বললেন, "মুখ শুকিয়ে রয়েছে। তোকে কেউ খেতে দেয়নি।"

সম্ভব হলে ওইসব ড্রিপ, গ্যাসের নল খুলে মা উঠে পড়ে আমার জন্যে তখনই কিছু খাবার সংগ্রহ করতেন।

"তুই খেয়ে আয়," মায়ের কাতর আবেদন। আমি যতক্ষণ অভুক্ত আছি ততক্ষণ মায়ের কষ্ট কিছুতেই ঘুচবে না, অথচ অনেক কথা বুকের ভিতরে জড়ো হয়ে আছে।

অগত্যা একটা পথ বের করলাম। প্রাইভেট নার্সই বললেন, "আমি এখানেই চুপিচুপি মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি, যদিও আইনে বারণ।"

পৃথিবীর কোথাও এই মমতা পাওয়া যাবে না। জন্মজন্মান্তর ধরে অন্যদের খাওয়াবার জন্যেই যেন এদেশের মেয়েদের জন্ম হয়েছে,

কেউ খায়নি শুনলেই এখানকার মেয়েরা কেমন হয়ে যায়। আমি অভুক্ত এই কথা বলে বাঙালী মেয়েদের কাছ থেকে যে-কোনো সুযোগ সুবিধে আদায় করা যায় এই দেশে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার জন্যে সন্দেশের বাক্স এলো। আমি অনেকদিন পরে এ-পাড়ার কড়াপাকের স্বাদ পেলাম—গুণগত মানের একটুও পরিবর্তন হয়নি। এ-দেশে কেউ তো প্রস্তুতপ্রণালী লিখে রাখে না, তবু কী করে দিনের পর দিন ধরে পুঁটিরাম, ভীমনাগ, নকুড়, দ্বারিকের মিষ্টান্নের স্বাদ একরকম থেকে যায় তা পৃথিবীর কোনো ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ বুঝতে পারবেন না। কোকাকোলাই বলো, ম্যাকডোনাল্ডই বলো—সবাইকে লজ্জা দিতে পারে কলকাতার খাবারওয়ালা।

এরপর মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। চোখের জলে কত কথাই তো মা সারাজীবন ধরে স্বামীকে এবং সন্তানকে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু, ফল কতটুকু হলো? কতটুকু কথা অন্য কানে গেলো?

আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো মাকে বলি, "তুমি অন্য দেশের মেয়ের খবর রাখলে না মা। কথা কী করে কানে পৌঁছে দিতে হয় তা পৃথিবীর অনেক দেশের মেয়েরা জানে।"

কিন্তু এখন মায়ের যা শরীর! এই সব ডেলিকেট ফুল পৃথিবীতে এখনও ফোটে এ-কথা আমার মার্কিনী বান্ধবীরা কেউ বিশ্বাস করবে না।

"মা, ভাল হয়ে ওঠা ছাড়া তোমার এখন কোনো কাজ নেই। তুমি যত তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবে আমি তত তাড়াতাড়ি তোমাকে ওলাবিবিতলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো—তোমার পাশের তক্তপোষে কতদিন শুইনি মাগো।"

মায়ের চোখে জল। ফিস ফিস করে বললেন, "হাতের বালাটা আমি ছোটবউয়ের কাছে রেখে এসেছি। তোর ছোটকাকিমা জানে, ওটা তোর বউয়ের জন্যে। ওটা তুই এবারে সঙ্গে নিয়ে যাস।"

আমার মা এইরকম। আমি জানি পিতৃদেবের হাতে দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে আমার দুঃখিনী জননী এই

পৃথিবীতে আসেননি।

ছোটবেলায় আমার মায়ের শরীরে কত গয়না ছিল। আমার দাদুর আদরের মেয়ে—দাদু বলেছিলেন, "আমার মিনতির সোনার অঙ্গ আমি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছি।"

সেই সোনার অঙ্গে কালি পড়েছে। সময় তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে আমার মায়ের অঙ্গে-অঙ্গে। আর গহনাগুলো—ভারি ভারি, দামী দামী সেই গহনাগুলো···না, সে তো অন্য কথা।

আমার ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেলো। কে যেন বলছে, সুশোভন বাগচী, হুঁশিয়ার! তুমি আর এগিও না। প্লিজ···তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনো না এই মুহূর্তে।

হোয়াই? হোয়াই স্যুড ইউ? যা হবার তাতো হয়ে গিয়েছে! তোমার সমস্ত অতীতকে তুমি তো বহুদূরে বঙ্গভূমিতে মাটি চাপা দিয়ে রেখে এই বিশাল বোয়িং জাম্বো জেটে উঠে বসেছো।

তুমি তো এখন নতুন মহাদেশে আবার নতুন অধ্যায় শুরু করতে পারো। ওই সব পুরনো দিনের স্যাঁতসেঁতে কথা মনে রেখে নিজের ব্যক্তিত্বকে তুমি নরম এবং ভিজে করে রেখো না। তুমি পিছনে নজর দিও না, তুমি এখন সামনে তাকাও। সুশোভন বাগচী, জীবনের সময় অপব্যয় হয়েছে কিছুটা—কিন্তু এখনও অবশিষ্ট আছে অনেকটা। তুমি যে-দেশে ফিরে চলেছো সেখানে কেবল দুর্জয় পুরুষকারের পূজা, কেবল সাফল্যের সাধনা। কী পাইনি তার বৃথা হিসেব মিলিয়ে নিজেকে অকর্মণ্য করে তোলার চেয়ে কী পাওয়া যেতে পারে তার সন্ধানে থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

থাকগে, পুরনো ওসব কথা। আমার সমস্ত অতীতটাকে একটা কালো বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে এবার আমি তো চলেছি আমেরিকায়।

এরোপ্লেন কোম্পানি আমাদের বোকা বানিয়েছে। নামেই ক্যালকাটা টু নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট। কলকাতা যাতে পৃথিবীর বিমান-মানচিত্র

থেকে একেবারে মুছে না যায় তার জন্য সরকারী এয়ার-ইণ্ডিয়ার সবিনয় প্রচেষ্টা। সপ্তাহে একদিন পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে কলকাতার নাড়ির যোগাযোগটা টনটন করে ওঠে। কিন্তু রসিকতাটা বুঝুন, রাত্রিবেলায় আপনি ভাবলেন আমেরিকার প্লেনে উঠলাম। ওমা! ঘণ্টা দুই পর বুঝবেন, আপনাকে কেবল বোম্বাই পর্যন্ত আনা হয়েছে। রাত যতই হোক, বিমান থেকে বেরিয়ে আসুন কলকাত্তিয়াবাবু মশাই, নিউইয়র্কের জন্য অন্য বিমান অপেক্ষা করছে।

চোখ ঢুলুঢুলু অবস্থায় বোম্বাই আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে এবার নিজের ব্যাগ নিজে খুঁজে বের করুন। দৃষ্টি আকর্ষণ করুন উন্নতনাসিকা বিমানকর্মীদের। এই লড়াই যদি না করেছেন তো নিজেই ভুগবেন—আপনার লাগেজ পড়ে থাকবে বোম্বাইতে, আর পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার।

লাগেজ কোম্পানিদের বিশ্বপ্রসারী বিপণনের চাপে আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—পৃথিবীর সব ব্যাগই ক্রমশ এক রকম দেখতে হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যেমন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। মাথা-পিছু অন্তত দু'খানা ব্যাগ নিয়ে অতলান্তের ওপরে যাত্রীরা চলেছেন, তৃতীয় নয়ন না থাকলে বোম্বাই বিমানবন্দরে নিজের ব্যাগ কিছুতেই খুঁজে পাবেন না, টানাটানি করবেন অপরের তল্পি নিয়ে। সাবধান, অপরের মালের দিকে কুনজর দেওয়ার জন্যে অন্যের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু না হয়ে যায়!

লাগেজ সংক্রান্ত দলাই-মলাই পরীক্ষায় কোনোক্রমে পাশ করে আবার একটা বিমানের গহ্বরে প্রবেশ করেছি। প্লেনের জানলা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকালাম।

ওমা! হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। আবার বৃষ্টি কেন? ওরা কি বুঝতে পেরেছে আমি এই রাতে দেশ ছাড়া হচ্ছি? ওরা কি জানতে পেরেছে আমার ডাকনাম বাদল? ওরা কি জানে, আমি যেদিন হাওড়ার হাসপাতালে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম সেদিনও আকাশ ভেঙে

দুর্যোগ নেমেছিল ? ওরা কি জানে, আমার জীবনে স্মরণীয় কোনো ঘটনা বৃষ্টি ছাড়া হয় না ?

এই সেদিন যখন ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের বাড়িতে মাকে আগলে বসেছিলাম, তখনও বৃষ্টি এলো। বৃষ্টি সব কিছু পিছিয়ে দিলো।

আমার মা সেদিন সকালেও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "ছোট-কাকিমার কাছ থেকে বালাটা নিয়েছিস তো?" তারপর হঠাৎ বলেছিলেন, "দেখিস, যেদিন তুই বিয়ে করতে যাবি সেদিন সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে যাবে, তোর নাম যে বাদল। বৃষ্টি নামবে।"

আজ তো আমার বিয়ে নয়। আজ আমি দেশছাড়া হয়ে ফিরে যাচ্ছি সুদূরে, আজ কেন বৃষ্টি ? আজ আমার কী এমন হতে পারে ? তুমি জানো না মা, বৃষ্টি আমার মনকে ঘরমুখো করতে পারবে না। এই অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের বিরাট পাখিটা কয়েক মুহূর্ত রানওয়ে ধরে ছুটে ঝট করে যেখানে উঠে যাবে সেখানে মেঘেরা পৌঁছয় না। মেঘ না থাকলে বৃষ্টি হবে কী করে মা ?

আমার পাশে এতোক্ষণ যিনি ছিলেন তিনি অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়েছেন। বোম্বাইতে এবার যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পাশের আসন অধিকার করলেন তাঁর মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

প্লেন আবার আকাশে ওড়া মাত্রই ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই খুলে তার ভিতরে টুক করে ঢুকে পড়লেন।

বাংলা বই দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল ইনি বঙ্গসন্তান ছাড়া আর কী হতে পারেন ? ভদ্রলোকের চেহারা ভারি, একটু যেন হারিয়ে-যাচ্ছেন হারিয়ে-যাচ্ছেন মুখ ভাব। তার মানে, দেশে-বিদেশে হরবখত চরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা নেই। এই প্রথম বঙ্গজননীর আঁচল ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন মনে হচ্ছে। বঙ্গজননীর আঁচল মানুষকে বড্ড

নরম করে দেয়। হে আধুনিকা বঙ্গজননীরা, আপনারা অনুগ্রহ করে আপনাদের সীমাহীন কোমলতা পুরুষ সন্তানদের দান করবেন না, নিষ্করুণ এই বিশ্বে তাদের করে খাবার যোগ্য করে তুলুন। পৃথিবী যে বড্ড কঠিন জায়গা, মা জননীরা।

আমি একবার আড়চোখে ভদ্রলোক যে বইখানা গোগ্রাসে গিলছেন তার নাম দেখে নিলাম।

বাংলা বইয়ের সঙ্গে আমি অনেকদিন সম্পর্কছাড়া। অথচ এমন একদিন ছিল যখন এই বাংলা নভেল না-পড়লে আমার ভাত হজম হতো না। সাবেকী বাংলায় আমাকে অকালপক্ক বলতে পারতেন।

আমার মায়ের দিক থেকে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করা বলতে ছিল ঐ বাংলা উপন্যাস পড়া। বই আসতো পাড়ার সুধাময়ী স্মৃতি লাইব্রেরী থেকে। আর আমি সেই নাবালক বয়স থেকে মেয়েমানুষের সুখ-দুঃখ এবং পুরুষমানুষের সঙ্গে তাদের জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি স্রেফ মুদ্রিত অক্ষরের মাধ্যমে। তফাতের মধ্যে বই শেষ করে মা অনেকসময় খুব দুঃখ পেতেন। বেশ কয়েকবার চরিত্রদের দুঃখে চোখের জল ফেলতেও দেখেছি তাঁকে। আমার কিন্তু ওসব কিছু হতো না। আমি বুঝে নিয়েছিলাম, মানুষের সঙ্গে মানুষের শেষ পর্যন্ত হয় মিলন, না হয় বিচ্ছেদ। মানুষ হয় ঠকে, না হয় ঠকায়। চিরদিন কোনো কিছুই একরকম থাকে না। অমোঘ মৃত্যু এসে একসময় সব পার্থিব সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে দেয়।

আমি মনে করতাম, লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা গল্পের বইগুলো ঠিক অঙ্কের মতন। হয় যোগে শেষ হবে, না হয় বিয়োগে। কিন্তু অতো বোকা আমি নই—যাকে আমি চিনি না জানি না, যে আমার কেউ নয় তার জন্যে কাঁদতে বসবো। আমার কান্না অত সস্তা নয়।

কিন্তু মায়ের চোখের জল দেখেই আমি বুঝতে পারতাম, আজ গল্পে-অঘটন কিছু ঘটেছে। হয় শেষ মুহূর্তে বিয়ে আটকে গিয়েছে, কিংবা যার কষ্ট পাওয়া উচিত নয় সে কষ্ট পাচ্ছে।

"কিন্তু মা জননী, তুমি কি ওদের চেনো ? ওরা কি তোমার মা-বাবা-দাদা-বউদি-ছেলে-মেয়ে ? তা যদি না হয় তোমার দুঃখ হবে কেন ?"

মা কোনো উত্তর দিতেন না তখন। এখন বুঝি, মা একজন দুঃখী মানুষ হিসেবে আর একজন দুঃখীর সঙ্গে পরিচিত হতেন এই গল্পের যাত্রাপথে। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এই দুঃখই মানুষকে অনেক সময় আপন করে তোলে। তাই সারা দুনিয়ায় সমস্ত দুঃখীরা গল্পের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পরস্পরের জন্যে চোখের জল ফেলে।

আমাদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়েও ওই একই ব্যাপার দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের হামদা-হামদা সাহেব পথের পাঁচালী সিনেমা দেখে বেরিয়ে আসবার সময় অপু-দুর্গার জন্যে চোখের জল ফেলছে। হু ইজ অপু ? কোথায় সেই নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তা ম্যাপেও খুঁজে পাবে না এরা। হরিহর অ্যাণ্ড কোং-এর সঙ্গে বিন্দুমাত্র সামাজিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন নেই এদের। তবু কতকগুলো মিনিট অন্ধকার ঘরে বসে থেকে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আমেরিকানরা এসে পৌঁছলো নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে। তারা বলছে, কোথায় সর্বজয়া ? আমরা তোমারই লোক, আমরাও কাঁদতে চাই তোমার সঙ্গে দুর্গার অকালমৃত্যুতে।

আমি অতশত বুঝতাম না ছোটবেলায়। ভাবতাম, গল্পো লেখকের কোনো উপায় নেই—তাকে হয় যোগ না হয় বিয়োগ পৌঁছতেই হবে। এই বিয়োগটাই নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত সোজা, নাহলে প্রায় প্রতি দুপুরেই বই শেষ করে মায়ের থমথমে মুখ দেখি কেন ?

আমার সহযাত্রীর হাতের বইটার মলাট এবার একটু ভালভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া গেলো। আমি নামটা পড়ে নিলাম। 'বাঙালী জীবনে রমণী'।

আলাপের সূত্রপাত হলো। "নভেল ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। পঞ্চাশোর্ধ্বের ভদ্রলোক হাসলেন। "উপন্যাস নয়, তবে উপন্যাসের মতনই।"

আমি মনে-মনে বললাম, শালা, বাঙালীর জীবন, তার আবার

উপন্যাস। জন্ম, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, মৃত্যু—মধ্যিখানে বউয়ের ওপর একটু বারফট্টাই, এই তো বাঙালী পুরুষের জীবন। এর মধ্যে নভেলটি কোথায় যে অভিনব কিছু হবে ?

ভদ্রলোক আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। বাঁদিকে পাতার ভার দেখে বুঝতে পারছি লেখার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন।

আমি ভাবছি, ওই রমণী কথাটি প্রচ্ছদে ব্যবহার করে সাবধানী লেখক স্কোর করে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই ছোটবেলায় বাবার তাসের আড্ডায় একবার ঢুকে পড়েছিলাম বাবারই খোঁজে। বাজারের থলে হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবার আর ফেরার নামই নেই! মায়ের তখন ভীষণ চিন্তা, লোকটার কী হলো! সেই আড্ডায় একজন ইয়ার তখন খুব তরিবৎ করে রমণী শব্দের ব্যাখ্যা করছেন: 'রমণের যোগ্য না হলে রমণী বলা যায় না কাউকে।'

বাবা ওইখানে বসেই একহাত তাস খেলছিলেন। বাজারের থলিটা আমাকে দিয়ে দিলেন, "যা নিয়ে যা। মোচাটা আজকেই করতে বলবি মাকে।"

আমি তখনও বেশ ছোট, আমার তুলনায় আকারে অনেক লম্বা ওই বস্তা নিয়ে প্রায় ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে হাজির হয়েছিলাম বাড়িতে। বাবার যে-কোনো বিপদ-আপদ হয়নি, তাঁকে যে সুস্থ অবস্থায় তাসের আড্ডায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে জেনেই মায়ের স্বস্তি।

আমার যে কী দুর্মতি হলো সেই অল্প বয়সে। বাজারের ব্যাগ নামিয়ে, হাত ধুয়ে আমি বোকার মতন মাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "রমণ করা কাকে বলে মা ?"

অন্য কোনো মাকে সন্তান এই প্রশ্ন করলে কী অবস্থা হতো তা আজকের এই বয়সে আমি সহজেই কল্পনা করতে পারি। নির্ঘাৎ প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত জুটতো। মা কিন্তু আমার ছোট্টমুখে ওই নোংরা কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারপর নিজের

আঁচলে চোখ মুছে আমাকে কাছে টেনে বললেন, "তুমি কথা দাও, ওই কথা তুমি আর কখনও মুখে আনবে না।"

"আমি নয়, পচা জ্যেঠা বলছিল, অন্য একটা লোককে।"

কিন্তু মা সেসব কথা কানে তুললেন না। আমি বুঝলাম, আমি অন্যায় করে ফেলেছি। এমন কথা মুখে এনেছি সচরাচর যা কেউ মুখে আনে না।

একটু লজ্জা পেয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম হাজার-ও কালিতলার মাঠে ড্যাংগুলি প্রতিযোগিতা দেখতে। টেরুদা সদিন ভ্যানিশ কালীর ছোড়াদের ড্যাংগুলিতে কাপড় খুলে নিলেন। গলাবিবিতলার জয় হয়েছে, আমরা সবাই খুব খুশি। টেরুদাকে হিপ্ হিপ্ হুররে করে মনের আনন্দে আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে দেখলাম, দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। ভাতের থালা কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চার দিকে ভাত-ডাল ছড়ানো। শুধু মেঝেয় নয় দেওয়ালেও তরকারির দাগ। গোটাদুয়েক বেড়াল দেওয়ালের খাবারগুলো শুঁকছে। ব্যাপারটা গুরুতর। আড্ডা থেকে ফিরে খেতে বসে বাবা মোচার ঘণ্ট চাইলেন। ঘণ্ট রান্না হয়নি শুনে বাবা রেগেমেগে ভাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গিয়েছেন।

দৃশ্যটা দেখে আমার সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা বরফে যেন ডুবিয়ে দেওয়া হলো। আমার গা শিরশির করছে। আমি মাকে বলতেই ভুলে গিয়েছি বাবা মোচা রাঁধবার হুকুম করেছিলেন। বলতাম, কিন্তু ওই যে ভীষণ লজ্জা লেগে গেলো অসভ্য কথায়, আর কিছু বলা হলো না।

আমার মা চাপা মানুষ। চিৎকার করে কথা বলতে পারেন না। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

অনেকদিন পরে এবার আবার মোচার কথা উঠেছিল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ক্ষীণকণ্ঠে মা আমাকে বললেন, "শনি-মঙ্গলবারে এয়োস্ত্রী মরলে শ্মশানযাত্রার সময় মোচা লাগে। আলতায়

পা লাল করে পায়ের গোড়ায় একটা মোচা দিতে হয়। এই নিয়ম বংশের।"

আমার তখনই মনে পড়ে গেলো সেবারে মোচা নিয়ে কী কাণ্ড আমাদের বাড়িতে ঘটে গিয়েছিল।

রাত সাড়ে-দশটা, মা আমাকে ঘুম থেকে তুললেন। আমার কমবয়সী চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে রয়েছে। মা অসহায়ভাবে বললেন "তোর বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি।"

পৌনে-এগারোটার সময় একটা দশবছরের বালক ঘুমের চোখ মুছতে-মুছতে বাবার আড্ডাখানায় হাজির হলো। পচা জ্যেঠার সঙ্গে বাবা তখনও তাস নিয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

"অপরেশ তোর ছেলে এসেছে," পচা জ্যেঠা আমাকে দেখে বলে উঠলেন।

"বাড়ি যাবো না, যা," পিতৃদেব ক্ষিপ্তমেজাজে উচ্চকণ্ঠে নিজের পৌরুষ ঘোষণা করলেন।

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম, "তোমার মোচার ঘণ্ট ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মা বসে আছে।"

"যা যা, বাজে বকিস না। মাগীর ভীষণ সাহস বেড়েছে। যখন যা খুশি হবে রাঁধবে। স্বামীর কথার কোনো মূল্য নেই।"

"বাবা! মায়ের কোনো দোষ নেই। মোচা রাঁধবার কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সকালে।" আমি এবার কেঁদে ফেললাম।

পচা জ্যেঠা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "অপরেশ, তোর ছেলেটা কাঁদছে অনেক রাত হয়েছে, বাড়ি যা, হাঙ্গামা বাড়াস না। মোচা দিয়েই এক থালা ভাত এখন উড়িয়ে দে।"

"যাচ্ছি। কিন্তু মাগী আবার পাকা অভিনেত্রী। ছেলেটাকেও মন্তর দিয়ে মিথ্যেবাদী করে তুলছে। ওকে শিখিয়েছে, যেন বলতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু বাপের নির্দেশ অমান্য করার মতন কলজের জোর

যে আমার ছেলের হবে না তা আমি জানি।”

বাবা অনেক সাধ্যসাধনার পর তাসের আড্ডা থেকে বেরিয়ে বাড়িতে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে গুম হয়ে বসে থাকার পর আমার মায়ের অন্না মুখে তুললেন। কিন্তু তারপরেও আর এক দফা মায়ের ওপর অত্যাচার শুরু হলো। বাবা ধরেই নিয়েছেন, মোচার কথাটা আমি যথাসময়ে মাকে বলেছিলাম, কিন্তু মায়ের দুষ্টপরামর্শ অনুযায়ী আমি এখন জানাচ্ছি যে মোচার কথা মাকে বলা হয়নি।

আমার মা কোনো তর্ক করলেন না, ঝগড়া করলেন না। শুধু নিজের নাম অনুযায়ী করুণভাবে মিনতি করলেন।

তারপর মুখ অন্ধকার করে মা খেতে বসলেন। সেই যে দুপুরে বাবা চলে গিয়েছেন তখন থেকে খাওয়া-দাওয়ার পাট বন্ধ রয়েছে।

আমার মনে আছে, পরের দিনেই মায়ের প্রথম মানসিক বিপর্যয় শুরু হলো। চুপচাপ গুম হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতেন। কথা বলতে চাইতেন না। আমি গিয়ে বললাম, “আমারই দোষ। মা আমাকে মারো তুমি।”

মা কিছুই করলেন না। “তুই বাপের ছেলে। কোন সাহসে তোর গায়ে আমি হাত তুলবো?”

এতোদিন পরে হাসপাতালের বেডে আবার মোচার কথা উঠলো। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে-করতে মা বলছেন, “তুই তো দেশাচার কিছু জানিস না। পাশের বাড়ির কাকিমাকে বলবি, কেউ বাজারে গেলে মোচা আনিয়ে রাখবে। সধবা মেয়েমানুষকে শনি-মঙ্গলবারে ঘাটে নেওয়া যায় না পায়ের গোড়ায় মোচা না থাকলে।”

না ওসব অধ্যায় তো আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি তো এখন প্লেনে চড়ে আমেরিকায় আমার দূরে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছি। আজেবাজে চিন্তায় শক্তি ক্ষয় করার সময় তো এখন নয়।

আমি বরং মনের চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে পাশে সীটে-বসা বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি। প্রথম পর্যা বেশীক্ষণ চুপচাপ থাকলে পরে আলাপ জমানো শক্ত হয়।

"নমস্কার। কতদূর চললেন ?"

ওঁর উত্তর শুনে সুমধুর সারপ্রাইজ।

আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে আলাপ জমাবার জন্যে বললাম, "আমা নাম সুশোভন বাগচী। আমি আমেরিকায় পড়াই। কয়েক বছ ওখানে আছি, আটকে গিয়েছি বলতে পারেন।"

অপর পক্ষের প্রশ্ন: "যদি কিছু না মনে করেন, আপনি কি হাওড়ার ছেলে ?"

"অবশ্যই। হাওড়া-বর্ন, তারপর কিছুটা হাওড়া-লালিত, যদি হাওড়া-ডেড হবার পুরনো পরিকল্পনাটা একটু সেটব্যাক খেয়েছে।"

"আমি বুঝেছি। আপনার ডাকনাম তো বাদল।"

হা ভগবান! পৃথিবীটা সত্যিই ছোট!

ভদ্রলোক বললেন, "কী আশ্চর্য দেখুন। আপনার ঠিকানা আমার পকেট ডায়রিতে লেখা রয়েছে। আপনার নামে একটা চিঠিও আমার কাছে রয়েছে। আপনি ডাক্তার কালীধন বসুকে চেনেন নিশ্চয়। আপনার সঙ্গে ইউ-এস-এ-তে দেখা হয়েছিল। আমার খুবই স্নেহভাজন। দু'সপ্তা আগে হাওড়ার এক সাহিত্য সভায় কালীধনের সঙ্গে দেখা। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি শুনে ও নিজের বিদেশভ্রমণের কথা বললো। তারপ আপনার কথা উঠলো। আপনি বিদেশে বসে ইন্টারেস্টিং বিষয়ে মূল্যবা সামাজিক গবেষণা করছেন শুনে খুব আনন্দ হলো। কালীধন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিলো।"

বোঝা যাচ্ছে দিন পনেরোর মধ্যে কালীধনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকে

দেখা হয়নি। হলে নিশ্চয় শুনতেন, যাকে খোঁজা হচ্ছে সে নিজেই ইণ্ডিয়াতে এসে গিয়েছে।

অ্যাটাচি কেস থেকে চিঠিখানা ভদ্রলোক বের করে আমার হাতে দিলেন। "প্রীতিভাজনীয় সুশোভন, আমাদের শংকরদা কয়েকদিনের জন্মে মার্কিন দেশে যাচ্ছেন। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। শংকরদা আমাদের হাওড়ারই লোক। আমাদের মতন শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে পড়েননি, উনি বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমেরিকা দেশটা যেন শংকরদা ভুল বুঝে না আসেন তার কিছুটা দায়িত্ব তোমার ওপরে রইলো।"

ওহো! তাই বলি! মুখটা কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। সাহিত্যিক মশাই, আপনাকে এরোপ্লেনে সহযাত্রী হিসেবে পাশের আসন পেয়ে অবশ্যই আনন্দিত হলাম। লেখক আপনি যেমনই হোন, (অনেকদিন বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই) আপনার সম্পর্কে দু'রকম কথা শুনি। কখনও প্রশংসা—কখনও 'হ্যাক্-থু'—লিখতেই জানে না। সাহিত্যিক অমুক তো আমেরিকা বেড়াতে এসে আমাদের আড্ডাতেই সে-কথা বলেছেন। ওসব চুলচেরা বিচার অনাদি অনন্তকালের আসরে হবে, আমি শুধু জানি আমার মা আপনার বই-গুলো দুপুরবেলায় বেমালুম হজম করতেন, আর আমি জানি হাওড়ার কাসুন্দে, চৌধুরী বাগান, রাজবল্লভ সাহা লেন, এটসেটরা কয়েক দশক ধরে ঘুরে-ফিরে আপনার গল্পে উপন্যাসে, ভ্রমণকাহিনীতে আসছে।

দেখা যখন হলো তখন ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন করা যাক। "আপনার প্রিয় চরিত্রগুলো ঘুরে-ফিরে হাওড়ায় আসে কেন?"

হাসলেন ভদ্রলোক। "চরিত্র যখন হয়েছে তখন ঘুরে-ফিরে কোথাও তো আসতে হবে—হোয়াই নট হাওড়া?"

"জানেন, হাড়কাটা গলি থেকে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেখানেই কলকাতার লোক আছে তারা সবাই হাওড়া-শালকে-শিবপুর নিয়ে হাসাহাসি করে, ভাবে মানুষের বসবাসের অযোগ্য সব জায়গা।"

"ভুলবেন না, হারভার্ড ঘুরে আসবার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়ায় বেলুড়মঠ স্থাপন করেছিলেন।" ঝটিতি উত্তর দিয়েছেন শংকর।

ইচ্ছে হচ্ছে একবার জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ মশাই, কথায়-কথায় বিবেকানন্দ আর রবিঠাকুর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আর কতদিন চালাবেন বাঙালী লেখকরা?

শুনুন লেখকমশাই, বিবেকানন্দর বিশ্বধর্মসভার কথা ওদেশের কেউ জানে না, এমন কি শিকাগো শহরে পর্যন্ত এ-বিষয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের সো-কল্‌ড্‌ বিশ্বকবির অবস্থা আরও শোচনীয়—কোনো দোকানে একখানা বই পাবেন না, এমন কি আমাদের ইউনিভার্সিটি শপে, যেখানে টিস্থুক্তোর কাব্য-সংকলন, মাওরি কাব্যপ্রবাহ ইত্যাদি বই পাবেন সেখানেও তিনি অজানা।

আমি একবার ওই কালীধনের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে শিকাগোয় বিবেকানন্দ বেদান্ত আন্দোলনের খবরাখবর নিতে গিয়েছিলাম। কত? বড়জোর শ'দুয়েকের মতন লোকের ওই ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে—শিকাগোর মোট লোকসংখ্যা দশ এগারো মিলিয়ন হবে নিশ্চয়। এই আমাদের আন্তর্জাতিক জয়যাত্রা, বুঝলেন লেখকমশাই।

ভদ্দরলোক চুপসে যাচ্ছেন। এখনও হয়েছে কি! ওদেশে পৌঁছন, বাঙালী বেলুনে কোনো হাওয়াই থাকবে না যখন ওই জে-এফ-কে বিমানবন্দর এয়ারপোর্ট দেখবেন। বুঝবেন, হাউ মেনি প্যাডিতে হাউ মেনি রাইস।

আমার মনের ভাবনার গ্রাফ এখন ওঠানামা করছে। চিন্তার ইলেকট্রোগ্রাম ছবিটা এইরকম: লেখক মহাশয়, সত্যি কথা বলতে কি দেশের কোনো ব্যাপারে তেমন জড়িয়ে পড়াটা আমার অভিপ্রায় নয়। এই দেশে থাকতে-থাকতে আমার কী অবস্থা হয়েছিল তা আমার গর্ভধারিণী জননী ভাল করে জানতেন।

আমার মা-ই বলেছিলেন, "বাদল, তুই এখান থেকে চলে যা।

অনেক দূরে, যার থেকে দূর আর হয় না।"

এখান থেকে পালিয়েই আমি রক্ষে পেলাম। আপনি যদি আমার ছাত্র ও কর্মজীবনের ইতিহাস শোনেন তাহলে আপনার বড়-বড় গোল-গোল চোখগুলো অচিরেই রাজভোগের আকার ধারণ করবে।

আমি দূরেই থাকতে চাই, লেখক মহাশয়। আপনাদের এখানে মানুষের মধ্যে কি ভাবনা-চিন্তা চলেছে তাতে আমার কি এসে যায়?

আমি কেবল একজনের ব্যাপারেই চিন্তিত ছিলাম। তিনি আমার মা—আমি ওঁকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, মিনতি করে এই পৃথিবীতে কিছু হয় না। জন্ম, জন্মান্তর এসব মিথ্যে ভুনম্বরী ব্যাপার। পরজন্মের মুখ চেয়ে এবারের দুর্লভ মানবজন্মে জ্বলেপুড়ে মরার বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নেই।

আমি একবার ভেবেছিলাম, মায়ের কাছে প্রস্তাব করবো, "তোমার যদি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে তাহলে তুমি এগিয়ে যাও। আমি অবশ্যই তোমার পিছনে থাকবো। আমাকে সমন দিলে আমি যেখানেই থাকি এখানে এসে আদালতে সাক্ষী দেবো। সেই ছোটবেলা থেকে সমস্ত কথা—এমন কি সেইদিন যেদিন আমি ওই হাওড়া জেনারেল মেটারনিটি ওয়ার্ডে ভূমিষ্ঠ হলাম, সব বিবরণ আদালতে দিয়ে দেবো।"

পাছে ভুলে যাই, তাই আমি ডায়রিতে মনের কথা কিছু লিখে নিলাম।

"লেখকমশাই, আপনি হঠাৎ আমেরিকামুখো কেন? আজকাল কি বাঙালী লেখকদের বিদেশযাত্রা ফ্যাশনেবল্ হয়ে উঠছে।"

লেখক চালু জিনিস। দেখতে যতটা গোবেচারা ভিতরটা ততটা নয়। নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর উত্তর, "বাঙালী লেখকের পায়ের তলায় চিরকালই সর্ষে। আপনি শরৎ চাটুজ্যের বার্মাবৃত্তান্ত ভুলে যাচ্ছেন?"

প্রথম রাউণ্ডে আমি কাত হয়েছি। লেখক বলছেন, "ভবঘুরে কথাটা চালু অনেকদিন, কিন্তু বাঙালী তখন বড় জোর 'বার্মাঘুরে'। বিশ্বভুবনের অন্যত্র যাবার সুযোগ কোথায় ছিল?"

ঠিক হ্যায়! দুনিয়ায় সব লেখকেরই এখন পাখা গজাচ্ছে—আমেরিকান লেখকরা যাচ্ছেন ফ্রান্সে, স্পেনে। বই বেরুচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে। জার্মানরা ছুটে যাচ্ছেন দেশের বাইরে। কিন্তু তার একটা কারণ আছে। নিজের দেশের মধ্যে লেখার যোগ্য বিষয় অথবা পটভূমি তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। সমস্ত আকর্ষণীয় বিষয়। ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। এখন প্রয়োজন ও প্রতিযোগিতার তাড়নে লেখকের দূরদূরান্ত ভ্রমণ পেশাদারী প্রয়োজনের পর্যায়ে উঠে গিয়েছে।

লেখকমশাই সরল মনে একমত হলেন। তার মানে আমাদের এই বাংলাতেও কি ওঁরা গল্পের উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন না? অন্য দেশের লেখকরা শুনলে পাগল বলবে! এই হাওড়া-কলকাতার প্রত্যেকটা বাড়ির খাট-বিছানায় এক-একখানা অদৃশ্য উপন্যাসের উপাদান তোষকের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে।

লেখক বোধহয় মনে-মনে আমার ওপর চটিতং হচ্ছেন। আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের এই এক দোষ! মুখের ওপর কোনো সমালোচনামূলক প্রশ্ন করা যাবে না। অমনি তিনি ধরে নেবেন আপনি দুর্বিনীত! লেখক, উকিল, ডাক্তার, জননেতা, সরকারী অফিসার—সব পুরুষোত্তমের একই স্বভাব! পিছনে যত কিছু তিক্ত সংবাদ রটুক, মুখোমুখি কথাবার্তায় রসগোল্লার রস চাই।

লেখকমশাই নিশ্চয় আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইছেন। প্রশ্ন করলেন, "গল্পের উপাদান বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? সাধারণ বাঙালীর জীবনে কোনো ড্রামা নেই। যারা সাম্প্রতিক টি-ভি দেখে তারা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছে, নাটকীয়তার ভীষণ অভাব। মেয়েরা জন্মায়, লেখাপড়া করে, বিয়ে হয়, ছেলেপুলে জন্মায়, মেয়ের

এবং, ছেলের বিয়ে হয়, নাতিপুতি আসে, তারপর অসুখ করে, লাস্টে বলহরি হরি-বোল।"

আমার পাল্টা প্রশ্ন: "কিন্তু বলুন, শনি-মঙ্গলবারে হরিবোল উঠলে সধবার খাটে পায়ের গোড়ায় মোচা দেওয়া হয় এটা কি এক দুর্দান্ত ঘটনা নয়?"

আমার পাল্টা আক্রমণে ফল হলো। নড়েচড়ে বসলেন লেখক-মশাই। "আপনি বিদেশে থাকলেও তো আমাদের নিয়মকানুনগুলো লক্ষ্য করছেন।"

আমি না বলে পারলাম না। "কারণটা কী মশাই? মোচা মানে তো বানানা ফ্লাওয়ার, কেলা-কা-ফুল। অর্থাৎ সিঁদুরপরা মহিলাকে সিমবলাইজ করা, তুমি সারা জীবনে কাঁচকলাটি পেলে। কাঁচকলা ইটসেল্ফ ইজ ইউজলেস, আর তার ফুল…মানে জালিয়াতির ওপর জালিয়াতি।"

লেখকমশাই, আপনি কি এখন ঘুমোবেন? আমাদের জেট অনেকক্ষণ আগে বাঁশতলাঘাট, নিমতলা ঘাট, কাশীমিত্তির ঘাট ইত্যাদি দূরে ফেলে রেখে মহাকাশে অনেক ওপর দিয়ে চলেছে। আমাদের পায়ের তলায় এখন মধ্যপ্রাচ্যের দুস্তর মরুভূমি।

অনেক অভিজ্ঞ যাত্রীর মতন লেখকমশাই বিমানের সীটে মাথার বালিশ লাগিয়ে ঘুমোনোয় উৎসাহী নন। টিপিক্যাল পুরুষ বাঙালী। গপ্পো পেলে আর কিছু চান না। পলাশীর যুদ্ধটার নবমূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। আমার গভীর সন্দেহ, বাঙালী সৈন্যরা রণক্ষেত্রেও নিজের ডিউটি না করে গল্পগুজবে মত্ত ছিল।

লেখকমশাই, আপনি বলছেন, লেখকরা, সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা, টি ভি-র ডিরেকটররা কেউ নাটক খুঁজে পাচ্ছেন না হাওড়ায়, হুগলীতে, বালিগঞ্জে, কসবায়, খিদিরপুরে, বেহালায়, চুঁচড়োতে, মালদায়, কুচবিহারে, রাণাঘাটে, বারুইপুরে।

জন্মের কথাটা যখন উঠলোই তখন মুখে-মুখে একটা গল্প তৈরি করা

যাক। মনে করুন, এখন থেকে তেত্রিশ বছর আগেকার কথা। আপনি ভারী নরম, অত্যন্ত সুন্দরী, আদরে পালিতা রূপসী এক রমণী। আপনার বাবা অনেক আশা করে সমস্ত শরীরটা গহনায় মুড়ে এক সো-কল্‌ড ভাল পাত্রের হাতে আপনাকে তুলে দিয়েছিলেন। পাত্রের রূপ আছে, রুজি-রোজগার আছে, প্রতিষ্ঠাপন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই নিজস্ব বাটীও আছে। ধরা যাক সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে আপনি যেখানে সংসার পাততে এলেন সেই জায়গাটি হলো হাওড়ায় ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেন।

আপনি অতি সরল বাংলার বধূ—স্বামী ছাড়া একমাত্র অন্য পুরুষ যাকে আপনি জানতেন তিনি আপনার পরমারাধ্য পিতৃদেব। আপনি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন আপনার স্বামী-দেবতাটি কোনো কম্মের নন। সারাক্ষণ কেবল চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা এবং বিগ-বিগ বাত। সংসারের কোনো ব্যাপারেই কোনো দায়দায়িত্ববোধ নেই। কয়েকটা টাকা গৃহিণীর দিকে মাঝে-মাঝে ছুঁড়ে দিয়ে বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকেন। তাসের আড্ডা থেকে কখন ফিরবেন তা ঠিক করেন ইয়ার-বন্ধুরা। আপনি আপনার সন্তানসম্ভাবনা নিয়েও দুর্বল শরীরে অনাহারে থেকে তাঁর জন্য বহু রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

অনেক রাতে স্বামীদেবতা বাড়ি ফিরলেন। ওই সময়ে উনুনের আগুনে আপনি স্বামীর দুধটা ঠিক গরম করতে পারলেন না বলে একটু বকুনিও খেলেন। কর্মক্ষেত্রে মেরুদণ্ডহীন ক্রীতদাস আর বাড়ির ভিতরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জনাব খাপ্পা খাঁ-এর ভূমিকা সম্বন্ধে যদি কোনো ছবি আঁকতে চান তাহলে যে-কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালী বাড়িতে আপনি ঢুকে পড়ুন, ভিডিও ক্যামেরাতে চলচ্চিত্র তুলে নিন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই খাঁ সাহেব নিজের জামাকাপড় কোথায় থাকে জানেন না, এই জাঁহাপনা কখনও ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে খান না, এই শা-এন-শা ইচ্ছাপ্রকাশ মাত্র খাওয়া না পেলে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীর মুণ্ডু নেবার আদেশ দেন। কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ ওঠে না, কারণ অনেক ভাগ্য করে এঁরা

অতি কোমল বাঙালী রমণীদের স্বামী-দেবতা হয়েছেন।

গয়ংগচ্ছ স্টাইলে মুখশুদ্ধি মশলা চিবোতে-চিবোতে স্বামীদেবতা অর্ধেক দিন বিলম্বে কর্মক্ষেত্রে হাজির হন। দেরি করার স্বভাবটা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু দোষ চাপানো হয় বাড়ির মেয়েমানুষদের ওপর। এদের নাকি কোনো সময় বোধ নেই। টাইম-সেন্স নেই—এটা তো সত্য কথা —সময়ের গতিপ্রবাহ সম্বন্ধে সামান্য খবরাখবর জানা থাকলে, কোন রমণী আমৃত্যু পুরুষের এইসব নবাবীপনা সহ্য করতো?

আজ স্বামীদেবতার কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিস যাওয়া সম্বন্ধে খুব আঁঠা। কারণ, গতকাল তিনি আপিসের জন্যে সংসার-প্রাসাদ থেকে বেরিয়েও আপিসে পৌঁছতে পারেননি। আসলে তিনি আপিস ও সংসারের প্রতি দায়দায়িত্বর কথা ভুলে নেহক প্রবৃত্তির বশে মোহনবাগান মাঠে লাইন দিয়েছিলেন সকাল এগারোটা থেকে। সকাল থেকেই তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রী নিচুগলায় সলজ্জভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে তার শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না।

স্বামীদেবতা হুঙ্কার দিয়ে হুকুম করলেন, "একবার নিয়ে এসো তো হাসপাতাল আউটডোরের কাগজটা।" ওইখানে কত তারিখ লেখা আছে? ডেলিভারির প্রত্যাশিত দিন? জাঁহাপনা তিনি, হাওড়া হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডের নার্সের লিখন তিনি বুঝে নিয়েছেন, এখনও সপ্তাহখানেক দেরি।

হিজ হাইনেস বিবাহিত নিত্যসেবিকার কাছ থেকে পান চাইলেন, খয়ের চাইলেন, চুন চাইলেন, দুটো সুপুরি এক্সট্রা অর্ডার করলেন। তারপর স্ত্রীর শরীর ও আসন্ন বিপদের কথা কানে না তুলেই ছাতা বগলে নির্লজ্জভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, কারণ আজ আপিস কামাই করলে সায়েবের কোঁতকা খাবেন। কোঁতকা খেলে বীরশ্রেষ্ঠ বাঙালী পুরুষজাত একখানি দেখবার জিনিস—বিনয়ে বিগলিত রসমালাই। চোখে প্রেমের বন্যা, মুখে গদগদ ভাব। যিনি তাড়না করেছেন তাঁর কৃপাভিক্ষার জন্যে করুণসুরে আবৃত্তি 'নিঠুর হে এই

করেছো ভাল। এমনি করেই কোঁতকা মেরে যাও অধমকে। তবে, চেয়ারে আমাকে পাবে, কাজে আমাকে পাবে না। আমার গতরের পরতে-পরতে ঘুন ধরেছে, আমার দ্বারা কাজ হয় না। আমি স্রেফ কাজের ওপর বসে থাকি। কাজ দেরি করিয়ে দেওয়াই আমার স্বধর্ম, আমার স্বভাব।

এদিকের নাটকীয় দৃশ্যটা আপনি ভাবুন লেখকমশাই। আপনারা তো ড্রামা খুঁজে পাচ্ছেন না বাঙালী জীবনে, তাই দলে-দলে ছুটছেন বিদেশে। ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনের ছোট্ট বাড়িতে সকাল থেকেই শরীর খারাপ হতে-হতে অসহায় গৃহবধূর আর ভরসা হলো না। ভবতুপুরে কোনোরকমে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে পোঁটলা হাতে আউটডোরের কাগজ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন পূর্ণগর্ভা রমণী রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। একখানা রিকশা বটতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দুস্তানী চালক প্রথমে বলেছিল, যাবে না। তারপর আড়চোখে সম্ভাব্য যাত্রীর শারীরিক অবস্থা দেখে তার মায়া হলো। দরদস্তুর পর্যন্ত করলো না। জিজ্ঞেস করলো, "আর কেউ নেই ?"

লজ্জায় রমণী জানালেন আছে, আগেই চলে গিয়েছে হাসপাতালে। তারপর পথে পাছে কিছু হয়ে যায়, জ্ঞান না থাকে তাই রিকশাওয়ালার পাওনা টাকাটা তার হাতে আগাম দিয়ে দিলেন। তারপর নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে সামনের পর্দাটা টেনে দেবার জন্যে রিকশাওয়ালার কাছে কাতর আবেদন জানালেন।

হাওড়ার রাস্তা ধরে রিকশা এগিয়ে চলেছে। মাঝপথে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সন্ধ্যা-বাজারের কাছে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টি তো নামবেই। নিজেই যে সে বাদলা মেয়ে। তার বিবাহের দিনে বৃষ্টি এসেছিল। আজও সারা আকাশ জুড়ে ছিল কালো মেঘের সমারোহ। বাদলদিনেই তো যত ঘটনা ঘটে।

অবশেষে রিকশা পৌঁছেছিল প্রসূতি সদনে। রোগিনী একলা এসেছে শুনে সবাই অবাক। কিন্তু তখন প্রশ্নোত্তর অথবা বিস্ময়

প্রকাশের তেমন সময় নেই।

একজন দাই তবু ফুটুনি কেটেছিল, "স্বামী কোথায়? বে-থা হয়নি নাকি?"

"ছিঃ, ছিঃ, অমন কথা মুখে আনতে নেই দিদি। আমি যে মোচা পায়ে নিয়ে খাটে শুয়ে ঘাটে যেতে চাই।"

সেদিন সমস্ত রাত সংজ্ঞাহীন থেকেছিল সেই রমণী। সন্তান এসেছে অপরাহ্নে। কিন্তু কোনো খোঁজখবর হয়নি।

পরের দিন এগারোটায় মুহূর্তের জন্যে দেখা হয়েছে সন্তানের মহামান্য পিতৃদেবের সঙ্গে। প্রথম রসিকতা: "আর দুদিন দেরি হলে কত সুবিধে হতো। শনি-রবিবার পড়ে যেতো, আমাকে বিনা খবরে কামাই করতে হতো না।"

"রিকশাওয়ালা বাড়িতে খবর দিয়ে গিয়েছিল। তবে চালু মাল। শুনলাম তোমার কাছ থেকে ভালো পয়সা নিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে, আমাকে বলে কি না, আরও টাকা দিতে হবে গাড়ি ধোয়ার জন্যে।"

লেখকমশাই, জন্মমুহূর্তের এইসব উত্তেজনায় নাটকীয়তা পাওয়া যাচ্ছে না? আপনি কী বলেন?

আর একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। মনে করুন এই যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করলো, সে যখন বড় হবে তখন তো বলবে 'পৈতৃক' শরীর। মানুষের শরীর কি মাতৃক নয়? ডাক্তারবাবুরা কী রায় দেবেন তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু আপনারা? লেখকরা কী বলেন?

বিদেশযাত্রী লেখকমশাই বোধহয় প্রথম ধাক্কাতেই অস্বস্তি বোধ করছেন। শরীর কেন মাতৃক নয় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

আমি বললাম, "আপনার লেখা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। যখন বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম তখন মা আমাকে আপনার 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' উপহার দিয়েছিলেন। আপনার দেখা আমেরিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই ওদেশে গিয়েছিলাম।"

লেখক লজ্জা পাচ্ছেন। "বহুলোক এক সময় তাই করছিল সত্তরের দশকে যখন আমেরিকার দরজা খুললো ভারতবর্ষের জন্যে। তারপর নিশ্চয় আপনি হেসেছেন আমেরিকা সম্বন্ধে আমি কত কম জানি তা বুঝতে পেরে।"

লজ্জার কিছু নেই, পৃথিবীর এই নিয়ম। আমাকে যিনি প্রথম ইংরেজি এ বি সি শিখিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা হলো। গায়ে হাত বুলোলেন, "তুই কত জানিস! তুই কত পণ্ডিত! খোদ আমেরিকানরা তোর পায়ের গোড়ায় বসে লেখাপড়া শিখছে। অথচ সেই সেদিন তুই এ বি সি ঠিক করে লিখতে পারছিলি না বলে বকুনি খেলি আমার কাছে। 'কিউ' লিখতে তোর খুব কষ্ট হতো।"

আমি পরে ইংরিজী অনেক শেখেছি বলে আমার এ বি সি শেখানো মাস্টারমশায় মিথ্যে হয়ে যাননি। এই হয় পৃথিবীতে। সামান্য জ্ঞান নিয়ে, একটা প্রচলিত ধারণা নিয়ে মানুষ বিদেশে আসে। তারপর সেদেশের জল-হাওয়ায় সে পুষ্ট হয়ে ওঠে, কখনও-কখনও একাত্মও হয়ে যায়।

"আপনি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' এবং 'যেখানে যেমন' লেখবার জন্যে বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন?" আমার প্রশ্নে লজ্জা পেলেন লেখকমশাই।

"না ভাই, গোটা আষ্টেক সপ্তাহ। তারই মধ্যে যা দেখা—প্রথম ইমপ্রেশনটা অনেক সময় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্রেশন হয়ে ওঠে।"

তা হয়তো ঠিক, লেখকমশাই।

এই ধরুন, এতোক্ষণ ধরে সন্তানসম্ভবা রমণীর মাতৃত্বে উন্নীত হবার যে-গল্পটা তৈরি করা হলো, তার বিস্তারিত বিবরণ যদি সন্তানের কাছে মা কখনও কোনো দুঃখের মুহূর্তে বলে ফেলেন এবং সেইটাই যদি পিতৃদেব সম্বন্ধে ছেলেটির প্রথম ধারণা হয়, তাহলে পিতৃদেব সম্পর্কে সেই

ছেলের মনোভাব কেমন হবে বুঝতেই পারছেন। সে যদি অন্য অভিজ্ঞতা না পায়, তাহলে কোনো সময়ে সে ভেবে বসতে পারে সমস্ত বাঙালী পুরুষসমাজই এইরকম।"

ওসব কথা ভাল লাগছে না আপনার, লেখকমশাই। আমি আপনার বিষয়েই ফিরে যাচ্ছি। "আচ্ছা আপনি আট সপ্তাহে বিদেশে যা দেখেছেন অনেকে হয়তো আঠাশ বছরেও তা খুঁজে পায় না।"

লেখক বললেন, "আসল কথাটা কি জানেন, নতুন কোনো জায়গায় নতুন মানুষ হাজির হলে দেখাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। যেখানে আপনি তিলে-তিলে বড় হয়ে উঠেছেন সেখান সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করা অনেক শক্ত। এইজন্যেই তো লেখকরা বেরিয়ে পড়তে ভালবাসেন, যে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর দায় নেই দায়িত্ব নেই তার সম্বন্ধে কথা বলা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।"

কুড়ি বছর পরে লেখক আবার চলেছেন আমেরিকায় লেখক বলছেন, "হঠাৎ নেমন্তন্ন এসে গেলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মনস্থির করে পথে বেরোলাম, যদিও ভ্রমণ আমার মেজাজে নেই, রক্তে নেই। মানুষ দেখবার সম্ভাবনা যদি না থাকতো তাহলে কেউ আমাকে লোকনাথ চাটুজ্যে লেনের বাড়ি থেকে বের করতে পারতো না।"

আমি বললাম, "সেবারে আমেরিকায় যত বাঙালী দেখেছিলেন সবাই ঘরমুখো। দেহ রয়েছে বিদেশে, কিন্তু মন রয়েছে স্বদেশে। এখন বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা আলাদা। এ-অঞ্চলের বাঙালী, ও-অঞ্চলের বাঙালীর সঙ্গে সামাজিক সম্মেলন করছে, সাহিত্য সভা বসছে, দেশের গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে —কিন্তু এঁদের দেখলেই বুঝতে পারবেন, নিজেদের নড়াবার চড়াবার সেই আদি উৎসাহ আর নেই। ফেরা যে যাবে না তা তাঁরা মনে-মনে বুঝে নিয়েছেন।"

"লেখকমশাই, আপনি তো জানেন সাদা অ্যাংলো-স্যাকসনদের তুলনায় আমাদের ইঞ্জিনের হর্স-পাওয়ার কম। আপনি অতি অল্প

সময়ে এবারে প্রবাসে কী করবেন ?”

লেখক মশাই চুপ করে থাকলেন। আমাকে অকারণে হাতের তাসগুলো দেখাবেন না।

অগত্যা আমিই সাজেশন দিলাম। “আমার মনে হয়, বেশী কা না করেই আপনি এবার অনেক উপাদান পেয়ে যাবেন। আপনি স্রেফ বিদেশে ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দেখুন। এই যে আমাদের দেশের লোকের ধারণা আমাদের মেয়েরা কস্মিনকালেও পাল্টাবে না ত কতখানি ঠিক তা আপনি বাঙালী-আমেরিকানদের দেখেই স্থির করুন।”

মিস্টার শংকর, আপনার কখনও কি মনে হয় না, এদেশের পুরুষরা তাদের ডবল স্ট্যানডার্ড দিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করে চলেছে ? যে-দেশের মেয়েদের সর্বনাশ হয়ে যায় সেদেশে সুস্থ পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম হবে কী করে ? আপনার কি মনে হয় না, নিজের ঘরে মেয়েদের অসম্মান করে সমস্ত বাঙালী জাতটাকে আমরা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছি ?

মুক্তির স্বাদ পেয়ে আমাদের মেয়েরাও কী হতে পারে তাই আপনি এবারে অনুগ্রহ করে দেখুন। আপনাকে অনেক উপাদান আমি নিজেই দিয়ে দেবো। আপনি আনন্দ পাবেন।

মন ভরছে না বুঝি, লেখকমশাই ? এই নিজেকে চেপে রাখা, নিজেকে কোনো অবস্থাতেই প্রকাশিত না হতে দেওয়া এইটাই হলো দাস জাতির লক্ষণ। আমরা যে স্বাধানতা পেয়েছি তা যে কেবল কাগজে স্বাধীনতা, আসল স্বাধীনতা নয়, এটা তারই প্রমাণ। যদি বিদেশে বিশেষ কোনো ইচ্ছে থাকে তাহলে বলুন।

লেখক এবার মুখ খুললেন। “গতবারে যখন এসেছিলাম তখন ভাগ্নী ছিল এই দেশে। সুচরিতা নাম। তার সূত্র ধরে আমেরিকান সমাজের একটা দিক—বার্ধক্য সম্বন্ধে একটা চমৎকার ছবি পাওয়া গিয়েছিল।”

বুঝেছি লেখকমশায়ের অভিসন্ধি! বড্ড বড়লোকের জাত, বড্ড

সমৃদ্ধি ও সাফল্যের দেশ আমেরিকা। এরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে বসেছে। এদের একটা দুর্বলতা, কোনো একটা বেদনা অথবা ব্যর্থতা খুঁজে পেলে আমাদের মানসিক ভারসাম্যটা ফিরে আসে। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠবো, 'দেখলে এতো 'শো', এতো সুখ—এসব বাইরের। ভিতরে চোখের জল লুকিয়ে আছে ঠিকই।'

জানেন লেখকমশাই, ওই যে মহিলাটি যিনি প্রসবের দিনে একলা রিকশা চড়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল, যেখানে যত হাসি সেখানে তত কান্নার ব্যবস্থা থাকবেই। অভাগা বাংলা তো, তাই যতসব অবাস্তব আইডিয়া! এরা জানে না যে এই পৃথিবীতে মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ বেড়েই চলেছে। দুঃখের সঙ্গে পৃথিবীটাকে ফিফটি-ফিফটি ভাগ করে নেবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পোড়া বাংলা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও করা হয়নি।

লেখকমশাই চুপ করে আমার কথা শুনে যাচ্ছেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, "কালীধন আমাকে বলেছে, ওদেশে যারা একা থাকে তাদের একটু দেখে আসবেন।"

আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে কালীধনের ওপর। দোকলা হয়েও যারা এই ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনে সম্পূর্ণ একলা তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে কোনো লেখককে তো উৎসাহিত করলে না? সিংগল মানুষদের দেখার জন্যে জাহাজভাড়া করে বিদেশে যাবার কী প্রয়োজন? তোমাদের কী ধারণা ভারতবর্ষে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা নেই?

"তুমি কোন ইস্কুলে পড়েছিলে?" জানতে চাইছেন শংকরদা।

এই লেখক-লেখক ভাবটা ভাল নয়, মানুষে-মানুষে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তাই দাদা পাতিয়ে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

আমি বললাম, "শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে। আপনি, শঙ্করীপ্রসাদ বসু. নিমাইসাধন বসু তো খুরুটের বিবেকানন্দ ইস্কুলে ছাত্র ছিলেন, যা পরে কাসুন্দিয়ায় উঠে গেলো ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের কাছে। ওইখানেই আমার লেখাপড়া করা উচিত ছিল, বাড়ির কাছে হতো। কিন্তু…"

"ইস্কুলের ব্যাপারে আবার কিন্তু কেন?" প্রশ্ন করেছেন শংকরদা।

"কিন্তু মানে, আমার পিতৃদেবের প্রেস্টিজে হাত পড়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের কে যেন একবার শনিবারের গীতা ক্লাস থেকে বাবাকে চলে যেতে বলেছিলেন। বাবা অবশ্য একটু মদ্য পান করে গীতাভাষ্য শুনতে গিয়েছিলেন।

"বাবার বক্তব্য, 'আমি তো মাতলামি করিনি, আমি তো গোলমাল করিনি, একটু খাওয়া-দাওয়ার পরে হঠাৎ খেয়াল হলো আজ মহারাজের গীতা ক্লাস আছে, আমি ড্রিঙ্কস বন্ধ করে ছুট করে ধর্মতলার বার থেকে আশ্রমে চলে এলাম ধর্মে মন দেওয়ার জন্যে, কোথায় প্রশংসা করবে, তা নয়. আমাকে মাতাল বলে চলে যেতে বলা!'

"নিজের ইজ্জতকে অক্ষত রাখতে গিয়ে পিতৃদেব একটি কমবয়সী বালকের প্রতিদিনের কষ্টের কথা ভাবলেন না। বাড়ির পাশের বিবেকানন্দ ইস্কুলে ভর্তি না করে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন অনেক দূরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে।

"যাঁরা জানেন না, তাঁরা ভাবছেন যাঁহা বিবেকানন্দ তাঁহাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা হাওড়া-কাসুন্দে পাড়ার ইতিহাসের খবর রাখে তারা জানে, দুই প্রতিষ্ঠানে রেষারেষি ছিল যথেষ্ট। বিবেকানন্দ থেকেই এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের উৎপত্তি—বিবেকানন্দের মাস্টারমশাইরা একসময় তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের সূচনা করেছিলেন।

"যতই রেষারেষি থাক, ভিত যখন এক তখন অনেক কথামৃত, কর্মযোগ আমাকেও নিয়মিত হজম করতে হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন, যত মত তত পথ, মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা ইত্যাদি

ব্যাপার- স্যাপারগুলো আমার যথেষ্ট সড়গড়।

"আপনার দুঃখ হয় না শংকরদা? বিবেকানন্দ ইচ্ছে করলে এদেশের পুরুষগুলোকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মানুষ করে নিতে পারতেন। সোজা পথে না-গিয়ে সব ক'টা আহাম্মককে তিনি এককথায় ভগবান করে দিলেন।"

শংকরদার মধ্যে অত্যধিক স্নেহপ্রশ্রয় রয়েছে। আমাকে ব্যঙ্গ না করে বললেন, "তোমার মধ্যে বুদ্ধের বিপ্লববাদ রয়েছে। বৌদ্ধর সঙ্গে হিন্দুর তফাৎ কি একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল স্বামীজীকে···।"

"উঃ শংকরদা! ভদ্দরলোক ওই থার্টিনাইন ইয়ারসের মধ্যে কত কোটেশনই ছেড়ে গিয়েছেন এবং এখনও সব নির্জলা সত্য বলে পাবলিক বিশ্বাস করে যাচ্ছে। আপনারা মানুষকে এবার থেকে একটু অবিশ্বাসী হতে বলুন, তাতে মহাপুরুষদের জীবনটা বুঝতে অনেক সহজ হবে।"

"শোনো সুশোভন, বিবেকানন্দ লিখেছেন—বৌদ্ধধর্ম বলছে—সমস্ত কিছুই ভ্রম বলে জেনো; কিন্তু হিন্দু বলছে, এই ভ্রমের মধ্যে সত্য বিরাজ করছে।' বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলোকে জীবনে প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাসধর্মের। বৌদ্ধধর্ম তাই সন্ন্যাসীদের হাতে চলে গেলো। আর সন্ন্যাসীকে পেন্নাম ঠুকলেও হিন্দুধর্ম কিন্তু সংসারীদের হাতেই রয়ে গেলো।"

লেখকমশাই কিছুক্ষণ নোটবইতে কী সব টুকে নিলেন। বোধহয় আমার সঙ্গে ওঁর মত ও ভাব বিনিময়ের সারাংশ।

আমি অনেকক্ষণ ধরে শংকরদাকে বলছিলাম, মিনতি বাগচী ও অপরেশ বাগচীর সম্ভাব্য গল্পটা। মিনতিরা সংসারে কত অসহায়। এদেশের মেয়ে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। বিদেশ থেকে পাঠানো আমার চিঠিতে এই কথা

পড়ে খাপচুরিয়াশ পিতৃদেব প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন—"এদেশে পুরুষমানুষরাই অভাগা ; এখানে মায়ের ইচ্ছেয় জন্ম, বাপের ইচ্ছেয় কর্ম, আর ছেলের ইচ্ছেয় শ্রাদ্ধ।"

নিজস্বতা বলতে এদেশের পুরুষমানুষদের কিছু নেই এই কথাটা সর্বত্র জাহির করতে অপরেশ বাগচী মহোদয় কখনও নিরুৎসাহ হননি।

লেখকমশাই 'ছেলের ইচ্ছেয় শ্রাদ্ধ' কথাটা ঝটপট নোটবুকে জমা করে নিলেন। জানা-অজানা লোকের মুখে-মুখে নাকি এমন সব মহা মূল্যবান উক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে যা লেখকদেরও সাধ্য নেই সৃষ্টি করার।

এরপর লেখকমশাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। লোকটার যে ঘর ছাড়া হবার অভিজ্ঞতা নেই তা ওঁর ঘুমন্ত মুখটা দেখে বোঝা যাচ্ছে- কোথায় যেন একটু অসহায় ভাব। এইসব কলমে জোর থাকবে কী করে? এই লেখকের কলম কী করে নির্বীয জাতটাকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে নতুন করে গড়বার দুর্বিনীত দুঃসাহস দেখাবে?

বেচারা লেখক অনেক কষ্টে প্রবাসী বাঙালীদের কথা 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'য় লিখেছিলেন। তারপর বিশ বছর ভ্রমণে কোনো রুচি ছিল না। এখন বাঙালী সম্মেলনের নেমন্তন্নে ভদ্রলোক বিদেশে যাচ্ছেন ক'টা দিনের জন্য। বাইরে থেকে ঐ দেশের কতটুকুই বা দেখবেন যদি না আমরা ওঁকে আমাদের দৃষ্টিদান করি। আমার মায়ের গুরুতর অসুখের সময় কালীধন এবার মেডিকেল কলেজে আমার অনেক উপকার করেছে। চরম বিপদের সময় সে আমার যা উপকার করেছে তার কিছুটা আমি শংকরদার মাধ্যমে অবশ্যই পুষিয়ে দেবো। আমি কালীধনের জানাশোনা হাওড়া-কাসুন্দের দিশাহারা লেখককে বঞ্চিত করব না।

শংকরদা নিশ্চয়ই বেশ সুখী মানুষ। অল্প সময়ের মধ্যে কোমরে কষি বাঁধা অবস্থায় কেমন সহজে ঘুমের দেশে চলে গেলেন!

আমার অবস্থা ঠিক উল্টো। চলমান শকটে কিছুতেই আমার ঘুম আসতে চায় না, বিমান-বালিকার দেওয়া ঠুলি চোখে লাগালেও। আমার

যেন মনে হয় যেখানে আমার থাকা উচিত ছিল সেখান থেকেই আমি দূরে সরে যাচ্ছি। দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্যেই এইসব দ্রুতযান, দূরত্ব মুছে দেবার জন্য নয়। মিলনে এদের মন নেই, বিচ্ছেদই এদের একমাত্র ব্যবসা।

ঘুম আমার চোখে নেই। আমি ভাবছি, কী অবস্থা! বলা নেই কওয়া নেই আজ কয়েক ঘণ্টা আগে দুড়ুম করে ঠিক করলাম আর কলকাতায় নয়। পিতৃদেব সন্তুষ্ট হলেন না, লোকাচারের কথা তুলে ভয় দেখালেন। ইঙ্গিত দিলেন, আপনজনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওইসব কথা শুনলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মুখের ওপর বলে দিতে চাই, যা হয়েছে তা যথেষ্ট হয়েছে। পিতৃদেব তখন সমাজের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু আমি ওই ফাঁদে পা দিতে রাজি নই। সমাজ এখানকার ভীষণ সহনশীল। প্রত্যেকটা পুরুষমানুষের ডবল খেলা এরা কেমন সহ্য করে যাচ্ছেন। সেই জ্ঞান হওয়া থেকে আমি ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনে দেখে যাচ্ছি অপরেশ বাগচীরা যখন খুশি 'ড্রুড', যখন খুশি 'টামাক' খেয়ে যাচ্ছেন, কেউ কোনো কথা বলছে না।

পিতৃদেব এখন হেড অফ দি ফ্যামিলির ভূমিকায় কেমন চমৎকার অভিনয় করে চলেছেন। এই যে সাজানো সংসার, এই যে আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্র এসবেরই স্থপতি তিনি। এর জন্যে সারা জন্ম ধরে কত ত্যাগ, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে!

এই যে দুপুরবেলায় হঠাৎ আমার জন্মভূমি থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে এটাতে যা কিছু আপত্তি তা নিজের সন্তানদের সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্ত আগতপ্রায় বলে নয়, স্রেফ আত্মীয়রা ওঁর সন্তান সম্বন্ধে কী বলতে পারে সেই ভেবে।

হয়তো খিটিমিটি বাঁধতো। কারণ পিতৃদেব যা কিছু নির্দেশ দেন, আমার ঠিক তার উল্টো করতে ইচ্ছে করে সেই দিন থেকে যেদিন ওই মোচার তরকারি খাওয়াবার জন্যে রাতদুপুরে তাঁকে তাসের আড্ডাখানা

থেকে ডেকে আনতে গিয়েছিলাম। আমার মায়ের সেদিন যা অসহায় অবস্থা। মানুষটার একটুও দোষ নেই, তবু তাকে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে।

আমার মনে আছে, পরের দিন সকালে মোচার ঘণ্টর অবশিষ্ট যা ছিল তা নবাবী কায়দায় ভক্ষণ করে পিতৃদেব কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোলেন। যাবার আগেও মাকে অনেক কটু কথা বললেন। আমার মা একবারও প্রতিবাদ করলেন না। অপরাধীর মতন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দশ বছরের আমি ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখলাম, মা দুপুরে খাননি। তখনও গুম হয়ে জানলার কাছে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছেন।

মা বললেন, "তোর বাবা আমার ওপর রাগ করেছেন। ভীষণ রাগী মানুষ। রাগের মাথায় পুরুষ মানুষরা কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।"

আমি তো অবাক। "মা তোমারই তো উচিত ছিল লোকটার ওপর শোধ নেওয়া, মনে করিয়ে দেওয়া বাড়িটা হোটেল নয়।"

মা আমাকে বললেন, "তুই এক কাজ কর বাদল, আমি তোর জলখাবার যোগাড় করছি, তুই ততক্ষণে বোসেদের বাজারটা একবার ঘুরে আয়। একটা মোচা নিয়ে আয় ভাল দেখে।"

মা আমার আপত্তি শুনলেন না, জোর করে ওই বিকেলবেলায় ছোটোবাজারে পাঠালেন। ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পরে। মোচা বিকেলবেলায় পাওয়া যায় না মা। আলু, পটল, ডিম আছে। আর কিছু নেই। মোচার জন্যে যেতে হবে সকালবেলায় যখন গাঁয়ের চাষীমেয়েরা আসে।

মা শুনলেন না। বললেন, "ঝট করে কালীবাবুর বাজারটা দেখে আয়।" আমি যে ইস্কুল থেকে এসে খাইনি তা পর্যন্ত মায়ের খেয়াল হলো না।

মা এবার আঁচল খুলে আমাকে আরও পয়সা দিলেন। "কালীবাবুর

বাজারেই যখন যাচ্ছিস তখন গর্ভমোচা আনবি।"

'গর্ভজ্যেঠা' কথাটা পিতৃদেবের মুখে শুনেছি একবার। আমার দোষের মধ্যে বলেছিলাম, "পচা জ্যেঠার ওখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারো না?" মা ওই যে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে রাত্রে বসে আছে, দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল। গর্ভজ্যেঠা কথাটা পিতৃদেব তখনই ব্যবহার করেছিলেন। অনেকদিন পরে হাড়কাটা গলির রসবতী বারাঙ্গনা সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটার মানে কী?

বুকের কাপড় ঘরের মেয়েদের মতন সামলাতে-সামলাতে সুরসিকা সরস্বতী উত্তর দিয়েছিস, "যে বলেছিল সে ঠিক বলেছিল! সে তোমাকে বুঝেছিল। গভভো অবস্থায় মার পেটেতেই যে পেকে উঠেছে, সবকথা অসময়ে যে জানতে পেরেছে সেই গর্ভজ্যেঠা।"

না সরস্বতী, প্লিজ এই সময় তুমি আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না। আমি তোমাকে ভুলতে চাই। ইন এনি কেস এই সময় হাড়কাটা গলির কথা মনে ঢুকতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখন আমার বাল্যবয়সের স্মৃতিচারণা করছি—আমার মায়ের কথা ভাবছি। এই মুহূর্তে আমি এখন একজন অপাপবিদ্ধ সুকুমার-মতি বালক। আমার মা আমাকে যে করে হোক একটা গর্ভমোচা কিনে আনবার নির্দেশ দিয়েছেন। সামান্য জিনিস নয় এই মোচা, আমার মা এই বস্তুটি দিয়েই স্বামীর আগ্নেয়গিরিতে শান্তিবারি সিঞ্চন করতে চান।

অনেক কষ্ট করে, একটা লোককে দুপুরের ঘুম থেকে তুলে কালীবাবুর বাজারের উত্তরদিক থেকে যে মোচা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম তা দেখে মায়ের দুঃখ কিন্তু শতগুণ বেড়ে গেলো।

"ওরে বাছা, তোকে যে গভভো মোচা আনতে বললাম।"

"এই তো ছিল, মা।"

"গভভো মোচা কাকে বলে তাই বুঝলি না। লাল-লাল পাতার ভিতরে ছোট-ছোট কচি-কচি সবুজ কলা হয়ে থাকে। এমন রান্না হবে, মনে হবে মাংস।"

মা এবার একটা লাল খোলা সরিয়ে মোচার একটা ফুল পরীক্ষা করে দেখলেন। "এতো ফুল নয়—সজনে খাড়ার চেয়ে শক্ত।"

মাকে কত অনুনয় বিনয় করলাম, "তুমি কেটে জলে ভিজিয়ে রাখো মা, ঠিক কষ বেরিয়ে নরম হয়ে যাবে।"

আমি অন্যায় করেছিলাম। ওই সময় আমার উচিত ছিল খেলতে না-বেরিয়ে বাড়িতে মায়ের কাছে থেকে যাওয়া।

সন্ধেবেলায় বটতলা থেকে ফিরে এসে মায়ের গুরুতর অসুস্থতা দেখলাম। রান্না-বান্না কিছুই হয়নি। মোচার ফুলগুলো ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। মার চোখদুটো লাল। মুখে কোনো কথা নেই: জানলার শিক ধরে বিষম বিরক্তিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মানসিক রোগী আমি এর আগে দেখিনি। মানুষ পাগল হয়ে যায় এই পর্যন্ত শুনেছি। আমার ধারণা ছিল, পাগল মানে যারা রাস্তায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের লজ্জা শরম থাকে না, শীত গ্রীষ্ম বোধ উধাও হয়। তারা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

আমার মা শরীরের জামাকাপড় সব ঠিক রেখেছেন। শুধু স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। মুখে কথাও নেই।

মাকে সেই অবস্থায় দেখে আমার কা কান্না। "মা আমার খিদে পাচ্ছে।"

নিজের অতি আদরের সন্তানের খিদে পাচ্ছে জেনেও মা কোনোরকম ব্যস্ততা দেখালেন না। শুধু বললেন, "মোচাটা খারাপ।"

তারপর যা বললেন, তা আমাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেললো। মা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "কাউকে বলিস না। আমার পায়ের গোড়ায় মোচা দিয়ে বিদেয় করে তোর বাবা আবার বিয়ে করবে। আমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু, আমি মরে গেলেও।"

যথারীতি আমার দায়িত্বহীন পিতৃদেব সেদিনও অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন। কাঁদতে-কাঁদতে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বাবা সব দায়-দায়িত্ব নিজের

মাথায় তুলে নেবেন এই বিপদের সময়।

কিন্তু অন্য ফল হলো। মাকে ওই অবস্থায় দেখে পিতৃদেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হাওড়া-কাসুন্দের কাঁচা ভাষায় কুৎসিত গালাগালি শুরু করলেন। মাগী কথাটা এই প্রথম শুনলাম। মা কথাটা একটা মাত্র বাড়তি অক্ষরের সংসর্গে এমন কদর্য হয়ে উঠতে পারে তা আমার এই কমবয়সের কল্পনাতেও ছিল না। আমার ওই সোনার-বরণী মাকে কেউ একথা বলতে পারে তা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

আমি একদিন পাড়ার ভজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাগী কথাটার মানে কী?

ভজা তখনই প্রচণ্ড পরিপক্ক। বলেছিল, "আর খুনসুটি কোরো না। এমন লালটু-লালটু, গাবলু-গাবলু চেহারা আর মাগী কাকে বলে জানো না! খারাপ মেয়েছেলে!"

মেয়ে খারাপ হয় এ-কথা আমি কখনও বুঝবার অবকাশ পাইনি। আমার মা কোন অপরাধে মাগী হতে যাবে?

ভজা বলেছিল, "মাগীরা নিজেরা খারাপ হয়, অপরকেও খারাপ করে।"

সেই রাত্রে রেগেমেগে বাবা সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নিজের অসুস্থ বউকে কুৎসিত গালাগালি করে এতোই ক্লান্ত যে একবার জিজ্ঞেস করলেন না, আমার খাওয়া হয়েছে কি না?

তখন রাত অনেক। খিদেয় আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে, বিছানায় কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমি উঠে বসে বাবাকে ডাকলাম। বাবা সেদিন আমার পাশেই শুয়েছেন, মাকে অন্য ঘরে একলা রেখে।

"বাবা আমার ভীষণ খিদে পাচ্ছে!" আমি অসহায়ের মতন বললাম। কিন্তু ভীষণ যেন অপমান হলো।

সুখনিদ্রায় বাধা পড়ায় বাবা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "ছাগ্ল

কোথায় মুড়ি-টুড়ি আছে। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আমাকে আর জ্বালাতন করিস না।"

কৌটো থেকে মুড়ি বের করে আমার মনে পড়লো মায়ের কথা। "বাবা, মা যে কিছুই খায়নি।"

পিতৃদেবের পাষাণহৃদয়ে কোনো সহানুভূতি নেই। নির্লজ্জভাবে মন্তব্য করলেন, "যেমন তাঁদড়ামি তেমন চিকিৎসা। থাক্ না-খেয়ে —পেটের জ্বালা ধরলে পাগলামিও শুধরে যাবে।"

আমি আশঙ্কা করছিলাম, বাবা এবার ওই নোংরা শব্দটা আবার ব্যবহার করবে। আমি রেডি ছিলুম, আমি মুড়ির বাটিটা বাবার নাকের ডগার দিকে ছুঁড়ে দেবো —আমার মাকে খারাপ মেয়ে বলা আমি সহ্য করবো না।

কিন্তু আমার মুড়ি খাওয়া হলো না। মাঝ-রাতে খিধের আগুনটা যেন জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে গেলো। আমি এক গ্লাস জল খেয়ে নিলাম। আমি দেখেছি, পাড়ার ভুতো পাগলা চান্স পেলেই মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েলে জল খায়। চোঁ চোঁ করে জল টানে। জল খেলে খিধের দৌরাত্ম্য যে কমে যায় তা ভুতোও জানে। অথচ আমার মা কিছুই খেলেন না, জলও না।

পরের দিন সকালে বাবা কোনো ব্যাপারেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মেস-বাড়ির লোকদের মতন দোকান থেকে চা আনিয়ে খেলেন।

আমাকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিলেন, "চা খাওয়া ছোটদের ঠিক নয়। স্যার পি সি রায় বলতেন, ওতে ব্রেন খারাপ হয়ে যায়। আমি পরে স্যার পি সি রায়ের লেখা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও অমন কোনো লাইন পাইনি। আমার মনে হয়, আমার পিতৃদেব কথায়-কথায় প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের থেকে যেসব উদ্ধৃতি দিতেন তা প্রায় সবই নির্জলা মিথ্যা। যার নামে যা-খুশি বক্তব্য চালিয়ে দিলেই হলো, কে আর দেখতে যাচ্ছে ?

সেজেগুজে টেরি কেটে পূজনীয় পিতৃদেব অন্যদিনের তুলনায় একটু

আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে রেডি হলেন। পুরনো অভ্যাস মতন কিছুক্ষণ রাজনৈতিক নেতাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন। খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে উত্তেজিত হয়ে মাঝে-মাঝে মন্তব্য করলেন, সব শালা চোর। দেশে ধর্ম বলে কিছু নেই, অধর্মে ভরে গিয়েছে। এই গদিতে বসা নেতাগুলোকে চাবকে কয়েদখানায় পাঠালে তবে যদি মানুষের কিছু মঙ্গল হয়।

এরপর আমার অসুস্থ মায়ের কাছে গিয়ে লম্বা লেকচার শুরু করলেন পিতৃদেব। একবারও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন না, একবারও সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন না, কেমন আছো?

লেকচারটা এইরকম—"দেব দ্বিজে ভক্তি নেই, পুজো-আচ্চা নেই। দিনরাত কেবল ওই নোংরা নবেলগুলো গিলছো। তোমার মাথা তো খারাপ হবেই। কিন্তু আমার সব্বোনাশ আমি হতে দেবো না। আমাকে রোজগার করে বেঁচে থাকতে হবে। স্বামীর রোজগার না-থাকলে সব রস শুকিয়ে যাবে, পেটে টান পড়লেই মাথার ব্যামো বিদায় নেবে।"

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, একবার জিজ্ঞেস করি, "আমি কী খাবো বাবা?"

মায়ের সামনে প্রশ্নটা করতে আমার লজ্জা লাগলো। শেষ পর্যন্ত বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পিতৃদেবের মুখোমুখি হলাম। আমার প্রশ্নটা শুনে পিতৃদেব মাথা চুলকোলেন। "দ্যাখ একটু পরেই ওর গতর নড়বে। না হলে, মুড়ি ফুলুরি-টুলুরি কিনে চালিয়ে দিস—পয়সা ওর কাছ থেকেই আদায় করবি। পয়সার ব্যাপারে পাগলরাও শেয়ানা হয়ে ওঠে।"

বাড়িতে রান্না অন্নের পরিবর্তে এইভাবে কোনো রকমে প্রাণ-ধারণের ব্যাপারে আমার হাতে খড়ি হলো। মায়ের অসুখ তো সারবার লক্ষণ নেই। কখনও একটু ভাল থাকেন, আবার কখনও শোচনীয় অবস্থা। আমার চোখ ফেটে জল আসে, কিন্তু আমার মায়ের অসহায়

অবস্থা দেখে চোখের জল লুকিয়ে রাখি। হয়তো অসুস্থ অবস্থাতেও ছেলের চোখে জল দেখে আরও কষ্ট পাবেন।

হাঁড়ি চড়ানো পর্ব বন্ধ রেখে জীবনধারণপর্ব ক্রমশ সড়গড় হতে লাগলো।

এইভাবে আস্তে-আস্তে শ্যামাশ্রী সিনেমা থেকে হাজার-হাত কালিতলা, শিবপুর ট্রামডিপো থেকে জোড়াপুকুর পর্যন্ত যেখানে যত মুড়ি-বেগুনির দোকান আছে তা আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ বেঁধে দাও, আমি মুড়ি মুখে দিয়েই বলে দেবো কোন দোকান থেকে কেনা। ফুলুরি চিবিয়েই বলে দেবো, ঠাণ্ডা ফুলুরি কতবার কড়ায় ফিরে সাঁতার কেটেছে খদ্দের ঠকাবার জন্যে।

আমি যখন কলকাতায় সরস্বতী নামক অসতী রমণীর ওখানে যাতায়াত করছি তখনও বউবাজার কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বিভিন্ন ধরনের মুড়ির সদ্ব্যবহার করেছি। মুড়ির সঙ্গে বেগুনি ফুলুরির কোনো রাসায়নিক যোগ আছে—একসঙ্গে পেটে পড়লেই খিদের আগুনটা কনট্রোলে চলে আসে। তারপর গাঁটের কড়ি অনুযায়ী খিদেটাকে দ্রুত কমানো বাড়ানো যায়। পয়সা যত কম কলের জল তত বেশী টানো। অথচ আমার পিতৃদেব বোকামি করে বলতেন, তেলেভাজা মুড়ি খাওয়ার পর জল খেতে নেই—শরীরের সর্বনাশ হয়ে যায়, শাস্ত্রে নাকি বারণ। শালা শাস্ত্রে কোন্ জিনিসের অনুমতি আছে জানতে ইচ্ছে হয়—পিতৃদেবের ফিরিস্তি অনুযায়ী হাঁচি-কাশি থেকে আরম্ভ করে রমণীসংসর্গে সবই বারণ। কিন্তু ভগবানের পুলিশ নেই—তাই যার যা প্রাণ চায় তাই বেপরোয়া ভাবে করে যাচ্ছে। গোটাকয়েক বোকা এবং ভীরু ছাড়া কে ভগবানের বিধি-নিষেধ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, পিতৃদেব যখন যা উপদেশ অথবা নির্দেশ দিয়েছেন তার ঠিক উল্টো করে আমি ঠকিনি। বরং ভালো হয়েছে।

কিন্তু ওই শেষের দিকটা। বিশ্বাস হয়তো করবেন না, কিন্তু

অত দুঃখ, অত যন্ত্রণা ভোগের পরেও আমার মায়ের ভীষণ মায়া পড়ে গেলো স্বামীদেবতার ওপর।

আমার মা মিনতি করেই আমাকে মনে করিয়ে দিলেন কয়েকবার, "লোকটার শরীর ভাল নেই।"

লেখকমশাই এখন নিজের সীটে ফোম্ রবারের সুকোমল প্রশ্রয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমার দৃষ্টি হঠাৎ ওঁর কোলের ওপর রাখা বাংলা বইটার দিকে পড়লো।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইদানীং তেমন আগ্রহ নেই। বড্ড আজে-বাজে বস্তাপচা বিষয় নিয়ে বাঙালী লেখক ও প্রকাশকরা ব্যস্ত রয়েছেন। বিষয়বস্তুর এমন দৈন্য পৃথিবীর কম দেশেই এখন দেখা যায়। বাঙালীরা যে কোয়ালিটি সচেতন নয় তা বাঙালীর ইদানীং কালের সারস্বত সাধনা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

লেখা যাই হোক, আমি এখনও বাঙালী জীবনে রমণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আগ্রহী। বইটায় চোখ বুলোতে হয় একবার।

বাঙালা লেখকদের বিশ্বাস করা দায়। সব জায়গায় ওই দু'নম্বরী ব্যাপার। বই পড়ে, কাগজপত্তর ঘেঁটে, এই-জাতের কোনো দুর্বলতার খবর কোথাও পাবে না।

একটা-আধটা সায়েব কবে কোথায় দু'একটা কটু মন্তব্য করে গিয়েছেন সে-নিয়ে এখনও চান্স পেলে প্রতিবাদ হচ্ছে। অন্যদিকে সব নোংরা হোয়াইট ওয়াশ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের পুরুতমশাই সবাইকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবতা বানিয়ে দিয়েছেন—সবাই সাক্ষাৎ নারায়ণ।

এই যে আমার মা। চিকিৎসা ও সেবায় বিপদের প্রথম ধাক্কাটা কাটবার পরেই মেডিক্যাল কলেজে সেদিন ছোটকাকিমা তাঁকে দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন, দিদি?"

"এবার তোমরা ছুটি দাও আমাকে," মা করুণভাবে উত্তর দিলেন।

আর আমাদের পড়শি ছোটকাকিমা কেমন অবলীলাক্রমে বললেন, "ছিঃ অমন কথা বলতে নেই দিদি। অমন হীরের টুকরো ছেলে যার।

সোনার সংসার সবে গুছিয়ে বসছেন, এমন সময় কেউ এসব কথা মুখে আনে ?”

ছোটকাকিমা নিশ্চয় বছরের পর বছর ধরে মিনতি বাগচীর দৈনন্দিন দুঃখ ও যন্ত্রণার সব ছবি মুখ বুঁজে দেখেছেন। ছোটকাকিমা জানেন, হাসপাতালে যাবার আগে নিজের হাতের সোনার বালা ছেলের বউয়ের জন্যে তাঁর কাছেই জমা দিয়েছেন, নিজের স্বামীকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

তবু ছোটকাকিমা কেমন নিশ্চিন্তভাবে বলেছেন, “তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন। ছেলের বিয়ে দিন। বড়ঠাকুরও খুব কষ্ট পাচ্ছেন।”

বলতে হয় বললেন, কেউ প্রতিবাদও করলো না। এইসব মিথ্যা প্রতি ঘরে-ঘরে জমা হয়েই তো ইতিহাস হয়ে ওঠে।

লেখক সুখনিদ্রায় যাবার আগে জিজ্ঞেস করছিলেন, “আমাদের দেশের সঙ্গে মার্কিন দেশের তফাৎ কি ?”

আমি সোজা বললাম, “আমরা কপটতায় ভুগি—নিজেদের সব দুর্বলতা লুকিয়ে রাখি। আর মার্কিনীরা নিজেদের দুর্বলতারও পাবলিসিটি দেয়। নিজেদের কোথায় দোষ হচ্ছে তা খুঁজে বের করার জন্যে এতো সময় ও এতো গাঁটের কড়ি দুনিয়ায় কেউ খরচ করে না।”

লেখক সন্তুষ্ট হননি। বলছিলেন, “বৌদ্ধদের মতো এরা ভাবছে সবই মিথ্যা। সবাই পাপী-তাপী। আমরা ঠাকুরের দয়ায় ভাবছি, সত্য এরই মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। স্যাকরার দোকানের ধুলোর মতন জীবন, ওরই মধ্যে সোনা আছে। সবাই পাপী নয়—মানুষের খুঁত খুঁজে কী হবে ?”

এসব কথা আমিও শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে আশ্রমের লেকচারে বহুবার শুনেছি। ওসব বক্তৃতা আমার বিশ্বাস হয় না। নিজের বাড়ির মেয়েদের যারা সম্মান দিতে পারলো না তারা কোন সাহসে বিশ্বকে কুটুম্ব জ্ঞান করে ?

শুনুন আমাদের সিমুলিয়ার মিস্টার নরেন্দ্রনাথ দত্তের বিদেশে আস্ফালন মার্কিনী নারী সম্বন্ধে: "তোমরা যেভাবে মন্দকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া ভাল বলো, তাহা আমি পছন্দ করি না।...আমি যখন আশে-পাশে তাকাই, তখন তোমরা যাহাকে নারীজাতির প্রতি পৌরুষসুলভ সৌজন্য বলো, তাহা দেখিয়া আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া ওঠে। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া যতদিন না তোমরা মানবিকতার সাধারণ ভিত্তি-ভূমিতে পরস্পর মেলামেশা করিতে পারিতেছ, ততদিন তোমাদেব নারী-সমাজের যথার্থ উন্নতি হইবে না।" এইগুলিই নাকি বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ।

হা ঈশ্বর, শুনুন লেকচার। "তোমাদের পুরুষ নত হইয়া মেয়েদের অভিবাদন করে এবং বসিতে চেয়ার আগাইয়া দেয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু করে প্রশংসাবাদ। তাহারা বলিতে থাকে, 'মহোদয়া, আপনার চোখ দুটি কি সুন্দর!'...পুরুষ কি করিয়া এতদূর সাহসী হইতে পারে এবং তোমরা মেয়েরাই বা কি করিয়া এইসব অনুমোদন কর?"

আমার মা! মায়ের চোখ দুটির সৌন্দর্য সুদূর বিদেশেও গভীর রাতে আমার মনে পড়ে। কেউ যখন আমার চোখের প্রশংসা করে তখন ইচ্ছে হয় বলি, আমার মায়ের চোখ তো দেখোনি তোমরা।

সেই চোখের প্রশংসা মা যদি নিজের কানে একজন প্রিয়পুরুষের কাছে শুনতেন, পৃথিবীর কী ক্ষতিবৃদ্ধি হতো? পিতৃদেব, আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাসের আসরে কত অমূল্য সময় ব্যয় করলেন, মন্দিরের সামনে ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেবীদের সৌন্দর্য ও শক্তির কত স্তুতি করলেন, একবার অথচ আমার মায়ের শরীর ও সৌন্দর্যের কথা আপনার মনে পড়লো না?

আর বাঙালী জীবনে রমণী বইতে শংকরবাবু নিজেই দাগ দিয়ে যত্নের সঙ্গে পড়েছেন নারীর ওপর অবিচারের কথা। দাগ দেওয়া লাইনগুলো আমারও নজরে পড়ছে: "স্ত্রীলোকদিগের উপর যে-রূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয়

না ; ভ্রষ্ট পুরুষের কোনো সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোনো দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না ; হয়তো আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন ; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন ; পত্নী পুলকিত হয়েন।" উদ্ধৃতির মালিক কোনো আমেরিকা-ফেরত সমাজবিদ্রোহী নন— স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভদ্রলোক সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেশ বাড়লো, কেন যেন আমার ধারণা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র বড্ড সেকেলেপন্থী।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে গেরস্ত বাঙালী সহ্য করতে পারেন না বলে শুনেছি। সহ্য হবে কী করে ? তিনি যে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন বার বার।

নীরদবাবু গত যুগের কলকাতাবাসী ভদ্রলোক বাঙালীর পাপ-পঙ্কিল অন্দরমহলের অবিস্মরণীয় বর্ণনা দিচ্ছেন এক বিপ্রসন্তানের চোখে : দিবা অবসানে "প্রথমতঃ বাটির বৃদ্ধ কর্তা ও তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরে কনিষ্ঠ পুত্রও, ইহারা একে একে তাবতেই বাটি হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন কোন চাকর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইস্থানে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। পাঠকমহাশয়েরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিলেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল···যদিও উপরিউক্ত বৃত্তান্ত পাঠ-করণান্তর অস্মদাদির ইঙ্গিতেই পাঠকেরা মনে মনে হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না, তথাচ ঐরূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চালিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিবেন না।"

"না, এই বর্ণনা নীরদচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত নয়, তিনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন

সম্বাদ সুধাকর পত্রিকার ১৮৩১ সনের ৫ই নভেম্বর সংখ্যা থেকে। উদ্ধৃতিতে নারদ চৌধুরীকে জব্দ করা আজকালকার বাবু-বাঙালীর কর্ম নয়! প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে তাঁর আর একটি উদ্ধৃতি নারী সম্বন্ধে বাঙালী মধ্যবিত্ত পুরুষের ধারণা: "নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল, তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণতা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহার বাধা কি? আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে?..."

লেখকমহাশয় নীলকালিতে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মশায়ের বইতে আরও দাগ দিয়েছেন..."কিন্তু ইহা জানিয়াও যদি পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া উপপত্নীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত হন তবে স্ব-স্ব পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা ঐ অবোধ পুরুষদিগকে বই কাহাকে অর্পিতে পারে? বাস্তবিক এই যে তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার, অতএব তাঁহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি..."

"স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগের প্রতি এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে, উপরিউক্ত লঘুটাচরণ কোন জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে, কি তাহার আর কোনো কারণ আছে? তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে, বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হইত?"

আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হচ্ছে। আমি কেন নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে আগে যোগাযোগ করিনি? আমার কোন সায়েব ছাত্র এ-বিষয়ে ভাল গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে পারবে? এই ধরনের কথা আমি বাবার

আড্ডাতেও শুনেছি। বাবার খোঁজ করতে গিয়ে না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, অন্য গুরুজনেরা মনের আনন্দে আমাকে ডোণ্টকেয়ার করেই নারীজাতি সম্পর্কে ভাবের আদানপ্রদান চালিয়ে যাচ্ছেন।

বেঁচে থাকুন চৌধুরী মশাই! দেশাচার সম্বন্ধে এমন বিস্ফোরক বোমা ছোঁড়ার মতন দুঃসাহস শুধু তাঁর মতন বিপ্লবীরই থাকতে পারে।

পণ্ডিতমশাইদের আদিরসাত্মক কাব্য শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য শুনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা কখনও এতো পরিষ্কার হয়নি। নীরদ চৌধুরীর এই মন্তব্যে দাগ দেননি কেন শংকরবাবু? "এই পণ্ডিতরা দুই উদ্দেশ্যে আদিরসাত্মক কাব্যের ব্যাখ্যা করিতেন। প্রথমত, প্রৌঢ় বয়সে যুবতী স্ত্রীর অনুগ্রহ পাইবার জন্য। ভুঁড়ি, ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী নানাপ্রকার দুর্গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা পত্নীকে প্রতিকূল করিয়া কামপ্রবৃত্তির সাহায্যে অনুকূল করিবার জন্যে আদিরসাত্মক কবিতার সহায়তা লইতেন।·· দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, প্রকাশ্যে ছাত্রদের সঙ্গে বদ রসিকতা করা—কোনও সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে, কোনও সময়ে খোলাখুলি।"

হাটে হাঁড়িভাঙা এখানেই শেষ নয়। নীরদ চৌধুরী নির্দ্বিধায় লিখছেন: "ছাত্রেরা অধ্যাপকের উক্তি মাথা নীচু করিয়া শুনিত। কিন্তু পরে নিজেদের কথাবার্তায় উহার উপর বেশ করিয়া নিজস্ব রং চড়াইত। একটু চাপাভাবে এই উৎপাত আমাদের ছাত্রাবস্থাতেও কিছু কিছু ছিল। আশ্চর্যের কথা এই, রাগিলেও পণ্ডিতমহাশয়ের এই অধঃপতিত কাম হইতেই ভর্ৎসনার পারিপাট্য সাধন করিতেন। কলিকাতার এক পণ্ডিত মহাশয় রাগিলেই বলিতেন, তা ছোঁড়াদের যা অবস্থা তাতে তো বিছানার চাদর কেচে জল খাইয়ে দিলে ছুঁড়ীদের পেট হয়ে যাবে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আপনারা মাথায় থাকুন—আপনাদের সমকালীন বঙ্গীয় সমাজের আর একটা ছবি অন্য এক লোকের সহায়তায় আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পিতৃদেবের

তাসের আসরের পশ্চাদপট কোন সমাজ তা আমি এই এতোদিন পরে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় অপরিচিত এক বই থেকে।

বাঙালীরা ভীষণ চালাক জাত—কথামৃতর লাখ লাখ কপি কিনে ভগবৎচিন্তার কেত্তন করে বেড়ায়, কিন্তু 'বাঙালী জীবনে রমণী'র মতন বই সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না। আমি যে-দেশে ফিরে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু এমন হয় না, সেখানে নোংরামি চাপা দিয়ে দুর্গন্ধ পাকাপাকিভাবে ছড়ানোর নির্বুদ্ধিতা নেই।

আমি এই বইটার কিছু অংশ জেরক্স করিয়ে নেবো। আর সুযোগ পেলেই আমাদের ছোট্ট শহরের সুবেশী বঙ্গীয় পুরুষদের, যাঁরা নিজের দেশের কৃষ্টির বড়াই করতে ওভারটাইম করেন, তাঁদের পড়ে শোনাবো কিছু অংশ।

ওই যে মুখর মিস্টার মহাপাত্র আছেন, যাঁর ধারণা হিন্দুদের সব কিছুই পবিত্র ও শাশ্বত এবং এদেশে সবই পাপের, তাদের জন্যে আর একটা প্যারাগ্রাফ রিজার্ভ করে রাখবো। নীরদ চৌধুরী খবর দিচ্ছেন, সেকালে বাঙালীদের মধ্যে 'শাশুড়ে' বলে গালি শোনা যেত, যার অর্থ শাশুড়ী-রত। "শাশুড়ী-জামাই ঘটিত ব্যাপার বিরল ছিল না।...ইহার কারণ অবশ্য বালিকা কন্যার বিবাহ...এই জন্যে সে-যুগে শাশুড়ী প্রায়ই জামাতার সহিত আলাপ করিতেন না। এবং সম্মুখে আসিলেও অবগুণ্ঠনবতী থাকিতেন" এবং জামাতাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন।

তার পরের মন্তব্যও বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির আবরণ উন্মোচনের পক্ষে মন্দ হবে না। সাধারণ লোক বিষয়ী সচ্চরিত্র ব্যক্তির অপেক্ষা দুশ্চরিত্র লোককেই বেশী ভালবাসতো—

"লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারো না করে ভয়,
কেবল প্রেমের বশ রয়।"

অনেকক্ষণ ভোর হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি আমি তত হাল্কা বোধ করছি। আমার পিছুটান কমছে।

আর সত্যনিদ্রোত্থিত লেখকমশাই মৃদু হেসে বললেন, "ভারতবর্ষ যত দূরে সরে যাচ্ছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার আকর্ষণ তত বাড়ছে। অনেক দিন আগে দু'মাসের জন্যে দেশছাড়া হয়েই আমি প্রথম নিজের দেশকে ঠিক মতন আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম।"

আমি বললাম, "আপনি মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করুন, বিদেশে অনেক ভারতীয় চরিত্র জোগাড় করে দেবো। আপনি দেখবেন দেশ ছাড়া হয়ে নতুন পরিবেশে কেউ জমে গিয়েছে, কেউ গলে গিয়েছে! একই পরিবেশে উল্টো ফল—তাই হয়ে থাকে।"

"শংকরদা, আপনাকে কিন্তু খুব সাবধানে লিখতে হবে। খুব ছোট প্রবাসী সমাজ তো। সবাই সবার ব্যাপার প্রায় জানে। আপনাকে ঘটনাগুলো নিয়ে এমনভাবে সাজাতে হবে যে ক্যালিফর্নিয়ার ঘটনা নিউ ইয়র্কে হাজির হয়, নিউ ইয়র্কের কাহিনী চলে যায় আলাস্কায়। বিরাট দেশ এই আমেরিকা—ভারতবর্ষের তিন গুণ, কিন্তু লোকসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ নয়, সুতরাং সব চরিত্র ইচ্ছে করলে দশগুণ গতিসম্পন্ন হতে পারে।"

একটু পরেই আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেমন চরিত্র চান, শংকরদা? বাঙালী পাঠকরা এখন কীরকম ঘটনা পছন্দ করেন?"

শংকরদা হাসছেন। "পাঠকরা সত্যিই কি পছন্দ করে তা যদি জানা থাকতো লেখকের, তাহলে নিদ্রাহীন রাতের সংখ্যা অনেক কমে যেতো সুশোভনবাবু।"

"আপনি আমাকে বাদল বলুন।" বাদল বলে ডাকার লোক এ

পৃথিবীতে যে এখন নেই বললেই চলে তা শংকরদা বুঝতে পারছেন না।

"শংকরদা, দু'তিন সপ্তাহ নয় আপনি থেকে যান দু'তিন বছর আমেরিকায়। বিদেশের মাটিতে একের পর এক দিশী চরিত্রের সন্ধান পেয়ে যাবেন আপনি। এই সব বাঙালীরা পাল্টাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। আবার অনেকে নিজেকে পাল্টাবার পরেও দুঃখে পড়েছে, কেন পাল্টালাম? আসলে, আমার এক বন্ধু একবার মাতাল হয়ে বলেছিল, ভারতবর্ষে যে জন্মেছিলাম এটাই দুর্ভাগ্য। আমার ছেলে রোনির জীবনে ওই দাগটা থাকবে না, কারণ সে আমেরিকায় জন্মেছে। ও আমার থেকে অনেক ভাল হতে পারবে।"

না, শংকরদা, আমি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের কথা এই মুহূর্তে তুলতে চাই না। ভীষণ জটিল বিষয়। প্রথম প্রজন্মের পুরুষ ও রমণীদের বুঝতেই আপনি হিমসিম খেয়ে যাবেন।

আমার একটা দোষ বলুন, গুণ বলুন, আমি এই রপ্তানি হওয়া ইণ্ডিয়ানদের থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করি। প্রতিদিন বিকেলে ভারতীয় কারুর বাড়িতে গিয়ে যদি মাছের ঝোল আর ভাত এবং সেই সঙ্গে সন্দেশ রসগোল্লা খাবো তা হলে দেশ ছেড়ে এই বিদেশে এসে কী লাভ হলো?

স্বীকার করছি, আমেরিকান গোরুর দুধে ছানা আরও সুস্বাদু হয়, সন্দেশের স্বাদ নতুন স্বাধীন-হওয়া বাঙালী মেয়েদের হাতের স্পর্শে আরও মুখরোচক হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারি, আমার মা একবার বাড়িতে যে জন্মদিনের পায়েস করেছিলেন তার পিছনে অনেক চোখের জল ছিল—ঝি আসেনি, ঘুঁটে ভিজে, কয়লা কাঁচা। তার ওপর দুধে জল। এবং মা যখন অনেক বাধা পেরিয়ে কড়ায় ওই দুধ চড়ালেন তখন লোডশেডিং হলো। পুরো ব্যাপারটা প্রতীকের মতন। ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে আমার মায়ের সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়োগ করেও পরমান্ন প্রস্তুত হচ্ছে না। আর এখানে তোমাকে বাড়ি বসিয়ে গপ্পো করতে

করতে পায়েস তৈরি করে ফেলবেন মিসেস রমলা ব্যানার্জি, ইভা সেন, গীতাঞ্জলি ঘটক।

সেই পায়েস আপনাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করবে শংকরদা। আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না, এই রমলা ব্যানার্জি যে-ব্যক্তিটিকে সঙ্গে নিয়ে এ-দেশে পদার্পণ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে এখন ঘর করছেন না।

রমলা ব্যানার্জি আপনাদের বউবাজার হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মেয়ে। পুজো, ব্রতকথা, কালিঘাট, তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, সন্তোষী মা শিবরাত্রি এইসব রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছিল ২১ বছরের রমলা ব্যানার্জির মধ্যে। একলা বাসে-ট্রামে ওঠার অভ্যাসও তার ছিল না। ইস্কুল থেকে যখন রমলা আসতো তখন বাড়ির ঝি হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মুখে বিপুল উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। শিবের মতন বর চেয়েছিল রমলা। স্বামীই যে মেয়েদের সব—এসব শাশ্বত অনুভূতি ওর রক্তের মধ্যে ছিল।

রমলার বিয়ে হলো কলকাতায়। অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হলো রমলার বাবার। এমন কিছু আহামরি-সুন্দরী কন্যা নয়। গায়ের রঙ কালো নয়, কিন্তু দুধে-আলতাও নয়। তার ওপর পড়াশোনায় বি-এ পর্যন্ত এগোতে পারেনি রমলা ব্যানার্জি। কিন্তু দৈহিক ও শিক্ষাগত যেসব দোষ ছিল সব বাপের নগদ ক্যাশে ঢাকা পড়ে গেলো। বিয়ে হলো যার সঙ্গে সে আধা-সরকারী উদ্যোগে কেরাণি। চা বিক্রির কাজ নিয়ে জামাইয়ের পোস্টিং হলো আমেরিকান শহরে।

তারপর যা হয়। প্রত্যেক বাঙালী মেয়েই প্রথম ক'মাস দেশে ফেরার জন্য কান্নাকাটি করে! ইংরিজিটা সড়গড় থাকে না, সায়েবরা কেমনভাবে তাকায় শাড়িপরা মেয়ে দেখলে! কপালে সিঁদুর দেখে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বালিকা সাবধান করে দেয়, মহাশয়া তোমার কপালে আঘাত লেগেছে।

যাঁরা অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁরা হাসেন। "কপাল কাটেনি—ফেটেছে! কপাল না ফাটলে বিদেশে বিয়ে হবে কেন।"

"প্রথম ছ'মাসে রমলা ব্যানার্জি এদেশে কী করেছিল আপনার মনে হয়?"

"পুজোটুজো দিয়েছে, আর বাঙালী মেয়েরা যাতে তুলনাহীন, পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাঙালী মেয়েরা সব সময় রাজী।"

"শুনুন প্রথম ছ'মাসে বাপের আদরিণী রমলা ব্যানার্জি একশ কুড়িখানা চিঠি লিখেছিল হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। পরের ছ'মাসে চল্লিশখানা। তারপরের ছ'মাসে ছ'খানা। তখন রমলা ব্যানার্জি আমেরিকান ইংরিজিতে অভ্যস্ত—যারা বানান জানে না, টেন্স গ্রাহ্য করে না, ভুল প্রিপোজিশন বললে ভ্রূ কোঁচকায় না সেই সায়েব-মেমদের দেশে ইংরিজিতে চৌকশ হতে কত সময় লাগতে পারে?"

রমলা ব্যানার্জি এখন নিজেই দোকানে চাকরি করে। একলা গাড়ি চালাতে ভয় পায় না। রমলা ব্যানার্জি এখন শাড়ি ছেড়ে ট্রাউজার্স পরে কর্মক্ষেত্রে যায়। রমলা ব্যানার্জির চুল এখন ছোট—হিদারাম ব্যানার্জি লেনের পরনির্ভর রমলার মধ্য থেকে আর এক রমলা সুযোগ পেয়েই বেরিয়ে এসেছে।

"তারপর?" জিজ্ঞেস করেন লেখকমশাই।

"তারপরের ব্যাপারটা গুছিয়ে আপনিই জেনে নেবেন, অবশ্যই রমলার আলাপ করিয়ে দেবো আপনার সঙ্গে। আমি জানি রমলা একসময় বাংলা গল্প-উপন্যাসের পোকা ছিল। এক একটা অভাগিনী নায়িকার অনিবার্য পরিণতি জানবার জন্যে কত মূল্যবান সময় অযথা ব্যয় করেছে, কত চোখের জল ফেলেছে। এখন রমলা দুঃখ করে, দেশে সময়ের অনেক অপচয় হয়ে গিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না। হামদা-হামদা মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খায়। এখন যদি ওই সব বইগুলো পুনর্লিখনের দায়িত্ব রমলাকে দেওয়া হয় তাহলে রমলা বলে, 'খুব সোজা'। বক্তব্যটা হলো বেঁকে বসো—সব ঘ্যান-ঘ্যানানি বন্ধ করো। অপদার্থ ছোঁড়াগুলোর প্যান্ট খুলে নাও।

আর তাতে যদি আপত্তি থাকে তাহলে বাঙালী ছেড়ে শিখ পাঞ্জাবী, গুজরাতী, হরিয়ানী জাঠের সঙ্গে ঘরসংসার করার জন্যে অপদার্থ বাঙালী আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাও।”

“শুনুন শংকরদা, এর নাম মুক্তির স্বাদ। এই রমলা ব্যানার্জি এখানে একদিন দুর্জয় বিক্রমে এক সায়েব ছোঁড়াকে রাস্তায় চড় মেরেছে। মদ খেয়ে অশ্লীল ফোন করেছিল বলে।

সেই রমলাই একদিন দাম্পত্য-জীবনে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। স্বামীকে সোজাসুজি বললো, তার আর ভাল লাগছে না ঘর করতে। বুঝতেই পারছেন, বঙ্গীয় স্বামী দেবতার চক্ষু চড়কগাছ। বিনাপয়সার চব্বিশ ঘণ্টার বাঁদী পাওয়াটা যাদের জন্মগত অধিকার মনে হয়েছে তারা অনেক সময় বিদেশে এসে ফাঁপরে পড়ে যায়।

হিদারাম ব্যানার্জি লেনে বাবাকে রমলা লিখলো, “তুমি অনুমতি দাও এই বিয়ে ভাঙতে।”

বাবা দিশেহারা। রেফারেন্স দিলেন সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা। মেয়ে সোজা বাংলায় লিখলো, “যদি তুমি অনুমতি না দাও তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ থাকবে না। আর একটাও চিঠি পাবে না তোমার রমলার কাছ থেকে।”

অগত্যা, বাবা সবুজ সংকেত দিলেন, “তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কোরো।”

রমলা ব্যানার্জির জীবনে তখনই দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো পুরুষ দেখা দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। কিন্তু তবু বিয়ে ভাঙলো। বন্ধন-মুক্ত হয়ে রমলা কিন্তু টপাটপ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। রমলার মাইনে বেড়েছে অনেক। রমলা এখন চমৎকার নিজের সংসার সাজিয়েছে। বাড়িতে মিউজিক সিস্টেম বসিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের সে প্রায়ই আপ্যায়ন করে। চমৎকার পায়েস রাঁধছে। শনি-রবিবারে নিয়মিত বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে, হৈ-চৈ করে।

ওই যে বঙ্গপুরুষ টাকার লোভে ছাদনাতলায় মাল্যবিনিময় করেছিল সে হাওয়া বুঝে কেটে পড়েছে—ফিরে গিয়েছে কলকাতায়।

আপনাদের হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মানসিকতায় গল্পটার পরিণতি টানতে বলে লেখককে দেখাতে হবে কোথাও যেন অপরিসীম শূন্যতা রয়েছে। এমনকি রমলা ব্যানার্জির বুকের মধ্যে কোথাও চাপা দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু আপনাকে বলছি, ওসব কিছুই নেই। আমি রমলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো, আপনি ওর সঙ্গে যত খুশি সময় কাটান। অতি মধুর ব্যক্তিত্ব, ভারি মিশুকে মহিলা।

যারা গোলমাল শুনে প্রথমে গাঁয়ের মোড়লের মতন নাক গলাতে গিয়েছিল তাদের রমলা ভারি মিষ্টি কথা বলেছিল: "দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। কিন্তু আমাকে আমার নিজের সমস্যা সমাধান করার সুযোগ দিন।"

আপনি ভাল করে রমলাকে দেখুন। খুঁজে বের করুন, কী পাবার জন্যে রমলা হঠাৎ কী ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলো। বিদেশের মাটিতে মুক্তির স্বাদ রমলাকে কেন পাগল করে তুললো?

শংকরদা, আপনি আবার নোট বই খুলে বসেছেন। লিখে নিচ্ছেন আমার কথাগুলো। একদিন হঠাৎ একটা মেয়ের ইচ্ছে হলো না পুতুলের সংসারে ফিরে যাওয়ার, এটাকে আপনারা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হিদারাম ব্যানার্জি লেনের ভাবপ্রবণতায় ভরিয়ে একটা বিদ্রোহের রূপ দিতে চান গেলো গেলো, বাঙালীর সব গিয়েছে, এবার মেয়েগুলোও হাতছাড়া হতে চললো, এই আওয়াজ তোলার জন্যেও একদল তৈরি হয়ে বসে আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়ে সমস্ত জাতটাকে নিজের চরখায় তেল দিতে বলতে পারেন?

আমি নিজে এক গবেষিকা আমেরিকান ছাত্রীকে লাগিয়েছিলাম

রমলা ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সে বললো, "একজন মেয়ে তার স্বামীকে পছন্দ হচ্ছে না, তাকে চলে যেতে বলেছে। হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট ইট? পুরুষমানুষটার সঙ্গে তো রমলার সারাজীবনের কোনো চুক্তি হয়নি।"

লিখে নিন। আপনি কি ঠিক ওইভাবে মেয়েদের বক্তব্য রেখে বাংলা গল্পের পরিণতি টানতে পারবেন? বাঙালী পুরুষ পাঠকরা গ্রহণ করবে আপনাকে? তারা বলবে, খুঁজে বের করো, কোন লালু সায়েব গরীব বাঙালী মেয়েকে বাড়তি সুখের এবং অপর্যাপ্ত ভোগের লোভ দেখিয়েছে। আরও ভাল হয়, যদি একটা লম্বা ফাঁক দিয়ে আপনি দেখাতে পারেন অনেক ভোগসুখের পর রমলা ব্যানার্জি আবার হতাশা বোধ করছে। তার মনে পড়ছে, সেই শ্রাবণসন্ধ্যার কথা যখন অসংখ্য প্রিয়জনের কোলাহলের মাঝে হিদারাম ব্যানার্জি লেনের ছোট্ট বাড়িতে সেই মধুর স্বভাব বাঙালী যুবকটির সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হয়েছিল।

এইভাবে যবনিকা টানলে আপনি অবশ্যই বাংলাদেশে বাজি মাৎ করবেন, কারণ আধুনিক আমেরিকান পটভূমিকায় একটা আদ্যিকালের বাঙালী গল্প ছাড়তে সক্ষম হলেন আপনি। আপনার চেনাজানা বাঙালী ভক্তদের লেলিয়ে দিলে তারা বলবে, চিরন্তন মূল্যবোধের করুণ মধুর কাহিনী। যা একমাত্র একদল মহান বাঙালী কথাসাহিত্যের পক্ষে লেখা সম্ভব, এটসেটরা এটসেটরা। বস্তা-বস্তা প্রসঙ্গহীন মিষ্টি-মিষ্টি কথা।

কিন্তু রমলা ব্যানার্জির জীবনে সত্যিই কী হয়েছে তার বিবরণ আমার অফিসে আছে। শুনুন, ব্যাপারটা খু-উ-ব সহজ।

রমলা ব্যানার্জি বললো, "বহু বছর স্বামীকে প্রায় দেবতা হিসেবে মান্য করেছি। তারপর মনে হলো আমার কোনো প্রাইভেসি নেই। বিয়ে করেছি, গোত্র বিসর্জন দিয়েছি বলে নিজের একটা জগৎ থাকবে না তা কেন হবে?

আমার মনে হতো, বিমল আমার এই একাকিত্বের সম্মান করতে

পারে না। আমার দেহটাকে জমিদারী মনে করতো।

দুপুরে আমি খেটে খাই—বন্ধনের মধ্যেও আমার এক ধরনের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু রাত্রে বিমল আমাকে প্রতিদিন ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিতে চাইতো। আমার প্রতি কোনো সম্মান নেই সেখানে।

না, অন্য কোনো পুরুষের মুখ আমার জীবনে উঁকি মারছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু তা বলেও কারও ক্রীতদাসী হিসেবে বাস করছি সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর এসব ভাবতে আর ভাল লাগতো না।

বিমল এদেশে এসে ড্রাইভিং শিখলো, মদ্যপান শিখলো, এমনকি ডান্সিংও শিখলো—শিখলো না শুধু নিজের বউকে একজন মহিলা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার বিদ্যা।

শেষের দিকে বিমল বড্ড জোর করতো। আমার শরীরের ওপর গায়ের জোর খাটাতো। আর আমি ভাবতাম হা ঈশ্বর সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আমি কোথায় ফিরে যাচ্ছি? আমার দেহের সম্মান নেই কেন? আমার মনের সম্মান নেই কেন?"

রমলা বলেছে, "আমাদের দেশের পুরুষরা আদিমকালের পশুত্বকে শিকলে বেঁধে রেখে নিজেকে সুসভ্য করার শিক্ষা পায় না। বউকে কিছুতেই প্রেয়সী ভাবতে পারে না। বিয়ে করা বউকে তারা হাতের পাঁচ ভাবে।"

আমি লেখকমশাইয়ের মৌখিক প্রতিক্রিয়া পাঠের চেষ্টা করছি। "কিন্তু বুঝলেন শংকরদা, বাঙালা লেখকরা এইসব পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও বস্তাপচা বোকা-বোকা ভাব পোষণ করে।"

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে এমন ইঙ্গিত বিমল ব্যানার্জি যে একেবারে পায়নি এমন নয়। রমলা অনেক সময় তাকে মিষ্টি করে বুঝিয়েছে, তার নিজস্ব শরীরটা তার নিজের ঠাকুরঘরের মতন। সবসময় তার অর্গল খোলা থাকে না। এ কথার মানে বোকার মতন বুদ্ধিমান হতে সাধারণ বাঙালী পুরুষের এখনও অনেকদিন সময় লাগবে—বউ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় যে কী দুঃখ তা

তো ওঁরা এখনও পাইকারি হারে বোঝেননি।

কিন্তু বাঙালীবাবুদের মুশকিল হলো তারা পৃথিবীর যেখানে যান সেখানেই একটুকরো নিজের দেশকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পরম উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্রটা বিদেশে, কিন্তু তাঁদের বসতবাড়িটা সেই হিদারাম ব্যানার্জি লেন, সেই কালিঘাট, সেই শালকিয়াতেই থেকে যায়। তাঁদের নাগরিকত্ব দু'রকমের—একটা বিশ শতকের, আর একটা সেই আদিমযুগের।

আমি জানি বাঙালী পাঠককে আপনার বোঝাতে কষ্ট হবে পরপুরুষের স্পর্শ পড়লো না শরীরে, অন্য রমণীর অঙ্কশায়িত হলো না স্বামী, প্রলোভন এলো না সামনে, তবু কেমন করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলো? হয় মশাই হয়, এমনি করেই স্রেফ বিবাহিত স্বামী কর্তৃক শ্রীলতাহানির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেও মেয়েরা উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে যখন তারা প্রথম মুক্তির স্বাদ পায়।

শংকরদা, আপনি বাঙালী পাঠককে সাবধান করে দিন। নতুন হাওয়া এই উত্তর আমেরিকান মহাদেশ থেকে বইতে-বইতে একদিন আপনাদের ওই হিদারাম ব্যানার্জি লেনফেনেও পৌছবে।

আমার মুখের দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছেন কেন শংকরদা? আপনি হয়তো রমলা ব্যানার্জিকে খুব স্বার্থপর, আত্মসুখমগ্ন রমণী বলে কল্পনা করছেন।

মোটেই তা নয়। সে ভীষণ হৃদয়বতী। যদি সে শোনে আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে সে নিজে ছুটে আসবে খোঁজ করতে। এই আপনি যখন আমাদের শহরে থাকবেন তখন স্রেফ আপনার জন্যে কত রকমের রান্না করবে এবং যত্ন করে খাওয়াবে। আপনি দেখবেন বাংলার বধুর বুকের মধু বলে যে জিনিসটার জন্যে আপনারা গর্ব করে এসেছেন তা একটুও শুকিয়ে যায়নি, রমলার বুকের মধ্যে থেকে। অথচ মুক্তির স্বাদ তাকে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করেছে।'

আমি একটা অদ্ভুত কথা ভাবছিলাম, শংকরদা। আপনার আগামী উপন্যাসের জন্যে আপনি এমন একটা পটভূমি এবং পরিস্থিতির কথা ভাবুন না যেখানে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পরে বাঙালী সধবারা তাদের স্বামীকে ডাইভোর্স করছে। বলছে, "এই বইলো তোমার সংসার। আমি চললাম। আমাকে তুমি কিছুতে হাতের পাঁচ বলে ধরে নিতে পারো না—নোবডি শুড্ বি টেক্ন ফর গ্রাণ্টেড্।"

শংকরদা, দয়া করে ভাবুন না এমনি একখানা দুঃসাহসিক উপন্যাসের কথা। না হয় ব্যাপারটা এখনকার বাঙালী-মাপে একটু 'অ্যাহেড অফ টাইম' হবে—সমকাল থেকে একপা এগিয়ে থাকবে।

কিন্তু আমি বলছি আপনাকে, ব্যাপারটা একেবারে আষাঢ়ে গল্প হবে না। গল্পোটা এইভাবে সাজালে কেমন হয়?

বাংলার বিবাহিতা রমণীরা, যাঁদের আমরা ধৈর্য, সেবা ও পবিত্রতার আদর্শ বলে মনে করি (যাঁদের কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং আপনাদের বিবেকানন্দও বড়াই করেছেন), অকস্মাৎ নিজেদের প্রশ্ন করলেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন জরুরী হয়ে উঠেছে। এই 'রিঅ্যাসেসমেন্ট' কথাটা এখন বিশ্বের সর্বত্র চালু হয়ে গিয়েছে—আইন বাঁচিয়ে পুরনো ব্যবস্থা কাঁচিয়ে দেবার জন্যেই ব্যবস্থা। একসময় এরই নাম ছিল রেনেসাঁ, অথবা বিপ্লব।

পঁচিশ থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কা বাঙালী সধবারা সিঁথির সিঁদুর স্মরণে না রেখে একটু প্রাইভেসি সংগ্রহ করে নিয়ে নিজের ঘরের এক কোণে বসে স্বামীদেবতা নামক পুরুষটির মূল্যায়ন শুরু করলেন। ভরণপোষণ, নিয়মমাফিক দেহ মিলন এবং সন্তান পালনের বাইরে

আর কী পাওয়া গেল? অথচ পৃথিবীর অন্যত্র এই সম্পর্কের মধ্যেই রমণীদের আরও কী পাওয়া সম্ভব ছিল?

তারপর শংকরদা, আপনি সাজানো সংসার ভাঙতে শুরু করুন। মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যে আপনাদের জানাশোনা কাকীমা, মাসীমা, বউদিরা হঠাৎ বলছেন, "অনেক হয়েছে, আর নয়।"

এরপর আপনার-আমার জানাশোনা গুরুজন—কাকা, মেসো, দাদাদের ছবি সবিস্তারে এবং নিপুণভাবে আঁকতে শুরু করুন।

আমি জানি, আপনি বলবেন, ব্যাপারটা 'অ্যাবসার্ড' হবে—কোথায় একটা অসম্ভবতা থেকে যাবে।

যিনি সেই ভোর ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলায়, শিশু পরিচর্যায়, সংসার প্রতিপালনে, বাড়া ভাত আগলে বসে থাকাতে অভ্যস্ত সেই গৃহবধূকে কেমন করে নতুন ভূমিকায় দেখাবো? এঁরাই বাঙালী পুরুষকে অতিমাত্রায় আস্কারা দিয়েছেন,। 'টু মাচ স্টেবিলিটি', যে স্থিরতা, যে স্থায়িত্ব এঁদের কিছুতেই পাওনা নয়। তাই মন ভাঙে কিন্তু ঘর ভাঙে না, তাই বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না। তাই শিবঠাকুর প্রলয় নৃত্য করতে এসেও মায়েদের বেলপাতার অত্যাচারে ধ্বংসের আসল কাজটা না করেই বাড়ি ফিরে যান অন্যত্র। আর প্রেম-হীন (অথচ কামনায় পরিপূর্ণ) স্বদেশী পুরুষমানুষগুলো ধরে নিয়েছে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না, এমনি 'অগামারা' অবস্থাতেই গয়ংগচ্ছ জীবন চলে যাবে।

শংকরদা, আমি জানি, আপনি ভাবছেন, প্লেনের সীটে বসে হুইস্কি সোডা সেবন না-করেই আমি অবান্তর বকে চলেছি। দূরদ্রষ্টা পুরুষ হিসেবে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন বাঙালী মেয়েরাই আমাদের চিরস্থায়ী 'শক অ্যাবজর্ভারের' কাজ করে যাবে—এইটাই সবদিকে অপদার্থ বাঙালী পুরুষদের কাছে ভগবানের দান। মেয়েরা কোনোদিন এসব ভাঙার নেশায় মেতে উঠবে না—ওসব উত্তেজনা ওদের ধর্মে নেই। কিন্তু আমি বলছি, এদের কয়েকজনকে এই মার্কিন দেশ ঘুরিয়ে নিয়ে

যান, এরাও চাইবে।

মেয়েদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে একটা 'কালো কৌটো' থাকে যেখানে প্রতিমুহূর্তের ভাবনা-চিন্তা এরোপ্লেন-ককপিটের ব্ল্যাক বক্সের মতন সারাক্ষণ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

মেয়েদের গোপনতম স্থানে সংরক্ষিত অদৃশ্য এই কাল কৌটো কয়েকটা সংগ্রহ করুন। দেখুন কী সব চিন্তা তাদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শনি-মঙ্গলবার সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া নিয়ে মরলে যাদের পায়ের গোড়ায় আমরা মোচা সাজিয়ে দিই। ভাবটা এইরকম, ঐ ছ্যাখো ভাগ্যবতী যায় শ্মশানে! সংসারের সব দুঃখের মধ্যে থেকেও সবচেয়ে বড় যে দুঃখ সেই বৈধব্যযন্ত্রণাকে কলা দেখিয়ে সতী চললো সাধনোচিত ধামে।

শংকরদা, গল্পের পটভূমিটা এইভাবে ভাবুন। গুলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনে একটা চরিত্র স্থাপন করতে পারবেন আপনি। নাম দিন মিনতি। ছোটবেলা থেকে আমরা কেবল মিনতি করতে শেখাই আমাদের মেয়েদের। ষষ্ঠী ঠাকুরের কাছে মিনতি, লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছে মিনতি, কালী ঠাকুরের কাছে মিনতি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সবার কাছে মাথা নিচু করে কেবল মিনতি। কোথাও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ঘোষণা নেই, নিজের ভাগ্য নিজে জয় করবো বলার সুযোগ নেই।

বিগত একশ বছরের দৈনন্দিন ইতিহাস দেখুন আপনার সমাজের। যে-মেয়ে বেঁকে বসেছে সে অধঃপতিত হয়েছে। 'খারাপ' মেয়ের শিরোপা মিলেছে তার। মেয়েমানুষ 'খারাপ' হলে সারানোর চেষ্টা হয় না এই সমাজে, একেবারে ফেলে দেওয়া হয় তাকে।

আপনি বনসাঁই সম্বন্ধে লিখেছেন? বড় গাছকে চেপেচুপে কায়দা করে ছোটকরা—'মিনিয়েচারাইজেশন'। আমাদের প্রত্যেকটি মেয়ে এক একটি বনসাঁই—বিরাট বটবৃক্ষ হয়ে নিজেকে বিকশিত করে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করতে পারতো, কিন্তু তার বদলে ছোট্ট একটি ট্রেতে অতি ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়ে বিশেষ কোনো এক অপদার্থ বাঙালী নবাব

বাহাদুরের দৈনন্দিন কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটাচ্ছে।

নবাব বাহাদুরের মোক্তার বলবেন, অতো দুঃখু কেন? ক্ষতি কী হচ্ছে? গয়নাগাঁটি চড়িয়ে, শাড়ি-ব্লাউজ পরে, পান-সুপুরি চিবিয়ে, সিনেমা-টিভি দেখে, নাটক-নভেল হজম করে, কুটনো কুটে, রান্নাবান্না সেরে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে, সন্তানোৎপাদন যন্ত্রণা হজম করে, শিশুদের কাঁথা কেচে, দুধ খাইয়ে, ইস্কুলে কলেজে পাঠিয়ে, বিয়ে থা দিয়ে এবং ঘরসংসারী করে এদেশের বধূদের খারাপ চলছে কি?

মোক্তারবাবুর সওয়াল একই ছিল যখন বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদিও যুক্ত ছিল এই ব্যবস্থার সঙ্গে।

উত্তরে মেয়েদের পক্ষে বলবার একটাই: গোড়াটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধর্মাবতার। মহীরুহের মূল পচছে অনেকদিন ধরে, তাই ভাল ফল ধরছে না, জাতটা ছোট হয়ে যাচ্ছে।

পশুরা অনেক সোজা। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় অনেকেই বাচ্চা দেয় না—আর সুন্দরবনের বাঘিনীও যখন চিড়িয়াখানায় বাচ্চা পাড়ে তখন দেখলে মায়া হয়। মনে হয় যেন বাঘিনীর পেটে ইঁদুর জন্মেছে। বক্তব্যটি অত্যন্ত সোজা। যদি বাঘের সংখ্যা বাড়াতে চাও, যদি রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে তার পূর্ণ গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাও তাহলে বাঘিনীকে মুক্তি দাও, তাকে নিজের খুশি মতো চলবার সুযোগ দাও। না-হলে, ওই ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের মিনতির মতন অবস্থা হবে।

শংকরদা, আপনি নোটবই বের করে আমার কথা লেখা শুরু করবেন না। আমার শহরেই তো আসছেন। আমি আপনাকে গপ্পোটা বলে যাবো ডিটেলে, সামনে টেপ রেকর্ডার খোলা থাকবে। আপনি ওই ক্যাসেটগুলো নিজের কাছে রেখে দেবেন, যেখানে যতটা খুশি ব্যবহার করবেন, আমি তাতে একটুও বাধা দেবো না।

শূন্যে ভাসমান অবস্থায় শুধু দু' একটা বিষয়ে কথা বলি। স্বামীর ডবল স্ট্যানডার্ড বিবাহিত মেয়েদের ভীষণ কষ্ট দেয়, বিশেষ করে বাইরের জগতের সঙ্গে যাদের তেমন যোগাযোগ নেই। যারা এই দু'নম্বরী

ব্যাপারটার প্রতিবাদ করে, রাগ দেখায়, চিৎকার করে, অভিমান করে বাপের বাড়ি চলে যায়, তারা তবু রক্ষে পায়। কিন্তু মুশকিল হয় এই মিনতি বাগচীর মতন মহিলাদের—যাদের আপনারা 'বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না' বলে প্রচুর তোল্লা দিয়েছেন আপনাদের সাহিত্যে, আপনাদের সমাজে।

ডবল স্ট্যানডার্ডের বিষে প্রতিদিন জ্বলে-পুড়ে মিনতির যা হলো তা অপ্রত্যাশিত নয়। মিনতি মুখ বুঁজে জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। উন্মাদ হয়ে যারা দুমদাম জিনিসপত্র ভাঙে তারা তবু একরকম। ওসব কিন্তু মিনতির পক্ষে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও অকল্পনীয়। মিনতি ঘুমোয় না, সারা রাত কাউকে কাছে রাখতে চায়, সংসারের কোনো দায়িত্বের কথা মনে থাকে না, রান্নাবান্না সব বন্ধ। তার সমস্ত ভয় তখন ওই স্বামী দেবতাটিকে নিয়ে। এমন কী সে করেছে যে স্বামী তাকে সহ্য করতে পারলো না, কাছে টানতে পারলো না, বেঁধে রাখতে পারলো না ভালোবাসার ডোরে।

আপনি ভাবুন, বাড়িতে রান্না বসেনি, এঁটো বাসন কখন মাজা হবে ঠিক নেই, নোংরা থই-থই করছে। বাড়ির কর্তাকে এবার আপনার আসরে নামানো দরকার। তাঁরও তো একটা নাম প্রয়োজন। ধরুন তাঁর নাম অপরেশ বাগচী—সমস্ত জীবনটা অপরের ঘাড়ে বসে চালাবার জন্যেই যিনি পৃথিবীতে এসেছেন! বউ যতক্ষণ সহ্য করতে পেরেছে ততক্ষণ ওইখানেই বাক্যসুধা বর্ষণ করেছেন। এখন তিনি অসুস্থ। সুতরাং ছেলেকেই বক্তৃতা শোনাচ্ছেন। "সংসারের ছোটখাট কাজগুলো আর কবে শিখবি? ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেন বলেই চলে যাচ্ছে! বিলেত-আমেরিকা হলে কী করতিস?"

পিতৃদেব ইতিমধ্যে চাকরিতে কিছু একটা গোলমাল বাঁধিয়ে, বন্ধু হারাধনের সঙ্গে অন্য এক কারবারে নেমেছেন। ক্যানিং স্ট্রীটের ওখানে হারুকাকু ও অপরেশের অফিস। বেলিলিয়াস লেনে ছোটখাট

একটা কারখানার সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। বন্ধু হারাধন নাকি অপরেশ বলতে অজ্ঞান—অন্তত পিতৃদেব তাই দাবি করেন।

অপরেশের উচিত ছিল বিজ্ঞাপন অফিসে কাজ করা। তিলকে তাল করে, নিজের দুঃখকে শতগুণে বাড়িয়ে তথ্যাভিজ্ঞমহলে এমন প্রচার চালিয়েছেন যে সর্বত্র তাঁর জন্যে করুণা জমা হয়ে রয়েছে। "আহা! বেচারা বড় অসহায়। স্ত্রী অসুস্থ, একটি মাত্র সন্তান তাকে নিয়েও নাকানি-চোবানি খাচ্ছে।"

ম্যানেজ ভালই হয়েছে। বাড়িতে দুপুরে রান্না হলো কি না হলো তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই অপরেশ বাগচী মহাশয়ের। স্নানটি সেরে, টেরি বাগিয়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একখানা পেন্নাম ঠুকে, টুপ করে বাড়ি থেকে বেরোতে পারলেই হলো। যাবার পথে পচা জ্যেঠার আড্ডাখানায় আরও একটা ঘণ্টা গল্পোগুজবে কাটিয়ে তবে বাসে ওঠা। হারুকাকা কিছু বলেন না দেরি হওয়ার জন্যে। বলবেন কী করে? "সংসার সামলে, অসুস্থ মানুষের সারাদিনের ব্যবস্থা করে, ছেলেটার একটা গতি করে মানুষটা যে এই সময়ে কাজে আসতে পারে সেই ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেন থেকে সেইটাই একটা আশ্চর্য।"

মনে করুন, ছেলেটা মায়ের কথা ভেবে বাপের জন্যেও কিছুটা দুঃখ করে। কেরোসিন স্টোভে ভাতে-ভাত বসিয়ে দিয়েছে তিন জনের জন্যে। নিজের খাওয়া সেরে নিতে হলোও তাড়াতাড়ি, ইস্কুল আছে—মা-জননী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছেন। সংসারের বিচিত্র খেলার রানিং কমেণ্টারি দিতে-দিতে হঠাৎ যেন তাঁর সাউণ্ড-বক্স খারাপ হয়ে গিয়েছে।

শরীর তেমন সুস্থ থাকে না ছেলেটার। কলঘর থেকে বেরিয়ে, বই হাতে করে ইস্কুলে যেতে গিয়ে দেখলো, মা রান্নায় জল ঢেলে দিয়েছেন। সমস্ত ঘর জলে থৈ-থৈ। "এ কি মা! তুমি কী করলে? তুমি নিজে না খাও, আজ শনিবার, বাবা সকাল-সকাল বাড়ি ফিরবেন।"

মা তখন নিজের মনেই হাসছেন। "বাবাকে চেনোনি। হারুকাকাকে

পাকড়ে অফিসেই ভাত ডাল বেগুন ভাজা বড়ি পোস্ত মোচা মাছের ঝোল খেয়ে আসবে। খেতে পাবো না কেবল আমি। আমার খেতে ভয় হয়। তোর বাপকে বিশ্বাস নেই, কখন বিষ মিশিয়ে দেবে। আমি বেঁচে থাকলে তোর বাবার খুব অসুবিধে। জহরলাল আইন পাশ করিয়ে দিয়েছে এক বউ থাকলে অন্য বউ ঘরে আনা যাবে না।"

এরপর মা হঠাৎ রেগে উঠে নেহরু পরিবারের বাপান্ত করতে লাগলেন। "বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না, ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ হবে—নিজের বউয়ের মাথা তো কোনকালে খেয়েছিলে, এখন গেরস্ত ঘরের বউদের সর্বনাশ করে কী লাভ হলো? সর্বনাশ নয়? তোমরা বলো! আগে স্বামীর মন ধরলো না, টুক করে আর একটা কাঁচা মেয়েকে ঘরে এনে তুললো। পুরনো বউটা অন্তত প্রাণে বেঁচে রইলো। এখন আইন খারাপ। নতুন মেয়েমানুষ তো আনবেই, তার আগে পুরনো বউটাকে শেষ করে পায়ে মোচা ধরিয়ে দেবে।... জহরলাল কেন মন্ত্রী হয়েছিল গা, এই সাদা ব্যাপারটা বুঝলে না।"

ছেলে এরপর অবাক হয়েছে। গৌরচন্দ্রিকা না করে সোজা বাবাকে যথাসময়ে জিজ্ঞেস করেছে, "আজ হারু কাকা কী খাওয়ালো?"

পিতৃদেব কিছুটা বিব্রত। আচমকা এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি ছিল না। কতটা ভিতরের খবর যথাস্থানে পৌঁচেছে তারও ঠিক নেই।

পিতৃদেব দন্তকৌমুদি বিকশিত করে এবার বললেন, "আজ একটু বাড়াবাড়ি করলো হারু। তপসে মাছ ভাজা, কুমড়ো ফুলের বড়া, পাকা পোনা মাছের কারি, সেইসঙ্গে আবার দই মিষ্টি। আমি বলে দিয়েছি, রোজ-রোজ আমাকে লজ্জায় ফেলো না, আমি তোমার টিফিন কেরিয়ারে ভাগ বসাবো না। কিন্তু হারুটা অবুঝ। বলে, ভোজেও অংশীদার, উপবাসেও অংশীদার! একখানা ছাড়া দু'খানা টিফিন কেরিয়ার তো বাড়ি থেকে আসেনি।"

এরপর অপরেশের অপরকে নিন্দা করার নিজস্ব স্বভাব প্রকাশিত হলো। "কুমড়ো ফুলের বড়াটা মুখে দেওয়া গেলো না—নুনে পোড়া।

পোনা মাছটা মনে হলো পুকুরের নয়—হারুটা তো নিজে বাজারে যায় না। সব ওই শালাটার ওপর নির্ভর। জামাইবাবুর ঘাড়েবস শালাগুলো কখনও সুবিধের হয় না।”

ছেলেটা তখন ভাবছে, প্রতিদিন অত পদ হারুকাকুর বাড়িতে কীভাবে রান্না হয় ?

পিতৃদেব পরিস্থিতি আন্দাজ করে আর একটা বক্তব্য ছাড়লেন, “আজ যে হারুর মেয়েটার জন্মদিন। ঐ মেয়েটার জন্ম থেকেই তো হারুর পয়সাকড়ি হচ্ছে। অনেক আদর করে নাম রেখেছে অনুরাধা লাহিড়ী। ডাকনামটাও বেশ মিষ্টি—টুপটুপ।”

পিতৃদেবের আরও মন্তব্য: “হারুর বউটা বড্ড কুঁড়ে। অথচ সংসার সুখের হয় রমণীর শ্রমে—স্বয়ং ঠাকুর বলে গিয়েছেন।”

ঠাকুর এমন কথা সারা জন্মে বলেননি, এ খবর আপনাকে দিয়ে রাখছি। কোনো এক গ্রাম্য কবি মেয়েদের আপ দেবার জন্যে বলেছিলেন সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। কী মামদোবাজী! সংসারের সব কিছু সুখ একতরফা! বাবু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, ভুঁড়ি খেলিয়ে, ভোগের রসে ডুবে টৈটম্বুর হয়ে থাকবেন, আর বেচারা রমণীর একতরফা গুণে কর্তাবাবুর গেরস্থালি সোনার সংসার হয়ে উঠবে।

যে এতো আদর যত্ন করে খাইয়েছে তার স্ত্রীর বদনাম তো অপরেশ বাগচী একটু দেবেনই! তাঁর দোষের মধ্যে “মেয়েটাকে একলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে না। সব কাজ অপেক্ষা করবে ওই হারুটার জন্যে। অথচ ঠোঁটের একটা অপারেশন দরকার মেয়েটার।”

সুস্থ থাকলে মিনতি বলে উঠতেন, “ঠোঁটকাটা মেয়ে বুঝি! আহা কী হবে গা।”

কিন্তু এখন তিনি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন আড়ালে, “কে ঠোঁটটা কেটে দিলে গা? নিশ্চয় আপন জন কেউ। নিজের লোকরাই তো মানুষের যত সর্বনাশ করে।”

ছেলে বললো, “তুমি ভেবো না মা, আমাদের ইস্কুলে ঠোঁটকাটা

বেচারাম ছিল, অপ বেশনের পর এখন চলচ্চিত্র তারকার মতন সুন্দর দেখতে হয়েছে।"

গপ্পোর প্লটটা আমি আপনার মুখ চেয়েই এখনও বুনে যাচ্ছি শংকরদা। দেখুন, হয়তো নতুন কোনো আইডিয়া পেয়ে যেতে পারেন।

দিন যায়, আবার রোদ ওঠে। মিনতি আবার রান্নাবান্না শুরু করে। ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনে পিতৃদেব অপরেশ বাগচী আবার নিজ মূর্তি ধারণ করে স্ত্রীকে লম্বা-লম্বা লেকচারে জর্জ্জরিত করছেন: এই যে তাঁর ভাগ্যের রথ এখন একটু শ্লথ গতিতে চলেছে তার জন্যে তিনি নিজে দায়ী নন বিন্দুমাত্র, সব দোষ নাকি মিনতির।

"বংশে যদি কোনো চাপা রোগ থাকে তা না-জানিয়ে বিয়ে দেওয়াটা বেআইনী—এই অভিযোগে কোমরে দড়ি পরানো যায় শ্বশুরবাড়ির লোকদের।" এইটাই অপরেশ বাগচীর প্রকাশ্য সাবধানবাণী।

এই সিচুয়েশনে বাড়ির ছেলেদের চরিত্র কেমন গড়ে ওঠে লেখক-মশাই? উপন্যাসের সব চরিত্রের মা-বাপ তো লেখকই। আপনি কী করবেন ওই ফুটফুটে লাল-টুকটুকে বুদ্ধিমান বাগচী বালকটিকে নিয়ে, এককথায়, যার বাবা দায়দায়িত্বহীন আর মায়ের মাথা খারাপ।

আমি আপনার পারিবারিক ইতিহাস জানি। আপনি কীভাবে প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা আমার অজানা নয়। আপনি এখানে কী চাইবেন তাও বলে দিতে পারি। আপনি চাইবেন, সব দুঃখ মুছে ফেলে দিয়ে ছেলেটা নিজের সাধনায় ডুবে থাক—বিবেকানন্দ ইস্কুল, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির থেকে অনেক ভাল ছাত্র বেরিয়েছে, আর একটা বেরোক। হয়তো বলে বসবেন, 'এই যেমন তুমি। হাওড়া ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেন থেকে বেরিয়ে আমেরিকার মতন দেশে বেশ কিছুটা নাম হয়েছে তো।'

কিন্তু একটা মস্ত তফাৎ থেকে যাচ্ছে লেখকমশাই। আপনার বাবা মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু মা বেঁচেছিলেন। আপনার মায়ের আর্থিক অনিশ্চয়তা ছিল, কিন্তু মানসিক অস্থিরতা ছিল না। আর এখানে বাপ বেঁচে থেকেও নেই, অসুস্থ মায়ের মধ্যে কেবল মিনতি—দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। এই অবস্থায় যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। মানুষের অধঃপতনের সম্ভাবনাগুলো এই ধরণের পরিবেশেই অকস্মাৎ প্রবল হয়ে ওঠে।

মায়ের দুঃখে আমি আরও মন দিয়ে পড়াশোনা করবো এই মনোভাব তৈরি না হয়ে ছেলেটাও খারাপ হয়ে যেতে পারে। অপরিণত বয়সে অভিভাবকহীন মার্কিন বালক-বালিকাদের মানসিকতা নিয়ে আমি একবার অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। তখন আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ডেট্রয়েট শহর—আমেরিকার কলকাতা বলতে পারেন। সব কিছু যেখানে ডুবতে বসেছিল। সমস্ত শহরটা চলে গিয়েছিল বাউণ্ডুলেদের হাতে—ধর্মঘট, খুনোখুনি, ভাঙাভাঙিতে কলকাতাকে টেক্কা দিতে যাচ্ছিল এই ডেট্রয়েট। কিন্তু একশ্রেণীর নাগরিকদের পুরুষকারে শহরটা রক্ষা পেয়ে গেলো। চাকা ঘুরলো। ডেট্রয়েট প্রমাণ করলো মহানগরীর মৃত্যু হয় না—সময়ে-সময়ে কেবল রূপ পাল্টায়। 'গ্রেট সিটিজ নেভার ডাই,' কলকাতার পক্ষে সুন্দর স্লোগান হতে পারে।

ওই যা বলছিলাম, যাঁহা ডেট্রয়েট তাঁহা ডোমজুড়, যাঁহা ওহায়ো তাঁহা ওলাবিবিতলা লেন, যাঁহা কালী বাঁড়ুজ্যে লেন তাঁহা কানেকটিকট। মানুষের কতকগুলো প্রবৃত্তি একই ছাঁচে গড়া। আমার কম বয়স। আমি একটা বিশ্বাসযোগ্য সংসারের সুরক্ষা পেলাম না। আমার মা নিরন্তর স্বামীর অত্যাচারে অসুস্থ, আমার বাপের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি. এই অবস্থায় বিপদের বাঘ আমাকে সশরীরে গিলে খাবার জন্যে ঘুরে বেড়াবেই। আমি বাড়ি ছেড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াবো, খারাপ মানুষের খপ্পরে পড়বো, রমণী দেহ

সম্বন্ধে আমার অদম্য উৎসুক্য সৃষ্টি হবে, আমি সেক্সের মধ্যেই মুক্তি খুঁজে বেড়াবো—কারণ ওটাই সহজ, ওইটাই হাতের পাঁচ। আমি ভাববো দেহের বাইরে কোথাও পরিতৃপ্তি নেই—মানুষ দেহসর্বস্ব, দেহটাই তার একমাত্র মূলধন।

এই সময়ে মানুষের পক্ষে তলিয়ে যাওয়াটাই সহজ হয়। ধরুন, এই ছেলেটা আপনি। সামান্য চেনা-জানা কোনো সো-কল্ড বউদির স্নেহদাক্ষিণ্য পেলেন। কালী ব্যানার্জি লেনের এই স্নেহময়ী মহিলা আপনাকে আদর যত্ন করলেন, কখনও খাওয়ালেন, কখনও জামায় বোতাম লাগিয়ে দিলেন।

আপনি ভাবলেন, আমার পিতৃদেব যদি অভুক্ত ছেলের কথা না ভেবে হারুবাবুর অন্ন উপভোগ করতে পারেন তাহলে হোয়াই নট ইউ? তাছাড়া আপনি সুন্দর মুখের অধিকারী। আপনি কবিতা জানেন। আপনি চমৎকার ইংরেজি বলেন যা আপনি পিতৃসূত্রে পেয়েছেন।

এই দেহ সৌন্দর্যই কিন্তু আপনার কাল হলো। যখন ওই কমবয়সী বউদি বিশেষ করে একলা থাকেন—স্বামী জাহাজী—ন'মাস অন্তর পদ-ধূলি পড়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য। বাকি সময় বউয়ের নামে টাকা আসে, চিঠি আসে, ছবি আসে, কিন্তু মানুষটাকে রক্তমাংসে পাওয়া যায় না।

তরুণ বয়সে রমণী দেহের শর্টকাটে আপনি তখনও জ্ঞানান্বিত নন। তৃষ্ণার্ত রমণী শরীরের রাজনীতিও আপনার অজানা—তবু কখনো হঠাৎ কিছু ঘটে যায়। এবং ঘটার পরে আপনার মনের মধ্যে কোনো অন্যায়বোধ জাগরিত হয় না, আপনার মনে হয় আমি তো নিজেই নিজের শরীরের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করছি। আমি বেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছি।

এবার আপনি ছেলেটির চরিত্র নিয়ে যা-খুশি তাই করুন। এই অকালপক্ক উড়ু উড়ু বালকের পড়াশোনার বারোটা বাজানো ছাড়া লেখক হিসেবে আপনার কোনো উপায় থাকবে না। জননেন্দ্রিয়ের তাড়নায় পরিচালিত হলে অধ্যয়ন সাধনায় সমূহ বিপত্তি ঘটে, এই

উক্তি আপনি আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। সংযমের সঙ্গে সাধনার একটা অদৃশ্য সম্পর্ক যে রয়েছে তা বুঝতে মানুষের একটু দেরি হয়ে যায়।

আপনার তরুণ চরিত্রটির হাতে এবার সুযোগ বুঝে একটা নতুন জিনিস এগিয়ে দিতে হবে। একখানা শস্তাদামের বিদেশী ক্যামেরা। এটা খুব প্রয়োজন হবে আপনার গল্পের জন্যে।

না প্লিজ, এমন পরিস্থিতি তৈরি করবেন না যে জন্মদিনে পিতৃদেব এসে ছেলের হাতে একখানা ক্যামেরা গুঁজে দিলেন। ওটা বাপের চরিত্রের পক্ষে অসম্ভব—বরং হাতে কাঁচা টাকা থাকলে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে ইয়ারবন্ধুদের একটু মদ্যপান করানো যেতে পারে। ছেলেকে এতো ভালবাসা দেখাচ্ছে প্রমাণ পেলে হয়তো গৃহিণীর অসুখটাই সেরে যাবে।

আপনি বরং কালী ব্যানার্জি লেনের ওই তুষ্টু বউদির ভূমিকাটা একটু বাড়িয়ে দিন। দেখান স্বামী এসেছেন জাহাজ থেকে। তিনি শুনলেন এই ছেলেটিই বিপদে-আপদে সময়ে-অসময়ে স্ত্রীকে দেখে। স্নেহবশত একখানা ক্যামেরা উপহার দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়! হংকং-এ, সিঙ্গাপুরে এসবের কী এমন দাম?

সেই ক্যামেরা দিয়ে আপনি নিশ্চয় ছেলেটির মায়ের একটা ছবি তোলার ছক কাটছেন? খোলা জানালার ধারে অস্ত রবির আভায় মন্দভাগ্য জননী। তোলান ছবি। এই ছবিটা কেমন হতে পারে তা আমার জানা আছে। আপনাকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবো। এরকম একটা ছবি আমি নিজেই একবার তুলেছিলাম, শংকরদা। ছবিটা আমি বিদেশের বাড়িতে রূপোর ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি।

কিন্তু তারপর···আপনার 'বাঙালী জীবনে রমণী' বইতে একটি মহামূল্যবান সংবাদ রয়েছে, যা আমার জানা ছিল না। নীরদবাবু

শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন, "তখনকার দিনে ছাতে উঠা, দূরবীন বা ক্যামেরা রাখা যুবকদের চরিত্রহীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাস কলিকাতার বহু বাঁদর এই দুইটি জিনিস খারাপ অভিসন্ধি ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই রাখিত না।"

ক্যামেরাটা তাহলে গল্পের প্রয়োজনে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন আপনি। ইতিমধ্যে ছেলেটিকে আপনি কলকাতার কলেজে পাঠান। পরীক্ষায় যার ভাল ফল কবা উচিত ছিল সে আশানুরূপ ফল করছে না।

মহাশূন্যে বিমান বাহিত অবস্থায় আরও অনেকখানি সময় কেটেছে আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়া বোয়িং এখন অতলান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উদাসী পাখির মতন উড়ে চলেছে।

বাঙালী লেখকরা এখন আর আগেকার মতন পরিকল্পনাহীন উড়ু উড়ু মানুষ নয়। মাত্র কয়েকদিন এবারে থাকছেন বিদেশে, বাঙালীদের দাক্ষিণ্যে। এই ক'দিনে অনেক জায়গায় না ঘুরে এক-আধ জায়গায় কথাবার্তা বলে বেশী খবরাখবর নেবার বুদ্ধিটা শংকরদার মাথায় ঢুকেছে।

আমি বলেছি, "কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের ওই বঙ্গীয় সম্মেলনেই অনেক চমৎকার গল্পের ইঙ্গিত, অনেক অবিস্মরণীয় চরিত্রের নমুনা পেয়ে যাবেন। আপনি নিজেই সব আবিষ্কার করতে পারবেন, শুধু আড়াল থেকে একটু টীকা-টিপ্পনী প্রয়োজন। আমি সভাসমিতিতে যাই না, বাঙালীদের সঙ্গে দিন রাত মেশার জন্যেও আমি বিদেশে বসবাস করি না। তবে আমি কিছু খবর দিয়ে দেবো চরিত্রগুলো সম্বন্ধে আগাম কিছু খবরাখবর থাকলে আপনার বুঝে নিজে

কিছুটা সুবিধে হবে।”

আমার নিজের এবার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। একটু চোখ না বুজলে, আন্তরিকভাবে নিদ্রালক্ষ্মীকে আহ্বান না করলে তিনি কেন এই অধমকে দয়া করবেন? অথচ এমন তো আমার ছিল না।

কালা ব্যানার্জি লেনের অণুশ্রী বউদি তো আমাকে নিয়ে এক একদিন বিপদে পড়ে যেতেন। চরম নাটকের পরে নরম বিছানায় আলগাভাবে দেহটা নাড়িয়ে বলতেন, “শোভন, তুমি আর কত ঘুমুবে? এবার বাড়ি যাও।” বউদির নামটা অণুশ্রী বিশ্বাস হলে আপনার গল্পের পক্ষে মন্দ হবে না, শংকরদা। আর বালক চরিত্রের জন্য আর কোথায় নাম খুঁজবো। ওটা আপনি সুশোভনই রাখুন। নিজের নামটা দিলে একটা মস্ত সুবিধে আর কারও সম্পর্কে দায়দায়িত্ব থাকে না—সব কথা নির্বিবাদে বলা যায়, লিখে অনেককে জানানো যায়।

তরুণী বউদির নাম অণুশ্রী বিশ্বাস হলে একটু রসরসিকতাও করা যায়। খুব বিশ্বাস বাবা। স্বামী বিশ্বাস করে পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্যে ঘরসংসার ছেড়ে জলে ভেসে রয়েছেন, আর অণুশ্রী স্বামীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে অন্য একটা শরীরকে বিশ্বাস করবার জন্য পাগল হয়ে আছেন।

তরুণী অণুশ্রীকে এবার সুশোভন বলুক, “আমি শোভন নই, আমি সুশোভন।”

অণু বউদির উত্তর, “এখন তুমি শোভন, খুব মিষ্টি মানুষ বলে। যখন পড়াশোনা করে কেষ্টবিষ্টু হবে, তখন তুমি সুশোভন।”

সুশোভন বলুক, “আমার ভীষণ ঘুম লাগছে। আমি আজ উঠবো না।”

অণুশ্রী বউদি নিজের শরীরের উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে কমবয়সী সুশোভনকে বোঝাক, “এই ছেলেমানুষী কোরো না। বাড়িতে চিন্তা করবে।”

না, এই ভাবে থার্ডপার্সনে গপ্পো বলতে মোটেই ভাল লাগে না। নিজের নামটাই যখন দিয়েছি তখন নিজের মতন করেই গল্পটা বলি।

ঐ যে অণুশ্রী বউদি কালী ব্যানার্জি লেনের বাড়ির বিছানায় শোওয়া আমাকে রোমান্টিক নায়িকার মতন বললেন, বাড়িতে তোমার জন্যে চিন্তা করবে, এটার কোনো মানে হয় না। কারণ আমার মায়ের মানসিক ব্যাধি বেড়েছে, তাঁর খেয়ালই হবে না যে আমি বাড়ি ফিরিনি। আর আমার পিতৃদেব। পচাজ্যেঠার তাসের আড্ডা সেরে, ছাইপাঁশ ড্রিংক করে রাতদুপুরে যখন গুলাববিতলা সেকেণ্ড লেনের নিজস্ব বাটিতে ফিরবেন তখন কোনো হুঁশ থাকবে না। ঐর অপোগণ্ড ছেলে থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী?

অথচ দুনিয়ার লোকের পুরো সহানুভূতি বাবার ওপর। আহা, বেচারা! হার্ড বিজনেস লাইফ! তারওপর বউ ওইরকম। একটু আধটু ড্রিংক না করলে বাঁচবে কী ভাবে? হাজার হোক পুরুষ মানুষের শরীর তো—কত কষ্ট আর সহ্য হয় এই দেহে?

সুযোগ পেলেই পিতৃদেব গাইবেন, "কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানেন? মিনতির ধারণা আমিই ওকে পাগল করেছি। কবে কোনকালে ছেলেটার জন্ম সময়ে আপিস থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে পারিনি বলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ সন্দেহ করছে আমাকে। ওর ইচ্ছে, আমি ওর আঁচলে বন্দী হয়ে চাব্বিশ ঘণ্টা মেনি-মুখো হয়ে বসে থাকি! বন্ধুবান্ধব, গল্পগুজব কিছু চলবে না। আমি যখন আশ্রমে মহারাজদের গীতা ক্লাসে যাই তখন নজরে পড়ে না, অথচ ন'মাসে ছ' মাসে নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যে কোথায় কী একটু ড্রিংক করলাম সেটা ছেলের কাছেও লাগাবে।"

যে-লোকের নাম ছিল ঘুমকাতুরে তার চোখেই এখন ঘুম আসতে চায় না। আমি এতো সাধ্য সাধনা করে একটু ভুলতে চাইলাম সব কিছু, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমি দেখলাম, আমার মায়ের সংগ্রহে বিরাট একটা মোচা। আমার মা বলছে, শনি-মঙ্গলবার কখন দরকার হবে ঠিক নেই, হাতের গোড়ায় থাক। যা সব লোক, আসল সময়ে শরীর নাড়িয়ে মোচা আনবার ইচ্ছেই হবে না। ফলে আবার

আমাকে জন্ম নিতে হবে এই জেলখানায়। আমি ভাত বেড়ে বসে থাকবো, আমার স্বামী ইয়ারবন্ধু নিয়ে অন্য জায়গায় মাতাল হবে। ফিরে এসে ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে দেবে।"

আমি বরং চোখ খুলেই বসে থাকি। মিনতি যদি হঠাৎ অপরেশ বাগচাকে ডাইভোর্স করতেন তা হলে পরিস্থিতি কী রকম হতো, সেইটাই বসে-বসে হিসেব করি।

লেখকমশাই, আপনারা এই ধরনের পরিস্থিতি এখনও ঠিকমতো বর্ণনা করতে শিখলেন না। আপনারা বড় জোর বর্ণনার পর বর্ণনা দিয়ে একটা ছবি আঁকবেন যা মধ্যবিত্ত রমণীর হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করবে, কিন্তু ভুলেও তাকে বিদ্রোহিনীর ভূমিকায় দেখাবেন না। বিদ্রোহী বধূদের বাঙালীরা বরদাস্ত করে না—এই ত্রাসটা লেখকদের অবচেতন মনে কোথাও লুকিয়ে আছে।

ধরুন, এমন যদি একটা পরিস্থিতি হয় যেখানে অনেক উত্থান পতনের পর একমাত্র সন্তান বেশ কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখেছে।

তারপর আপনি এইরকম একটা দৃশ্য আঁকুন না—ছেলে প্রথম বিদেশ থেকে বেড়াতে এসে মাকে বলছে, "বিদেশে আমার রোজগার থেকে প্রথম উপহার হবে, মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের উকিলখরচ। এতদিন তোমার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ভয় ছিল, এখন সেসব চিন্তা থাকবে না। তুমি স্রেফ স্বামীকে আড়ালে ডেকে বলো, সারাজীবন ধরে আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখন থেকে আর নয়। এবার আমি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করছি—আমাকে একলা থাকতে দাও। তুমি তোমার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে সকাল দুপুর রাত্রি, ছুটির দিনে, কাজের দিনে কী করবে তার সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য থাকবে না। তোমার ভাতের থালা নিয়ে আমার বসে থাকার পর্ব শেষ।"

দেখুন, লেখকমশাই, আপনার উপন্যাসের চরিত্র কীরকম শক্তিময়ী হয়ে উঠবে। ছেলের খরচে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। ডাইভোর্সড্ রমণীদের কোনো অধিকার থেকেই তো বঞ্চিত হতে হয়

না। নিজেকে মিসেস বলতে পারবেন, নামের শেষে বিবাহিত জীবনের সারনেম ইচ্ছে থাকলে ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু ওই সিঁদুরটুকু পরা যায় কি না তা আপনি কোনো উকিলের কাছে জেনে নেবেন। এর পরেও যদি বিচ্ছিন্না রমণীর রক্তের কোথাও এয়োস্ত্রী হয়ে সংসার থেকে চির বিদায় নেবার বাসনা থাকে তাহলে ওই পায়ের গোড়ায় লালটুকটুকে মোচার ব্যাপারটাও সমাধান করে নেবেন। মায়ের শেষ যাত্রায় সন্তান তাঁর খাটে সোনা দিলো, না সেণ্ট দিলো, না মোচা দিলো সেটা ছেলের সুইট উইলের ওপর নির্ভর করা উচিত। কিন্তু এদেশে হয়তো তা হবে না। উকিলও এব্যাপারে কোনো হেল্‌প করতে পারবে না, গোঁড়া পুরোহিতের খপ্পরে পড়ে যেতে হবে। তা আপনি না-হয় একটু উদারমনা পুরোহিতের চরিত্র আঁকবেন। ইঙ্গিতে দেখাবেন মোচাটা রমণীদের পুষ্পবতী হবার সিমবল। এটা লোকাচার, এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই।

"হ্যালো আংকল, আপনি এখানে?"

প্লেনের মধ্যে চেনা মেয়ের চেনা গলা শুনে আমি যাকে বলে কি না মোস্ট প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড্‌। শংকরদা, আপনি নিশ্চয় অত বেশী ইংরিজি শব্দের ব্যবহার পছন্দ করবেন না—বলবেন মধুর বিস্ময়।

"হ্যালো অ্যানিটা, তুমি? এই প্লেনে?"

এই পঞ্চদশী হাবে ভাবে বেশে সম্পূর্ণ আমেরিকান। রঙটা একটু চাপা। কিন্তু লেখকমশাই আমেরিকায় আপনি কত রকমের গাত্রবর্ণ দেখবেন তা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে পাবেন না। আমেরিকানরা শুধু শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সায়েবের আতলান্তিক সংস্করণ, এই ভেবে বসে থাকবেন না।

অ্যানিটা কয়েক সপ্তাহ ইণ্ডিয়াতেই ছিল। "আমি টেম্পলস্‌ 'ডু'

করছিলাম—সাউথ এণ্ড ইস্ট। তারপর অবশ্য ক্যালকাটা।” অ্যানিটার মতে কলকাতা নাকি খুবই একসাইটিং সিটি। অ্যানিটার বাবা যা বলেছিলেন তার থেকেও উদ্দীপনাপূর্ণ।

প্লেনের মধ্যে অ্যানিটা হাঁটতে-হাঁটতে বোধহয় টয়লেটের দিকে চলে গেলো। আর শংকরদাকে আমি বললাম, “অ্যানিটা রোবিনসন ওর বাবা ডেভিড রোবিনসন সায়েব আমার মাস্টারমশাই, আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড। সপরিবারে এঁরা চমৎকার বাংলা বলেন। মাস্টারমশাইয়ের কাছে নানাভাবে আমি খুব উপকৃত, শংকরদা।”

শংকরদা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ভাবছেন, কী এমন উপকার হলো?

সেসব শুনবেন'খন একদিন। ওর সঙ্গে যে গুলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের গল্পটা আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি চমৎকার মিশিয়ে দিতে পারেন। গল্পটা এতোক্ষণ যেভাবে এগিয়েছে তাতে একমাত্র রোবিনসন সায়েবই একটা বড় মোচড় দিতে পারেন। না হলে ধরুন, কী এমন থাকে ওই ঘটনায় যেখানে আপনি দেখালেন, বাবা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখসবস্ব, মা অসুস্থ, ছেলেটা ভাল ছিল, কিন্তু ক্রমশ ঘরছাড়া হলো, তারপর ওই অণুশ্রী বউদির খপ্পরে পড়ে শরীরসুখের আস্বাদ পেয়ে ডেঁপো হয়ে বয়ে গেলো। বাংলার কত ছেলে প্রতিদিন এইরকম অসৎ সংসর্গে কৌমার্য হারিয়ে অধঃপতিত হচ্ছে। তাতে কী এমন গল্প হতে পারে আপনার?

কিন্তু ভাবুন, আপনার গল্পটা এমন একটা পরিচ্ছেদে চলে গিয়েছিল যেখানে দেখাচ্ছেন সেই বখাটে ছোকরা, যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা খারাপ করে, কলেজের পরীক্ষায় একবার ফেল করেছে—সেই এখন নামের পাশে একটা ডক্টরেট জুটিয়ে স্টাইলে কোটপ্যান্ট পরে বিদেশগামী এরোপ্লেনে বসে আছে আমেরিকায় ফেরবার জন্য। তার ভিজিটিং কার্ডও আপনার কাছে রয়েছে: ডঃ সুশোভন বাগচী, অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সোস্যাল সাইনসেস। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটাও বড়-বড় করে লেখা আছে।

মধ্যিখানে কোথাও নিশ্চয় সাধারণ অঙ্কে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ঘটবার মতন কিছু ঘটেছে—না-হলে এমন কাণ্ড তো ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনে ঘটবার কথা নয়। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পত্রিকাও দেখতে পারেন, সেখানেও প্রাক্তন ছাত্র সুশোভন বাগচীর সাফল্যের কথা গর্বভরে লেখা হয়েছে।

ওই যে ক্যামেরার কথা হচ্ছিল এবং ওই যে বালিকাটিকে দেখলেন এবং ওর পিতা রোবিনসন সায়েব ওরা সবাই ঢুকে যাক একখানা উপন্যাসের মধ্যেই।

অ্যানিটা ফিরে আসছে টয়লেট থেকে। আপনি বরং ওর সঙ্গে কথা বলুন, পশ্চিমের চোখে পূর্বকে যাচাই করে নিতে আপনি তো খুব আনন্দ উপভোগ করেন।

বাঙালী লেখক শংকর ও মার্কিনা ছাত্রী অ্যানিটা রোবিনসন এখন বিমানের দুটি পাশাপাশি সীট অধিকার করেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দু'জনের আলাপ বেশ জমে উঠেছে।

"তোমাদের মন্দিরগুলো গ্রেট!" বলছে অ্যানিটা রোবিনসন।

"যাঁরা মন্দিরগুলো পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা গ্রেট না হলে মন্দির তো গ্রেট হয় না!" লেখক সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।

কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। সেই সব কৃতী ও কুশলী মানুষের বংশধর কী করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেললো তা জানার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে অ্যানিটা রোবিনসন।

শংকরদা নিশ্চয় বুঝছেন, তাঁর পাড়ার ছেলেমেয়েরা এই বয়সে এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে না।

ভারতবর্ষের এক নম্বর ছাত্রছাত্রীরা এখনও কেবল স্মৃতিশক্তির স্টোরেজ ট্যাংক। কোন পণ্ডিত কোন অধ্যায়ে কোন বিষয়ে কী বলেছেন তা আধা-সেদ্ধ অবস্থায় মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে যথাসময়ে পরীক্ষার খাতায়

উদ্‌গীরণের জন্যে। কিন্তু কোথাও কোনো স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই। যারা নিজের মতন করে ভাবতে চায়, ভারতবর্ষের সারস্বত সমাজে তাদের জন্য সীমাহীন কষ্ট তোলা আছে। ভাল ছাত্র মানে সে যে বলবে 'অ' ও হয় 'অ্যা'ও হয়। অমুক পণ্ডিত 'অ'-র পক্ষে আর অমুক পণ্ডিত 'অ্যা'-এর পক্ষে।

অ্যানিটা যেন বুদ্ধির ব্যাডমিন্টন খেলায় নেমেছে। এক-এক সেটে তীব্র প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে লেখকের সঙ্গে, ভেঙে দিচ্ছে এদেশের বস্তাপচা মানসিকতা। ব্যক্তিগত মাধুর্য বিসর্জন না দিয়েও অ্যানিটা বেশ জোর দিয়েই বলছে, "ইয়েস, মিস্টার শংকর, আমার মা, আমার বাবা চান আমরা ভাল মেয়ে হই। কিন্তু তোমাদের 'ভাল' মেয়ে এবং আমাদের ভাল মেয়ে এক নয়। দুটোর মধ্যে দুনিয়ার পার্থক্য।"

অ্যানিটা বলে চললো, "কী সুন্দর এই ভারতবর্ষ, কিন্তু কী খারাপ করে রেখেছ তোমরা। কলকাতায় তাকালেই চোখের কষ্ট হয়। অসহ্য নোংরামি, চরম অগোছালো ভাব—অথচ তোমাদের অনেক মানুষের কোনো কাজ নেই, তারা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা স্রেফ রাস্তায় গল্প করে সময় পুড়িয়ে ফেলছে।"

অ্যানিটার মুখে প্রশংসা: "আমি ভালবাসি ভেলপুরি অ্যাণ্ড ফুচকা। ইউ এস এ-তে প্রত্যেক রাস্তায় ফুচকার দোকান হলে মন্দ হয় না।"

আর একটি মন্তব্য: "কলকাতা অনেকটা নিউ ইয়র্কের মতন। এখানে সারাক্ষণই কিছু না কিছু হচ্ছে। এখানকার লোক খুব ইনফর্মাল —কেউ স্যুট পরে ঘুরছে, কেউ স্রেফ গেঞ্জি পরে—ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভীষণ নোংরা তোমরা—রাস্তায় দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতন ইউরিনেট করছে ভদ্রঘরের ছেলেরা। টয়লেটে যাবার শিক্ষা পর্যন্ত নেই।"

"কিন্তু মেয়েরা কলকাতায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে না।" লেখকের মুখে এই কথা শুনে মোটেই একমত হলো না অ্যানিটা।

সে বললো, "একদম বাজে কথা। রকবাজ ছেলেরা শহরের কম-

বয়সী মেয়েদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। তারা মেয়েদের দিকে অসভ্যভাবে তাকাবে, শিস দেবে, মন্তব্য করবে। দক্ষিণ কলকাতায় বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম কয়েকদিন। পরতাম শালোয়ার-কামিজ। আমাকে দেখে ছোঁড়ারা আত্মসম্মানের মাথা খেয়ে বলতো, ও! ইউ আর বিউটিফুল। আসবে আমার সঙ্গে?

রাজী থাকলে নাকি আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পার্টি দেবে। অচেনা কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে যে-কোনো পুরুষমানুষ থাকলে ওরা ধরে নেয় লোকটি নিশ্চয় তোমার প্রেমিক, তোমার আত্মীয় হলেও। সিনিয়র মহিলা সঙ্গে থাকলে তো পরে কথা শুনতে হবে—সব সময় পিসিমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও কেন? উনি কি তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতেও যাবেন?"

অ্যানিটা শুনিয়ে দিলো, "কলকাতার সবচেয়ে যা খারাপ, ভিড়ের মধ্যে সুযোগ পেলেই মেয়েদের দৈহিক স্পর্শের চেষ্টা চলে, কখনও একটু ধাক্কা। বাসে ট্রামে তোমার দেহ নিষ্পেষণ হবেই। কলকাতার প্রত্যেক মেয়ের এই ছোঁড়াদের পিছনে-লাগা সম্পর্কে খারাপ অভিজ্ঞতা আছে।"

"মেয়েদের দেহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না তোমাদের পুরুষরা," অ্যানিটা এবার বেশ জোরের সঙ্গেই বললো।

বাড়ির মধ্যে মেয়েদের ওপর নাকি আরও বেশী অবিচার! "সবাই ধরে নেবে, তুমি রান্না জানো, সেলাই জানো। তারা ভাবতে পারে না আমার মতন এমন মেয়ে যথেষ্ট আছে যারা রান্না ভালবাসে না। কিন্তু রান্না না করলেও আমি ঘাস কাটি, দেওয়াল রঙ করি, ফুটবল খেলি। আমি সেলাই করতে গিয়ে ঠিকমতন পারলাম না, আমার বাবার বন্ধুর আত্মীয়রা চুপ করে থেকে তাদের নীরব সমালোচনা জানালো, আর বন্ধুর ছেলে যেমনি কোনোরকমে একটা প্যান্টের বোতাম লাগালো অমনি সব মহিলাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।"

লেখক মশাই এই মুহূর্তে ভালই শিক্ষা পাচ্ছেন অ্যানিটার কাছে। রান্না না করলেও "কলকাতার পুরুষরা বড্ড বেশী সিগারেট খায়। তারা জানে না, পশ্চিমে সিগারেটের রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া

নিয়ে বাঙালীদের বড্ড বেশী মাতামাতি। খাওয়া ছাড়া কোনো আলোচনার বিষয় নেই। মেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্নাঘরেই কাটিয়ে দেয়, কিন্তু কোনো ঘরের কাজে লাগানো ছেলেদের যায় না।"

"বাবার বন্ধুর ছেলের বিয়েতে গেলাম। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে জানাশোনা করে বিয়ে। কী চমৎকার অনুষ্ঠান! এতো রঙ, এতো মেলামেশা, এতো আনন্দ কোনো অনুষ্ঠানে পাবে না তুমি পৃথিবীতে কিন্তু জানাশোনা করে বিয়ে সত্ত্বেও অনেক বরপণ এলো—যা আমি একদম পছন্দ করি না। আমার বাবা-মা কেন আমার বিয়েতে খাট দেবেন, ফার্নিচার দেবেন, গহণাপত্র দেবেন? সবচেয়ে যা খারাপ লেগেছিল, নতুন বউকে যা করতে বলা হয়েছিল। সি হ্যাড্ টু 'প্রণাম' হার হাজবেণ্ড! এবং স্বামীর পা ধুইয়ে দিতে হলো। একটুও ভাল লাগলো না। আমি এই পয়সা দিয়ে বিয়ে ঘেন্না করি!"

অ্যানিটা এতোক্ষণে দ্রুতগতি নিয়েছে: "তোমরা অপরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটেই তোয়াক্কা করো না—যেখানে-সেখানে থুতু ফেলো ট্যাক্সি থেকে পানের পিক ছড়িয়ে দাও রাস্তায়। তোমরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলো। তোমাদের পার্ক নেই, খেলার জায়গা নেই এক আধটা পার্ক যা আছে তার মধ্যে ময়লা ফেলার পাত্র রাখার কথা তোমাদের মনে থাকে না। তোমরা সবাই যদি চাইতে তাহলে নিজেদের শহরটাকে আরও অনেক সুন্দর রাখতে পারতে।"

অ্যানিটা বলে চলেছে, "তোমাদের পুলিস রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুষ নেয়। তাদের কী করে বিশ্বাস করবো? তবে তোমাদের গরীবরা ভাল লোক—খুব বড়লোকরা কিন্তু ভীষণ কেতা দুরুস্ত, বড্ড হিসেব করে কথা বলে।"

লেখক তাকাচ্ছেন অ্যানিটার মুখের দিকে। আমেরিকায় নামবার আগেই দু'পক্ষের ভাবের আদান-প্রদানটা বেশ ভালই হচ্ছে।

অ্যানিটা তার সুপুষ্ট শরীরে হিল্লোল তুলে বললো, "তোমাদের কোনো প্রাইভেসী নেই। যৌথ পরিবারে আমি যখন ঘরের এক

কাণে পড়াশোনা করছি পডছি তখন অন্য লোকরা সেখানে বসেই অকারণে বকবক করছে। কারুর সঙ্গে একলা একটু আলাদা কথা বলা যায় না। ভেরি 'নোজি' পিপল—পরের ব্যাপারে বড্ড বেশী কৌতূহল। অন্য জায়গায় নাক গলাতে গলাতে নাকগুলো এক গজ লম্বা হয়ে গিয়েছে।"

"একটা কিছু ভাল বলো, প্লিজ," লেখকের কাতর আবেদন।

"পৃথিবীর সেরা বিরিয়ানী আমি লোয়ার সার্কুলার রোড পার্ক স্ট্রিটের জাংশনে সিরাজ বলে একটা দোকানে খেয়েছি, আমার ক্লাসিকাল মিউজিকের গাইড খাইয়েছেন। ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকের যন্ত্রগুলো থেকে সুর আদায় করা যে কী শক্ত তা দুনিয়ার লোকরা জানে না।"

"বিয়েতে দান-সামগ্রী তোমার পছন্দ হলো না তা হলে অ্যানিটা?"

"আমি ভারতীয় প্রথায় বিবাহ অনুষ্ঠান চাই, কিন্তু ইণ্ডিয়ান স্বামী নির্বাচন পদ্ধতি চাই না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ের কথা আমি ভাবতে পারি না, মিস্টার শংকর। বাঙালী মেয়েরা বিয়েতে কী চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। তাই অযথা শাড়ি-গয়নার হিসেব নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।"

বিয়েতে অ্যানিটা কী চায় তা জানতে চাইছেন শংকরদা। ভেবেছিলেন হয়তো অ্যানিটা লজ্জা পেয়ে যাবে, কিংবা বলবে, এখনও সব কিছু ভেবে উঠতে পারিনি—সময় রয়েছে হাতে।

কিন্তু অ্যানিটার বুকের মধ্যে যেন কমপিউটার চার্ট রয়েছে ভবিষ্যৎ স্বামী সম্পর্কে। একেবারে চাঁচাছোলা ধারণা।

অ্যানিটা সোজাসুজি বললো, "দেখতে ভাল হাওয়া চাই। মুখটা হবে মিষ্টি। লম্বা—এই পাঁচ ফুট দশ থেকে ছ' ফুটের মধ্যে। হাল্কা রঙ। মুখের ধাঁচটা হবে ধারালো—শার্প। হয় নর্থ আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, অথবা ইণ্ডিয়ান। আমি নিগ্রোদের সঙ্গে মেলামিশি করি না। আমার স্বামীটি হবেন বেশ প্রসন্ন মজাদার মানুষ—বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকবে। মানুষটির নিজের কাজকর্মে

আগ্রহ থাকবে কিন্তু তাতে সারাক্ষণ ডুবে থাকবেন না। রুজি-রোজগারে অবশ্যই ভাল হওয়া চাই—যদিও আমি নিজেও কাজকর্ম জোগাড় করে নেবো।"

"তার মানে তুমি উচ্চাভিলাষী কাউকে চাও না?" শংকরদা প্রশ্ন করছেন।

"যদি কারোও কিছু স্বপ্ন থাকে তা হলে সে নিয়ে অবশ্যই নাড়াচাড়া করুক—কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাজের মধ্যে ডুবে থাকা চলবে না! তোমার জেনে রাখা উচিত, যে মানুষ সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখে এবং নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে তাকে শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু তার সঙ্গে ঘরসংসার করা চলে না।"

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে অ্যানিটা বললো, "খবর পেলুম, দেখলুম, আর বিয়ে হয়ে গেলো ঐ হ্যাংলামোর মধ্যে আমি অবশ্যই নেই। স্বামী সম্পর্কে আমাকে কয়েকটা বিষয় অবশ্যই বাজিয়ে নিতে হবে।"

অ্যানিটা যেন ওদেশে কুমারী মেয়েদের স্বামী সন্তানের হ্যাণ্ডবুকখানাই শংকরদার মাধ্যমে বাঙালী মেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অ্যানিটা বলছে, "প্রথমেই বাজিয়ে দেখবো তার পার্সোনালিটি—ব্যক্তিত্ব। মানুষটার সঙ্গে ঘরসংসার করা সহজ হবে কিনা—হোয়েদার হি ইজ ইজি টু গেট অ্যালং উইথ। সব ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকারে মানুষটা বিশ্বাস করে কিনা তাও আমার জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমাকে আন্দাজ করতে হবে বিবাহিতা বউকে সে তোয়াক্কা করবে কিনা, বাড়ির দৈনন্দিন কাজকর্ম সে স্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক কিনা, নিজের সব সিদ্ধান্তই সে বউয়ের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেবার তালে আছে কিনা।"

"এমন চাইলে আমাদের দেশের কোনো মেয়ে আদৌ কোনো স্বামী খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ।" লেখক উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

"খুব পাবে!" অ্যানিটার উত্তর। "যে-মুহূর্তে তোমাদের ছেলেরা জানবে বউ পাওয়া অত সহজ হচ্ছে না সেই মুহূর্তে তারা পাল্টাতে শুরু

করবে। প্রতিযোগিতার চাপে, ভাল মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে, আদর্শ স্বামী হবার জন্যে বাঙালী ছেলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। এখন ওরা দেখছে, হুকুম করার মতন, পায়ের ধুলো নেবার মতন মেয়ে ডজন-ডজন পাওয়া যাচ্ছে নিজের চাহিদা মতন, সেক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তিত হবার প্রচেষ্টা থাকবে কেন কারুর মধ্যে? এইটাই তো স্বাভাবিক।"

ষোড়শীর মুখে কী কথা!

"তা হলে সবচেয়ে ভাল দেখলে ফুচকা, ভেলপুরি আর বিরিয়ানী। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ দেখলে কী?"

"তা এখনও তোমাকে বলা হয়নি, মিস্টার শংকর! তোমরা বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করো। এদের তোমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করো না, অথচ তোমরা শত-শত বছর আগের আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাস সম্বন্ধে প্রতিদিন চোখের জল ফেলো। ফুড, ফুড, ফুড করে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে তোমরা এতো ব্যস্ত যে কাজের লোকদের একটু ছুটি দেওয়া, একটু স্বস্তি দেওয়ার কথা তোমাদের মনে থাকে না। শ্রমের কোনো মর্যাদা নেই, তাই কলকাতা শহর ক্রমশ এতো খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

অ্যানিটা বললো, "সাংসারিক কাজের লোকদের সম্বন্ধে এই মনোভাব বাঙালীরা বিদেশেও নিয়ে আসে। আমার একজন হ্যাণ্ডিম্যান বন্ধু আছে। সে ইণ্ডিয়ান বাড়িতে কাজ করতে চায় না, বলে ওরা এমন ব্যবহার করে যেন আমি কোনো নিকৃষ্ট জীব!"

লেখকমশাই মনে-মনে বিরক্ত হচ্ছেন আন্দাজ করছি। তিনি বলছেন, "এবার আমেরিকায় আমাকেও একটা বিষয় জানতে হবে। বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক আমাকে বলে দিয়েছেন, আমরা এখান থেকে দেশের এক নম্বর ছেলেদের আমেরিকায় রপ্তানি করেছিলাম। কিন্তু ওখানে দ্বিতীয় প্রজন্মে তাদের ছেলেমেয়েরা কেন আর এক নম্বর থাকছে না?" লেখক শক্ত প্রশ্ন ছুড়লেন মনে হচ্ছে।

অ্যানিটা স্বীকার করলো, "ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আমার বাবাকে

জিজ্ঞেস কোরো, উনি নিশ্চয় বিস্তারিত উত্তর দিতে পারবেন। আমার মনে হয়, দুটো সংস্কৃতির টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় ছেলেমেয়েরা। বাড়ির মধ্যে থেকে চাপ আসছে তোমার ভারতীয়ত্ব, তোমার পারিবারিক মূল্যবোধ বজায় রাখো। আর বাইরের পরিবেশ বলছে, যে-দেশে এসেছো সে-দেশের মতন হওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় নেই। গঙ্গাজল বোঝাই ঘটি সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখলে কতক্ষণ আর সে গঙ্গাজল থাকবে ?"

"বাঃ চমৎকার বলেছো তুমি, অ্যানিটা।" লেখক তারিফ করছেন।

"স্যরি, আমার বাবাকে ধন্যবাদ দিও, উপমাটা ওঁর," অ্যানিটার তাৎক্ষণিক উত্তর।

অ্যানিটা আবার নিজের সিটে ফিরে গেলো।

আমি একটু উস্কে দিলাম শংকরদাকে, "দেখলেন আজকালকার মেয়েরা কী সব চায়। কয়েক বছর আগেও মেয়েরা কী চাইতে সাহস পেতো না তা ওর মায়ের কাছেই জেনে নেবেন। মিসেস রোবিনসন—আমাদের মলিনাদি, তাঁর সঙ্গে তো আপনার আলাপ করিয়ে দেবোই।"

রোবিনসন নামটা ইংলিশ। কিন্তু প্রফেসর ডেভিড রোবিনসনের শরীরে রয়েছে হাঙ্গেরিয় রক্ত। আদি উপাধি ছিল 'ডুব্রান্‌সকি' না ওই ধরনের কোনো একটা খটমট উচ্চারণ। কয়েক প্রজন্ম আগে যখন একজন অজ্ঞাতকুলশীল ডুব্রান্‌সকি কপর্দকহীন অবস্থায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কাছে দ্বীপে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন ভাগ্যসন্ধানে তখন এঁরা ইংরিজীও জানতেন না। দারিদ্র্যের জ্বালা, একের পর এক ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা এবং সুখী জীবন যাপনের স্বপ্ন ছাড়া এই ডুব্রান্‌সকি সঙ্গে কিছুই আনেননি।

প্রাথমিক আলোচনার সময় ইমিগ্রেশন ম্যাজিস্ট্রেট ওঁর কোনো কথা বুঝতে পারলেন না। নামটাও লিখতে পারছেন না কিছুতেই। শেষে দয়াপরবশ হয়ে রাজপুরুষ বললেন, "এই শক্ত খটমট নাম নিয়ে তুমি

নতুন এই দেশে পদে-পদে অসুবিধায় পড়বে। আমার পদবীটা নেবে তুমি? আমি রোবিনসন। ডুব্রান্সকি হারিয়ে গেলো রোবিনসনের মধ্যে। কিন্তু যাঁর ইংরিজী বলতে ভীষণ অসুবিধে, দ্বিতীয় প্রজন্মে তাঁরই সন্তান হলেন ইংরিজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। পুরনো গ্লানি এবং ব্যর্থতা মুছে ফেলে এইভাবেই নতুন ইতিহাস তৈরি হয় এদেশে।

ইংরিজী অধ্যাপক রোবিনসনের পুত্র রোবিনসনও খ্যাতনামা অধ্যাপক। ক্যামপাসে-ক্যামপাসে তাঁর খ্যাতির বিজয়কেতন।

ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের ওই মিনতির গল্পে এঁকে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন, শংকরদা?

ওই যে মিনতি কিছুদিন বদ্ধ পাগল হয়ে গেলো। দুদিনের বেশী যে মানসিক অসুস্থতা থাকতো না তাই এক সপ্তাহ ধরে লেগে থাকলো। পিতৃদেব নিজের জন্যে জুটিয়ে নিয়েছেন হারু কাকুর বাড়ি থেকে আসা টিফিন বক্স। আর বাদল পেয়ে গিয়েছে অণুশ্রীর প্রশ্রয় —খাওয়া-দাওয়ার তেমন অসুবিধে নেই। স্নেহপ্রশ্রয় শুধু নয়, গৃহস্থ লেখক হিসেবে আপনি হয়তো একটু অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন— দেহপ্রশ্রয়ও। একদিন···।

আমি জানি, আপনি বনগাঁয়ের জগদ্বিখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে কোথাও পুরুষ ও নারীর নিবিড় দেহমিলনের বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আপনারা দুজনেই রচনাবলীতে পুরুষ ও রমণী শরীরের মিলনোন্মত্ততা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কিন্তু এই আপাত গেরস্থ ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের গৃহবধূর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে জীবনটা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। আঠারো বছরের এক স্নেহকাতর প্রায়-ঘরছাড়া বালক ও তিরিশ বছরের এক সুদেহিনী রমণীর মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদান হয় না—যা সম্ভব হয় তা কেবল শারীরিক উত্তাপের বিনিময়।

আপনার নতুন উপন্যাসের যখন বিলিতি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে না তখন এই দেহকামনার জন্ম ও বিস্ফোরণ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বাকচিত্র

অঙ্কনের কোনো প্রয়োজন হয়তো নেই। দেহ থেকে শুরু করে কেমন করে প্রেমে তার পরিণতি হয় এই ব্যাপারটায় এযুগের বাঙালী সমাজের যে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই তা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বইতে ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

যদি কেউ এই বিষয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চায় তাহলে নীরদবাবুর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে পারে: একটি রমণী কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সামনে একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক হেঁটোধুতি পরে খালি গায়ে চীৎকার করছেন। পাশে একটি যুবক ও প্রৌঢ়া গৃহিণী। নীরদচন্দ্রের কোটেশন: "গৃহিণীর মুখে শুনিতে পাইলাম, 'ওমাগো, কি ঘেন্নার কথা! সোমত্ত মেয়ের বুকে হাত দেয়া!'...যুবকটি গঞ্জনার উত্তরে অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, 'আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি নিজের বোন ভেবে শুধু বোঁটাতে একটু কুরকুরনী দিয়েছিলাম।"

অণুশ্রী বউদির ওখানে ওইভাবে তলিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব হতো না যদি বাড়িতে একটু স্নেহের উপস্থিতি থাকতো। তখন নতুন বয়সে অন্যায়ের মধ্যেও বীরত্ব উঁকি মারছে।

এবার অপরেশবাবুকে একবার স্মরণ করুন। তিনি একদিন জানালেন মিনতিকে নিয়ে যাবেন মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে। ধরা-কওয়া ঠিক আছে, আউটডোরে টিকিটও কাটা থাকবে, শুধু ওখানে হাজির হওয়া। বউকে নিজে হাসপাতালে নিয়ে যাবার তাগিদ হলো, কিন্তু বললেন পুত্রকে, "আমার অনেক জরুরি কাজ আছে, তুই ওকে বেহালায় নিয়ে আয়, আমি আপিসের কাজ সেরে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।"

শংকরদা, এইবার একটা চমৎকার দৃশ্য এঁকে ফেলুন। মা যেতে চাইছেন না বাড়ি ছেড়ে, কিন্তু পিতৃনির্দেশ মানতে পুত্র নাছোড়বান্দা। মা বলছেন অসহায়ভাবে, "তুই বুঝতে পারছিস না খোকা, তোর বাপ আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছে।"

ছেলে সান্ত্বনা দিচ্ছে, "মস্ত বড় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলা রয়েছে, তিনি একবার রোগী দেখুন না।"

ঘটনাস্থলে অনির্ভরযোগ্য পিতৃদেবের আবির্ভাব হলো শেষ মুহূর্তে। বললেন, "তোর হারুকাকু দেরি করিয়ে দিলো। ব্যাংকে সেই যে টাকা তুলতে গেলো আর দেখা নেই। টাকা ছাড়া এখানে কে দেখবে?"

পিতৃদেব যা বুঝতে পারলেন না, পুত্র নাবালক হলেও তার ঘ্রাণশক্তি হয়েছে—মুখে মদের বোঁটকা গন্ধ পেতে অসুবিধে হচ্ছে না।

স্ত্রীকে দু'সপ্তাহের জন্যে মানসিক হাসপাতালে বন্দী রাখার ব্যবস্থা করে বাবা চললেন খেলার মাঠে। হারুকাকুর সঙ্গে ছেলের যে দেখা হয়ে যেতে পারে তা হিসাবের মধ্যে ছিল না। তিনি বললেন, "তোমার বাবা আজ তো আপিসেই এলেন না। গতকাল টাকা তুলিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বললেন, তোমার মাকে নিয়ে সারারাত জেগে থাকতে হচ্ছে।"

জেগে থেকেছে পুত্র, তার ঘুম আসে না বলে। আর পিতৃদেব পচাজ্যেঠার ওখানে আড্ডা সেরে পাশের ঘরে নাক ডাকিয়ে অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি তাঁর কর্তব্য সেরেছেন।

পিতৃদেব এই সময় পুত্রকে উপদেশ দিলেন, "আমি যাচ্ছি বিহারে। ক'টা দিন এবার ব্যবসার কাজে ডুবে থাকতে হবে। তুই যা ভাল বুঝিস তাই করিস।"

এই একটা চমৎকার কথা, লেখকমশাই। যে মানুষ যা ভাল বোঝে তাই করে, ইনক্লুডিং ওই পিতৃদেবটি। এই বালকটিও যা ভাল বুঝলো তাই করলো, অর্থাৎ অধঃপতনের শেষ পর্বে নেমে গেলো। অপুত্রী বিশ্বাসের শয্যা থেকে শুরু, তারপরে আরও, আরও।

হাওড়া কাসুন্দে আশ্রমের দুশো গজের মধ্যে যার বসবাস সেই যে পাকেচক্রে বাড়ি ছাড়া হয়ে অসৎসংসর্গে একেবারে বউবাজারের নোংরা জায়গায় পৌঁছতে পারে তা আপনাকে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে স্তরে-স্তরে দেখাতে হবে না। আপনি নিজের মতন করেই এক বিশৃঙ্খল যুবকের

ছবি আঁকুন যার অণুশ্রী বলে একজন নিষিদ্ধ প্রেমিকা আছে হাওড়ায়, আর আছে হাড়কাটা গলির অধঃপতন। যার এক পর্বে সরস্বতী বলে এক বারাঙ্গনার সঙ্গে পরিচিতি রয়েছে। নোংরা পাড়ায় সেকালের বাংলার স্বনাম-ধন্যাদের নামের নমুনা নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বইতে দিয়েছেন—"বকনাপিয়ারী, কোকড়াপিয়ারী, দামড়াগোপী, ছাড়ুখাগী, পেয়ারা খানুম, বেলাত্তি খানুম।" এরপর সরস্বতা নামটা ঐ একই অঞ্চলে কিছুটা বেমানান হবে ভাবছেন? আপনি চিন্তা করবেন না—মল্লিকা, মাধুরী, মানসী কত চমৎকার সংস্কৃত নামের অধিকারিণীও পাকেচক্রে ওই লাইনে এসে গিয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রশ্ন তুলবেন, "পুত্রটি অধঃপতনে যাবার পয়সা কোথায় পাবে?"

পয়সার অসুবিধে হয় না এই সব পরিস্থিতিতে। আপনি ভুল করবেন না, অণুশ্রী বউদির পয়সার টানাটানি নেই, স্বামীর উপস্থিতি অনিয়মিত হলেও তাঁর পাঠানো পয়সা নিয়মিত আসে ব্যাংক রেমিটান্স মারফৎ।

আর একটি অর্থের সূত্র খোঁজ পাওয়া গেলো পিতৃদেবের কৃপায়। পিতৃদেব নিজেই রাতদুপুরে ধরা পড়লেন গোপনে স্ত্রীর কয়েকটি গহনা চুপিচুপি সরানোর সময়। পিতৃদেব ভেবেছিলেন, সমস্ত দিনের অধ্যয়ন-তপস্যার পর পুত্র এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে যে এমনভাবে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সরাসরি সমস্যার সৃষ্টি করবে তা হিসেবে ছিল না।

"বাড়িতে সারাদিন কেউ থাকে না। তোর মায়ের গহনাগুলো ঠিক আছে কিনা তা মাঝে-মাঝে দেখা দরকার, বাদল। তোর দাদু, তোর মাকে বিয়ের সময় শরীর মুড়ে গহনা দিয়েছিলেন, কোন খেদ রাখেননি।"

চমৎকার কথা। অন্তত মাতৃকুলে জড়িত কারও সম্পর্কে প্রশংসা-সূচক মন্তব্য শোনা গেলো পূজনীয় পিতৃদেবের জিহ্বায়।

"কিন্তু পূজনীয় পিতৃদেব, অলঙ্কার-পেটিকা তো বন্ধ হয়েছে। আপনার শ্রীহস্তে একজোড়া স্বর্ণবলয় কেন?"

পিতৃদেব চমৎকার অভিনয় করলেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজে কিছু না-করে ম্যানেজের ব্যাপারে পিতৃদেব তুলনাহীন। এর থেকে কত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন তিনি। এবার তাঁর উত্তর: "অসুখটা যে কঠিন। তোর হারুকাকু বললো, 'অপরেশ তুমি কার্পণ্য কোরো না। বালিগঞ্জ থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে যাও একবার ওই মানসিক আশ্রমে। বড় ডাক্তাররা আজকাল কুড়ি বছরের বদ্ধ পাগলকে দু' সপ্তাহে ওষুধ দিয়ে চিরকালের জন্যে ভাল করে বাড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছে। ডাক্তার নন্দীর কাছে এই সব সামান্য অসুখ তো ডাল-ভাত। কিন্তু তোব হারুকাকুকে যা বলতে পারলাম না, বড় ডাক্তার মানেই তার বড় ক্ষুধা। চেম্বার হ'ল তবু একরকম কিন্তু বালিগঞ্জ থেকে বেহালা হলেই টপাটপ মিটার চড়বে।"

"তোর দাদু, মানে আমাব শ্বশুরমশাই বলতেন, শরীর ঠিক না থাকলে মাথায় মুকুট চড়িয়ে কী হবে?"

কায়দায় পেয়ে পিতৃদেবকে পুত্র একটু খেলাতে চায়। সে এখনও নির্বাক। পিতৃদেব বললেন, "শরীর আগে। গয়না যায় যাক।"

কেস ল' পাওয়া গেলো। পিতৃদেব যে এই বড় ডাক্তার দেখাবার ছুতোয় হারুকাকুর কাছেও কিছু আদায় করেছেন তার খোঁজ পেতে অসুবিধে হলো না।

এবার পুত্রই বা ছাড়ে কেন? মায়ের গহনাতে সেও একটু-আধটু কুনজর দিলো। দাদু এইসব বুঝেই নিশ্চয় অত ভারি-ভারি গহনার ব্যবস্থা করেছিলেন আদরিণী কন্যার জন্য।

এই সমৃদ্ধি থেকেই পর-পর কয়েকবার আমার ক্যামেরার ফিল্ম কিনেছি। অণুশ্রী বউদি, জিজ্ঞেস করেছেন, "কী ব্যাপার মশাই, এতো ঘন-ঘন ছবি তোলা হচ্ছে?" অণুশ্রী বউদির সাহস কি নিষিদ্ধ প্রেমের এই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করে মায়ের গহনা চুরি করেছো তুমি?

গহনা চুরি আর চুপি-চুপি সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া তো এক জিনিস নয়। অণুশ্রী বউদি যখন বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তখন বলেন, "কে

আমাকে নরকে পাঠায় ? উনি ন'মাস ধরে কোথায় কী করে বেড়ান তা কি আমি আন্দাজ করতে পারি না ? সারা বছর সন্ন্যাসী হয়ে থাকার পুরুষমানুষ এদেশে আর জন্মায় না। জন্মালেও তারা ঘরসংসারে থাকে না, বনে-জঙ্গলে কিংবা মঠে-মিশনে চলে যায়।"

আসলে ওই একই ব্যাপার। দেহ ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের কথাই এদেশের পুরুষমানুষরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না স্ত্রীলোকের মনে—ফলে মূল্য দিতে হয় অনেক বেশী। তারপর নানা আচারের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে হয় রমণীকে, বলে বেড়াতে হয় রমণীদের কামনা পুরুষ অপেক্ষা আটগুণ প্রবল।

ভবঘুরে এই অবস্থায় আপনার নতুন গল্পে আর একটি চরিত্রের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে পড়বে লেখকমশাই। তার নাম রাখা যাক গোবিন্দ।

গোবিন্দ বলতে বোকাসোকা হাঁদাগঙ্গারাম যে ভাবটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে ঠিক তেমন নয়। গোবিন্দ সেয়ানা। বেশ বুদ্ধিমান। কলেজে যায়, আড্ডা মারে। গোবিন্দ সিগারেট ফোঁকে, মদ খায়—অতি অল্পবয়স থেকে মেয়েমানুষ সম্পর্কে তার বেজায় কৌতূহল।

গোবিন্দকে ভাল লেগে গেলো নায়কের। পুরোপুরি গোবিন্দের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে সে। গোবিন্দকে সে অকারণে বিশ্বাস করে ফেলেছে। গোবিন্দ জানে মানুষটা এখন ছন্নছাড়া—ওলাবিবিতলা লেনে একটা ঠিকানা আছে, কিন্তু কোথায় কখন রাত্রি যাপন করে কিছু ঠিক নেই।

এক সময় মনে হতো, অপরেশের পুত্র ও গোবিন্দ আচার্য যেন মেড-ফর-ইচ-আদার।

একবার পিতৃদেবও দুই বন্ধুকে একসঙ্গে দেখেছেন। দেখা মাত্রই লম্বা বক্তৃতা। "তুমিই গোবিন্দ আচার্যি? বাদলের মুখে তোমার কথা শুনেছি। তোমরা কলেজে একসঙ্গে পড়াশোনা করো?

এই ছাত্রাবস্থাটা হলো সাধনার সময়। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যথেষ্ট সাধনা করেছি—পড়তে-পড়তে রাত ভোর হয়ে গিয়েছে এমন ঘটনাও অনেকবার ঘটেছে। আমাদের সময় ব্রহ্মচর্য ছিল ভীষণ কঠোর। নিজের ইচ্ছেতেই একটা ডায়রি রাখতে হতো তার নাম 'পাপের খাতা'। সারাদিনে কোনো অন্যায় চিন্তা এলেই তা নোট করে রাখতে হতো। যাতে তুমি নিজেই বুঝতে পারো কোথায় তুমি অপরাধ করলে। আর ছিল সৎসঙ্গ এবং সুগ্রন্থপাঠ। বিবেকানন্দর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ—সব কথা বুঝতে পারছি না, তবু বার বার পড়ে যেতাম। এইসব কড়া-কড়া বইগুলো হলো নারকেলের মতো। প্রথমে মনে হবে কাঠের চেয়েও শক্ত—কিন্তু যেমনি মালা ফুটো করে ভিতরে ঢুকবে অমনি ঠাণ্ডা জল, মিষ্টি শাঁস। আজেবাজে দিকে নজর না দিয়ে এই সব বই পড়বে তোমরা দুজনে। মনে রাখবে, এসব বই বোঝবার জন্যে কোনো মানে-বই নেই। এতো আর ইস্কুলে-কলেজের পরীক্ষায় পাশ নয়, জীবনের আসল টেস্ট-পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি।"

গোবিন্দ আচার্য খুব মন দিয়ে মাথা নিচু করে পিতৃদেবের কথামৃত শুনেছিল। ওই 'পাপের খাতা' সম্পর্কে তার কৌতূহল। সে প্রশ্ন করে বললো, "যদি অন্য লোকে ওই খাতা দেখে ফেলে?"

"ছাখে দেখবে। আমার এক বন্ধু 'রূপমোহ' কথাটার তলায় বেশ কয়েকবার টিক মেরেছিল। তার মা তো তা দেখে, খুব রেগে গিয়ে খাতাই ছিঁড়ে ফেললেন। পরে সেই ছেলে সন্ন্যাসী হলো—মা আটকাতে পারলেন না। তোমরা তার নাম শুনে থাকতে পারো স্বামী মহাত্মানন্দ—এলাহাবাদে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করেন।"

পিতৃদেব এরপর যুবকদের নৈতিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের যুগটা যে আরও কঠিন ছিল এবং বহু প্রচেষ্টার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা যে সংসারাশ্রমের এই পর্যায়ে পৌঁচেছেন তা বোঝালেন।

তার কয়েকদিন পরেই কিন্তু গোবিন্দর রিপোর্ট পুত্রকে। "খুব বেঁচে গিয়েছি রে। নিজেও ডুবতাম, তোকেও ডোবাতাম। এক বন্ধুকে বাগিয়ে খালাসিটোলায় দোকানে ঢুকে এক বোতল মালের অর্ডার দিতে যাচ্ছি, এমন সময় নজরে পড়লো দোকানের অন্য কোণে তোর পিতৃদেব আসন আলো করে বসে আছেন! ঝট করে উঠে পড়ে পালিয়ে এসেছি—যদিও মেজাজটা দরকচা মেরে রইলো, তেষ্টার সময় গলাটা একটু ভেজানো গেলো না।"

এই সুযোগে আপনি পিতাপুত্রের একটা বিশেষ সম্পর্ক বুনে ফেলতে পারেন শংকরদা। পুত্র এরপর প্রায় পুরোপুরি ওই গোবিন্দর খপ্পরে চলে যাচ্ছে পুত্র একমাত্র ওইখানেই ধরা পড়ে গিয়েছে—যে জালে পিতৃদেব মদের দোকানে সময় কাটান নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যে। অসুস্থ মাতাকে অবহেলা করে পিতার এই মাসসেবন পুত্রকেও অভিমানসাগরে অথবা অপমানসাগরে নিমজ্জিত করছে ফলে চেইন রি-অ্যাকশন—প্রতিশোধ নেবার জন্যেই যেন সে হাড়কাটা-গলিতে সরস্বতীর সঙ্গে ভাব করলো।

গোবিন্দ আচার্য চরিত্রটা মোটেই ভাল নয়। ওই যে মনের সব ইচ্ছে চেপে থাকার প্রচেষ্টা যে-সমাজে, সেখানে যেরকম মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।

রমণী শরীর সম্পর্কে গোবিন্দর নানা ইচ্ছে আছে কিন্তু তেমন সুযোগ পায় না। অণুশ্রীর কথা সে বিশ্বাসই করে না। অণুশ্রী তার বন্ধুকে মায়ের স্নেহ না-পাওয়া ছেলে বলে স্নেহ করে, না অণুশ্রী সত্যিই ওই শ্রীমানকে ভালবাসে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সেই অণুশ্রীই যে ক্যামেরা উপহার দিয়েছে, অনেকগুলো ফিল্ম কিনে দিয়েছে তাও বিশ্বাস করে না।

গোবিন্দ নিজেও এই সব স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সুযোগ পায় না কখনও। তাই বন্ধুর ব্যাপারটাও সে নিছক গল্প বলে ভাবতে চায়। কম বয়সের বন্ধুটিও চ্যালেঞ্জে রেগে ওঠে—প্রমাণ দেবার জন্যে চ্যালেঞ্জ নেয়, যদিও বোঝে না ব্যাপারটা তার পক্ষে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

শংকরদা, আপনি তো অনেক বছর ধরে, গল্পের জটিল প্লট নিয়ে খেলা করছেন এইখানে যদি বলি গল্পে একটা ক্যামেরাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে, তা হলে আপনি নিশ্চয় খুব চিন্তিত হয়ে উঠবেন না।

ক্যামেরা যে বকাটে বাঙালীর প্রতীক তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আপনি মহাপণ্ডিতের রচনায় ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন। এখন যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া ব্যবস্থা করা যাক। যার সান্নিধ্য বাদল নামক বালকটি সহজে পেয়েছে, যার দেহ আবিষ্কারের দুর্লভ সৌভাগ্যও হয়েছে, ছেলেমানুষীর খপ্পরে পড়ে তারই নিরাভরণ শরীরের কিছু 'খারাপ' ছবি তোলা যাক।

কেউ হয়তো বলবে, কেমন করে এমন সম্ভব ? কোন মেয়ে আজকাল এতো বোকা যে এইভাবে ছবি তুলিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবে ?

আপনি নিঃসন্দেহে লিখে দিতে পারেন, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীদের এই পৃথিবীতে এখনও অনেক বোকামানুষ আছে বলেই নানা অঘটন ঘটছে। যখন অঘটন ঘটে তখন নায়ক-নায়িকাদের অতো হিসেব-নিকেশের শক্তি থাকে না।

সত্যি কথা বলতে কি, অতোই যদি হিসেব ঠিক থাকবে তা হলে অণুশ্রী খাল কেটে কেন একটা আধ-চেনা ছোঁড়াকে কুমিরের মতো নিজের বিছানায় ডেকে আনবে ? অণুশ্রীর তো এর থেকে সারাক্ষণই চরম বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

যাঁরা মানুষের মন নিয়ে খোঁজখবর করেন—তাঁরা হয়তো দুটো সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাবেন। ওই মিনতিপুত্র শ্রীমান বাদল মানসিক জটিলতার বলি হিসেবে অমোঘ অধঃপতনের দিকে ছুটে যেতোই। অণুশ্রী তখন নিঃসঙ্গতার জ্বালায় সঙ্গীতৃষ্ণায় কাতর হয়ে উঠেছে ; কিংবা

চিরদিনের চেপেরাখা রমণীশক্তি অকস্মাৎ বিদ্রোহ করার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আপনি ইতিহাসে দেখবেন, বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ অনেক সময় কোনো যোগ্য 'সমস্যাকে' কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠেনি, জ্বলে পুড়ে মরতে চায় বলেই মেয়েরা অনেক সময় নিজেদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

ক্যামেরায় ছবি উঠুক, শংকরদা। একটা কিছু বিপদের আশঙ্কা থাকুক পাঠক-পাঠিকাদের মনে। তারা ভাবুক, এই ছবি অণুশ্রীর স্বামীর অথবা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের হাতে পড়বে। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় ভারতবর্ষে যত জমে ওঠে পৃথিবীর আর কোথাও তত জমে না। এখানে সব দুর্গন্ধ হাঁড়ির মধ্যে জমা থাকে—প্রত্যেকেরই হাঁড়ি আছে, কিন্তু কেউ হাঁড়ি হাটে আনতে চায় না। আপনি যেদেশে যাচ্ছেন সেদেশে সবার হাঁড়ির সরা খোলা। জাতটার কোথায় কী হচ্ছে তা এক মুহূর্তে জানতে পারবেন। সরা খোলা বলেই দুর্গন্ধ জমে ওঠে না, কারুর হাঁড়ি হাটে ভাঙা হবে বলে ভয়ও দেখানো যায় না।

অথচ আমার মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীদের যদি বলি কত সামান্য ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে কত মেয়ে পবিত্র ভারতভূমিতে বিষ খায়, জলে ঝাঁপ দেয়, পোষা কুকুরের মতন দুষ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাহলে ওরা হেসে গড়িয়ে পড়বে, বিশ্বাসই করবে না। ভারতবর্ষ পরমাণুর শক্তিকে বাগ মানিয়েছে, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংখ্যায় আপনারা পৃথিবীর সেরা তিন দেশের একটি, ও-দেশে এরোপ্লেন বানানো হয়, মহাকাশে রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু অলিতে-গলিতে, গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র মানুষের হাঁড়িতে সরা চাপানো।

আরও একটা সম্ভাবনা আছে—বিপদটা ওই ওলাবিবিতলা লেনেও গজিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেখানে তেমন ভয় পাবার থাকবে না। অপরেশ বাগচী তো কেমন মনের সুখে সসম্মানে সুখসর্বস্ব জীবনযাপন করছেন। বাঙালী পুরুষরা হলো স্টেনলেস স্টীল, দাগ পড়লেও চট করে মুছে নেওয়া যায়, কলঙ্কের চিহ্ন থাকে না কোথাও।

কিন্তু ক্যামেরাটা আপনার গল্পে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, শংকরদা। ওই যে গোবিন্দ আচার্য যদি ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঠিকমতন খেলতে পারতো, তা হলে আপনার নায়ক বাদল হাড়গোড় ভেঙে মানসম্মান হারিয়ে দেশেই পড়ে থাকতো। আর একটা ব্যর্থ অথচ ফোকড় পুরুষের সংখ্যা বাড়তো, কিন্তু সমাজে কারুর কিছু এসে যেতো না।

আপনি ক্যামেরার কারিকুরি সম্বন্ধে ততক্ষণ একটু ভাবুন। আমি বরং ওই রোবিনসন সায়েবের ব্যাপারটা বলি। ভারতবর্ষের হাঁড়িতে-হাঁড়িতে এতো পচা দুর্গন্ধ, কিন্তু তবু কেউ-কেউ এই ভারতবর্ষের ভালবাসায় পড়ে যায়। ভারতবর্ষের মোহিনী-মায়া যে বড় খারাপ জিনিস তা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজও বুঝেছিল, তাই এদেশে নিজের লোকরা সম্পত্তি করুক, ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করুক তাতে সায় ছিল না।

রোবিনসন সায়েবকে আপনার গল্পে লাগাতে চাইলে একটা আকর্ষণীয় পরিস্থিতি ভাবুন। খুব মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে। রোবিনসন অনেকদিন আগে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে একবার ভারতবর্ষে গিয়েছেন। পড়াতেন দিল্লির কাছে কোনো প্রতিষ্ঠানে সামান্য কিছুদিনের জন্যে। তারপর মাঝে-মাঝে বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে গিয়েছেন।

রোবিনসন সায়েব সেবারে কলকাতায় এলেন বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার শেষে দেখতে চাইলেন কলকাতা—ট্যুরিস্টদের কলকাতা নয়, যে-কলকাতা গত তিনশো বছর ধরে নিজের খেয়ালে চলেছে অজানা কোনো উদ্দেশের দিকে, যে-কলকাতার কথা জেনেও কেউ তেমন মুখ খুলতে চায় না। ভাগ্য ভাল ওই বাদলের। চান্স পেয়ে গেলো পণ্ডিত মানুষটিকে কলকাতা দেখানোর। চমৎকার এক সুযোগ—সায়েবের ভাড়া-করা গাড়ি, শুধু সায়েবকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শহর দেখানো। এই সায়েব কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে চায় না, বিড়লা তারামণ্ডলে কোনো আগ্রহ নেই, এমন কি মনুমেন্ট, রাজভবন, হাইকোর্ট ভবন সম্বন্ধেও কোনো ঔৎসুক্য নেই।

সায়েব চাইছিলেন সাধারণ কলকাতা দেখতে। গভীর আগ্রহে

সায়েব শিয়ালদহ স্টেশন ঘুরে বেড়ালেন, কলেজ স্ট্রিটে কচি ডাব খেলেন, মেছুয়াবাজারে ফলের দর করলেন। শহরে এতো রাস্তা থাকতে জ্যামজমাট চিৎপুরে গাড়ি ঢোকাতে সায়েব আপত্তি করলেন না।

হুদিন ধরে রোবিনসন সায়েব শুনলেন এই শহর সম্পর্কে গুলাবিবিতলার মানুষের বক্তব্য! রোবিনসন সায়েবকে নিয়ে সেই বেহালা মানসিক হাসপাতাল পর্যন্ত চলে গিয়েছে আপনার গল্পের চরিত্র বাদল। হু' মিনিট ছুটি চেয়ে নিয়েছে সে।

সায়েব জিজ্ঞেস করেছেন, "এখানে কী করবে?"

"আমার মা ভর্তি রয়েছেন," বাদল বলেছে।

হাসপাতালে মায়ের সঙ্গেও রোবিনসন সায়েবের দেখা হলো। মা তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুধু ভাবছেন, কেন তাঁর স্বামী তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছেন না?

হাসপাতালে মিনতি বাগচীর সঙ্গে রোবিনসন সায়েবের সাক্ষাতের দৃশ্যটা আপনি স্নিগ্ধ রসে ভরে তুলতে পারেন। সায়েবকে দেখে মা দুঃখ করছেন, "আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আদরযত্ন করতে পারলাম না।" তারপর কী ভেবে অনুরোধ করলেন, "আমার ছেলেটিকে একটু আশীর্বাদ করবেন।"

রোবিনসন সায়েব রাস্তায় বেরিয়ে বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, "পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে আমি কেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে যাবো?"

বাদল বললো, "এইটাই রীতি। এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ যে-কেউ কনিষ্ঠকে আশীর্বাদ করতে পারে। সমস্ত লোকের শুভেচ্ছা ভিক্ষা করার পরেও বহু লোকের জীবন অচল হয়ে উঠছে।"

সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বি-এ পরীক্ষার ফল কেমন হবে এবার?"

পথপ্রদর্শক একবার যে পরীক্ষায় পটকা মেরেছে তা লজ্জায় জানানো হলো না। এবার যে কী হবে তাও অনিশ্চিত—হাঁসের ওপর চড়া

সরস্বতী এবং আর একটা রক্তমাংসের সরস্বতীর মধ্যে সুশোভনের মুচমুচে জীবন নিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার চলেছে।

সায়েবকে বোঝানো হলো, ফল ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। পরীক্ষার সময় বাড়িতে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল—এই যে স্নেহময়ী মায়ের অসুখ-বিসুখ।

সায়েব জানিয়েছিলেন, "পরীক্ষায় ভাল না হলেও আমি মাথা ঘামাবো না। তুমি কিন্তু পাশ করেই চলে আসবে আমার ইউনিভার্সিটিতে। তারপর দেখা যাবে।"

সায়েব কী যে বললেন তা বোধ হয় নিজেই বুঝলেন না। কিন্তু সায়েবদের মস্ত একটা গুণ (স্বয়ং অপরেশ বাগচীও তা স্বীকার করেন) একবার যা কবুল করে তা থেকে সহজে পিছিয়ে যায় না। হাতি কা দাঁত আর সায়েবকা বাত—ব্যাপারটা যে সব সময় সত্যি নয় তা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে আপনার বিদেশে একটা জীবন কেটে যাবে। কিন্তু, যাদের সম্বন্ধে যা রটে যায়। একবার কিছু প্রচার হলে তা মুছে যেতে বেশ সময় লাগে, এইটাই ইতিহাসের নিয়ম। তাই আমাদের দেশে সায়েবের বাত মহামূল্যবান, আর এদেশের মেয়েমহলে ভারতীয় স্বামীরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, তারা আত্মসুখের সন্ধানে অপরজনকে নিষ্ঠুরভাবে সময়ের ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না।

শংকরদা, আপনি চুপচাপ রয়েছেন। কোনো মন্তব্য পর্যন্ত করছেন না। অতলান্তিক পেরিয়ে আমাদের লক্ষ্যস্থল আর দূর নয় বলে আপনি কি আনমনা হয়ে উঠছেন ?

ওই অ্যানিটা সম্বন্ধে আপনি কিছু চিন্তা করছেন ? মার্কিনী সমাজের ভিত্তিভূমিতে কী দুর্বলতা বা অভিশাপ আছে তা আপনি জানতে চাইছেন ?

আপনি মার্কিন ভূখণ্ডে পা-দিয়ে ডজনে-ডজনে ওসব খবর পেয়ে যাবেন। এ-দেশের ওপর আদি অভিশাপের খবরটাও যে-কোনো ইতিহাসের বই থেকে পড়ে নিতে পারবেন। যে-কলম্বাস এই নতুন বিশ্বকে

আবিষ্কার করে সমস্ত ইউরোপকে ধনৈশ্বর্যশালিনী করে তুললেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায়, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। আপনি আরও নাটকীয়তা চান? রোবিনসন সায়েবের কাছ থেকে শুনবেন, যে-কলম্বাস নতুন দেশে ক্রীতদাস ব্যবসা চালু করার ফন্দি এঁটেছিলেন তাঁকেই সমুদ্রযাত্রা থেকে ফেরবার সময় জাহাজে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

আপনি জানতে চাইছেন, আমেরিকান সমাজে চালু মিথ্যাচার কী কী? আমি যে তিনটে প্রায়ই শুনে থাকি, তা লিখে নিতে পারেন। একনম্বর মিথ্যা: "তোমাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেলো না।" দু নম্বর মিথ্যা: "তোমার পাওনা টাকার চেক ডাক মারফত রওনা হয়ে গিয়েছে।" তৃতীয় মিথ্যাটা শুনবেন? পুরুষরা ডেটিং-এর সময় বান্ধবীকে বলে, "আজকের মিলনে তুমি সন্তানসম্ভবা হলে আমি অবশ্যই তোমাকে বিয়ে করবো।"

আমি সুশোভন বাগচী অবশেষে মার্কিন দেশে নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছি। দাঁড়ের পাখি কিছুদিন দাঁড় ছাড়া হলে একটু অসুবিধে হয়।

আমার ভাবতে লজ্জা লাগছে, এরোপ্লেনে একটু মাত্রাতিরিক্ত হুইস্কি পান হয়েছিল। সমস্ত রাস্তা আমাদের হাওড়ার লেখকের সঙ্গে একটু বাড়তি আলাপ-আলোচনা করে ফেলেছি।

জরুরী কাজকর্ম ছিল বেশ কিছু। এই ক'দিনে অনেকক্ষণ খেটে সে সব সেরে নিয়েছি। আমার সমস্ত জীবনটা পিছিয়ে থাকা কাজের বোঝা টানতে-টানতেই চলেছে। সব কিছু যদি ঠিক সময়ে করতাম তাহলে উদ্বেগ অনেক কম হতো।

শংকরদা আজ এখানে আসছেন। বাউণ্ডুলে ব্যাচেলরের ডেরায়

ওঁকে থাকতে বলিনি এই কারণে, যে-বাঙালীরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের গ্যারেজে একটি করে সুদৃশ্য গাড়ি এবং বাড়িতে একটি ততোধিক সুদৃশ্যা ও নির্ভরযোগ্যা বধূ আছেন। এই বধূদের অনেকেই যাতে প্রবল পরিতৃপ্তি লাভ করেন তার নাম অতিথি সেবা। রোবিনসন সায়েবও বলেন, "পৃথিবীতে আর কোনো সমাজের মহিলারা অপরকে খাইয়ে এমন পরিতৃপ্তি পান না।"

সমস্ত কাজকর্ম সেরে শংকরদা আজ আসছেন, দরকার হলে সারারাত আসর জমবে। বিদেশে বাঙালী ছেলেরাও যে রন্ধনশিল্পে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাবেন।

আমার মাকে যখন বলেছিলাম, আমি মোচার ঘণ্ট ছাড়া আর সবই রাঁধতে পারি তখন তিনি বিশ্বাস করেননি। মোচাও হয়তো ইচ্ছে করলে আয়ত্তে আনা যেতো, কিন্তু কেন জানি না ওই জিনিসটি সম্বন্ধে আমার মনের গভীরে প্রবল অনীহা জন্মেছিল। বাঙালী পুরুষের উনিশ-শতকী মেজাজের প্রতীক হিসাবে যদি কিছু দেখাতে হয় তা হলে আমি এই মোচাই ব্যবহার করবো। যদি কখনও আমি বাঙালী মেয়েদের মুক্তির স্বাদ সম্পর্কে গবেষণামূলক কোনো গ্রন্থ রচনা করি তার প্রচ্ছদেও সিঁদুর ও আলতার সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত একটা গর্ভমোচার রঙিন ছবি থাকবে।

আমেরিকান-হাওয়া গায়ে লেগেছে লেখক শংকরদার মনে। আগাম একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটা একবার পড়ে ফেলা যাক :

স্নেহের সুশোভন,

আমার আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযান বিপুল বিক্রমে এগোবার পিছনে তোমার হাত অনেকখানি রয়েছে একথা অস্বীকার করলে নেমকহারামি হবে—যদিও এবার দেখছি এদেশের সায়েবমেমদের মতন বামারিকানরাও (বাঙালী + আমেরিকান) চিনি ও নুন দুই এড়িয়ে

চলেছেন সযত্নে।

সুশোভন, সেদিন তুমি সাবধান করে দিয়েছিলে, ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস আমেরিকায় হাজির হয়েছিলেন ভুল করে। আকাশপথে তোমার সুদীর্ঘ সান্নিধ্যে আমিও আমেরিকা আবিষ্কার করতে এসে পথভ্রষ্ট হয়ে শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের সন্ধান পাই।

তোমার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা, শ্রীমতী রোবিনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে। আর অনুরাধার ব্যাপারে তোমাকে অর্ধেকের বেশী কৃতিত্ব দেওয়া উচিত কিনা আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

তার কারণ অনুরাধার সঙ্গে সেদিন বিমানবন্দরে আলাপের পর রাত্রে দত্তমশায়ের বাড়িতে গিয়ে মনে পড়লো ওর জন্যেও আমি একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম খোদ শ্বশুরালয় থেকে। সম্পর্কে সে আমার শ্যালিকাও বলতে পারো।

নীরদ চৌধুরী বিপুল রোষে বাঙালী পুরুষের সব রকম নারী-সম্পর্কের সর্বনাশ ঘটালেও শ্যালিকা সম্বন্ধে কোনো কটূক্তি করেননি। এর থেকে প্রমাণ হয়—এই সম্পর্কটাই বাঙালী পুরুষের জীবনে কামক্লেদে কলুষিত নয়। বাঙালী পুরুষকে যদি ইউরোপীয় অর্থে কোনোদিন প্রেমিক হয়ে উঠবার সাধনায় নামতে হয় তা হলে এই শ্যালিকা সম্পর্কটাই কেবল কাজে লাগবে। নীরদবাবুর বইটা তুমি আমার প্রীতি উপহার হিসেবে নিজের কাছে রাখতে পারো। ওসব লোকাচারের ব্যাপার আমরা এমনই হাড়ে-হাড়ে জানি যে বই পড়ে বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

তুমি সেদিন ভীষণ নিষ্ঠুর হয়েছিলে। বলেছিলে, "বাঙালী পুরুষের দু'নম্বর খাতা এতোদিন লুকোনো ছিল, এখন ছাপানো হয়ে গিয়েছে নীরদবাবুর দুঃসাহসে।"

আমার একটাই আবেদন: তুমি দেখবে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই

নীরদবাবু সমসাময়িক লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মাত্র। আমার এক রামকৃষ্ণভক্ত দাদা বলেন, ব্রাহ্মরা না এলে বাঙালীর ভরাডুবি হতো, চরিত্র বলে কিছু থাকতো না—কথাটা একবার পুনর্বিবেচনা করে দেখো। তোমরা সমাজকে বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখো। তোমরাও একবার অনুগ্রহ করে ভাবতে পারো, খৃষ্টান পাদ্রিরাও এক সময় এই চরিত্রহীনতার অপবাদ সমস্ত বাঙালী পুরুষের গায়ে ছিটোতে তৎপর হয়েছিলেন। এরই রিঅ্যাকশনে, কেউ যদি বলে থাকেন, "তোমরা পাপী-তাপী নও, স্বয়ং ভগবান তোমার দেহের মধ্যেই ফ্ল্যাট নিয়েছেন, তাহলে দোষটা কী? পড়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াবার জন্যেও তো মানুষের আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন হয়।"

সুশোভন, আমি অনুরাধা সম্বন্ধে যা জানতাম না তা হলো ওর ডাক নাম টুপটুপ। টাপুর টুপুর জানা ছিল, কিন্তু বাঙালী মেয়ে মানেই তো চোখের জল। সুতরাং টুপটুপটাই ভাল। টুপটুপ এখানে এসেছে তোমারই সাহায্যে, তা কিন্তু তুমি আমাকে বলোনি। আমি শুনলাম, ওর বাবা হারাধন লাহিড়ী তোমার পিতৃবন্ধু। এঁরা আমার শ্বশুরবাড়ির পরিচিত। হারাধনবাবুর ছোটখাট একটি ব্যবসা আছে। এবং তাঁর পার্টনারের নাম যে অপরেশ বাগচা তা আমার খেয়াল ছিল না।

টুপটুপের সঙ্গে আজ যাবো ওর কাজকর্ম নিজের চোখে দেখতে। ওরা কী করে গবেষণার রসদ সংগ্রহ করে তা নিজের বুদ্ধিতে নিজেই একটু বুঝে নেবো।

টুপটুপ বলছিল, "আপনি নিজে কিছু করুন, না-হলে কোনো বাঙালী মহিলা লেখিকাকে পাঠিয়ে দিন। এদেশে যারা একা থাকে তারা সারা দেশটাকেই কী করে একাকিত্বে ভরিয়ে তুলছে তার অবিশ্বাস্য ছবি পেয়ে যাবেন।"

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেও মানুষ নাকি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হচ্ছে এদেশে। আগে একাকিত্বর প্রয়োজন হতো ঈশ্বরসন্ধানে, এখন সুখের সন্ধানেও

সামাজিক মানুষ একাকিত্বকে বেছে নিচ্ছে।

লোনলিনেস সম্বন্ধে আমি কাকে লেকচার দিচ্ছি! তোমার জানাশোনা মেয়েই তো আমার চোখ খুলে দিচ্ছে। রোবিনসন দম্পতি তো টুপটুপ বলতে অজ্ঞান! অবশ্য টুপটুপ জানালো, ওই দম্পতি ইণ্ডিয়ার কোনো অন্যায় দেখেন না, ভারতীয়দের সম্বন্ধে ডেভিডের মতামতের কোনো মূল্য নেই! টুপটুপ সম্পর্কে অনেক তর্কাতর্কি হবে তোমার ও তার সঙ্গে। এখন রোবিনসন দম্পতি সম্পর্কে আমার কথাগুলো লিখে ফেলা যাক।

আমি দেখলাম, এঁরা বিশ্বনাগরিক বলতে যা বোঝায় তাই। ডেভিডের ষাট বছরের দেহটার মধ্যে এমন এক শান্ত মহিমা ছড়িয়ে আছে যা খুঁজে পাবার জন্য আমি এক সময় বিভিন্ন উপাসনালয়ে প্রভু যীশুর ছবি দেখে বেড়াতাম। অমন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির সন্ধান আর কোনো মহামানবের মধ্যে দেখিনি আমি।

ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে অনেক খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। আমার প্রথম খবর : ডেভিড রোবিনসন তোমার সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ওঁর মতে, এখানে গত কয়েক বছরে সুশোভন বাগচী যে সামাজিক গবেষণা করেছে তা পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় পরীক্ষাযন্ত্রগুলি এখনও পর্যন্ত মানুষের প্রতিভা নিরূপণের ব্যাপারে তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। কলকাতায় বি-এ পরীক্ষায় সুশোভন বাগচীর কেন আশানুরূপ ফল হয়নি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন তার বিশিষ্টতা চিহ্নিত করতে পারেননি তা রোবিনসনের বিদ্যাবুদ্ধির অগোচর।

রোবিনসন সায়েব তো ভারতবর্ষের কাউকে সমালোচনা জালে আবদ্ধ করেন না, তবু বললেন, মার্কিন দেশে তোমার কৃতিত্বর নমুনা দেখে তাঁর ভয় হয়, আরও অনেক সুশোভন বাগচী এমনিভাবেই ভারতীয় পরীক্ষাযন্ত্র কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে পরিবেশের নিষ্ঠুরতায় প্রস্ফুটিত

হবার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমি শুনলাম, এদেশে ছাত্র হিসেবে এসেই তুমি সোনা ফলিয়েছো। যে-ছেলে কলকাতায় বি-এ পরীক্ষায় ঠোক্কর খেলো সে এখানে এসে সবাইকে চমৎকৃত করলো কোন গুণে?

রোবিনসনের পরবর্তী মন্তব্য, তুমি ডেট্রয়েটের বকাটে ছেলেদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে যে চিত্র সংগ্রহ করেছিলে তা একজন নবাগত ভারতীয়র পক্ষে কীভাবে সম্ভব হলো তাও এক বিস্ময়। একমাত্র ভারতবর্ষের বহুযুগের প্রজ্ঞাই নবাগত অনুসন্ধিৎসুকে এই তৃতীয় নয়ন দান করতে পারে।

সেদিন প্লেনে তুমি যে-গল্পটা আমার জন্যে তৈরি করবার চেষ্টা করছিলে তার সঙ্গে একটু-আধটু মিল পাওয়া গেলো। তোমাকে দেখে রোবিনসন মুগ্ধ হয়েছেন, তোমার পরীক্ষার খারাপ ফলাফল দেখে ইণ্ডিয়ান শিক্ষকদের মতো সেই মতামত পরিবর্তন করতে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না।

রোবিনসন সম্পর্কে তুমি আমাকে একটা মধুর সারপ্রাইজ দিয়েছো। ওঁর স্ত্রী যে বাঙালী তা আগে বলোনি।

আমি মধ্যবয়সিনী সুনয়নী ঐ মহিলাকে প্রথমে দেখে ভাবলাম দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছেন, ইংরিজী উচ্চারণে মার্কিনী নাসিকা-ধ্বনি তাই তেমন প্রবল নয়। কিন্তু তার পরেই বিস্ময়। অধ্যাপক রোবিনসন নিজেই বললেন, "আমার স্ত্রীর দেশের লোক আপনি। সুতরাং আপনাকে শালা বলে গালি দিলেও আপনি বিরক্তি প্রকাশ করতে পারবেন না।"

রোবিনসন লোকটি দার্শনিক। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের মধ্যে দূরত্বের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সম্পর্কে বললেন, "আমি ওসব বুঝতে পারি না। ভবঘুরে জীবনে যেখানেই আমি মাথার টুপি নামিয়ে রাখি সেইটাই আমার ঘর। হয়ার আই কীপ মাই হ্যাট ইজ হোম।" রবীন্দ্রনাথও কথাটা অন্যভাবে বলেছিলেন, দেশে দেশে মোর ঘর

আছে। আর এখন এই বিষাক্ত সময়ে অনুদার মানুষ ঘরে-ঘরে আলাদা দেশ তৈরির নির্বুদ্ধিতা দেখাচ্ছে।

রোবিনসন বললেন, "আমি আপনাদের দেশের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে এসেছি। আমার স্ত্রী!"

আমি রসিকতা করলাম, "কোথায় দেখা হলো? আপনার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে?"

ভদ্রলোক এবার কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গটি একটু যেন এড়িয়ে গেলেন।

কথা প্রসঙ্গে আমি অ্যানিটার প্রশংসা করলাম। এদেশে আসবার সময় বিমানে ওর কথাবার্তায় আমি প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।

ডেভিড রোবিনসন নিজের মেয়ের সম্বন্ধে সস্নেহে বললেন, "বয়স কম, এখনও কামড়াবার চেষ্টা রয়ে গিয়েছে। পরে দেখো কী হয়! আমার ধারণা অ্যানিটা একদিন ভারতবর্ষের যথার্থ অনুরাগিণী হয়ে উঠবে। ওর অন্য কোনো চয়েস থাকবে না।"

যথা সময়ে ডেভিডসন সায়েব তো চললেন কলেজে—সেখানে অনেক কাজ। আর আমার বিদেশযাত্রা সার্থক করার জন্য মেমসায়েব যা কষ্ট করলেন তা ভাবা যায় না। খুব যত্ন করে কফি খাওয়ালেন। তারপর গ্যারাজ থেকে বের করলেন বিরাট নতুন গাড়ি—ডাটস্থন বোধ হয়। এখানে কতরকমের যে গাড়ি—দুনিয়ার সব জাত এই মার্কিন মুলুকে চারচাকার মোটর গাড়ি বেচে জাতে উঠতে চায়, একমাত্র ইণ্ডিয়া ছাড়া।

শ্রীমতী রোবিনসন কিন্তু স্বামীর প্রসঙ্গ তুললেন। "উনি বলেন, জাপান অথবা কোরিয়ার মতো ভারতবর্ষ এদেশে মোটরগাড়ি বেচতে পারেনি তো কী হয়েছে? গাড়ি বেচে কী হবে? ইণ্ডিয়ায় আরও মূল্যবান জিনিস আছে পৃথিবীকে দেবার।"

মধ্যবয়সিনী বাঙালী মহিলা যে বিদেশের রাজপথে এমন চমৎকার ড্রাইভিং এক্সপার্ট হতে পারেন তা আমার ধারণা ছিল না। কলকাতায়

মহিলাচালিত গাড়িতে উঠলেই আমার চিন্তা হয়। কিন্তু এই মহিলা এমন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর যে চিন্তার প্রশ্নই ওঠে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মিসেস রোবিনসন আমাকে সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে-ঘুরে দেখালেন—অন্তত শতখানেক মাইল আমাদের পিছনে পড়ে রইলো।

রোবিনসন গৃহিনীর নামটি আমি আগেই শুনে নিয়েছি—মলিনা। মলিনা পরেছেন লাল টকটকে প্যান্ট—একে জিন্‌স বলা যায় কিনা জানি না। আমার যেন কেমন ধারণা, ঘন নীল না হলে জিন্‌স হয় না। সেই উনিশ শ সাতষট্টি সালেও জিন্‌স-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল মূল মার্কিনী ভূখণ্ডে। লাল রঙটা কীরকম লাল বলতে গেলে মোচার কথা উঠতে পারে—কিন্তু মহিলাদের পরিপ্রেক্ষিতে ওই ছবিটা তুমি কেমন অস্বস্তিকর করে দিয়েছো। মহিলানিগ্রহের প্রতীক হিসেবে সংবেদনশীল বাঙালীরা একদিন হয়তো মোচা খাওয়াই ছেড়ে দেবে—পৃথিবীর ক'টা দেশেই বা ওই জিনিস খায়?

মলিনা রোবিনসন সর্বকর্মনিপুণা হয়েও স্বল্পভাষিণী। কিন্তু স্নেহের প্রস্রবণ একটি। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে একবার জাপানী গাড়ি অচল হলো। নির্জন অরণ্যে এমন অবস্থায় পড়ে খুব লজ্জা লাগলো, কারণ যান্ত্রিক কোনো ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার সামান্য শক্তিও আমার নেই। সারাজীবন অপরেই আমার সারথিকর্ম করেছে—টিপিক্যাল বাঙালীবাবুর মতন আজন্ম অপদার্থই রয়ে গেলাম। গাড়ি চালানো পর্যন্ত শেখা হলো না।

কিন্তু আমার সহযাত্রিণীটি একাই কলকাতা থেকে বেরিয়ে কেমন দশভূজা হয়ে উঠেছেন এই বিদেশে। অবলীলাক্রমে তিনি যন্ত্রযানের ব্যাধি নির্ণয় করলেন। রোগের নিবৃত্তিও হলো পঁচিশ মিনিটের সাধ্যসাধনায়। ততক্ষণে চল্লিশোর্ধ্বা এই অভিভাবিকার লাল প্যান্ট তেলে-কালিতে চকরা-বকরা হয়ে উঠেছে। আমার খুবই লজ্জা হতে লাগলো, কিন্তু তাঁর কোনো খেয়াল নেই। আমাকে আরও ড্রাইভ করে সমুদ্রতীরে একটি প্রায়-নির্জন ইতালীয় গ্রোটোতে নিয়ে গেলেন

মৎস্য-মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে।

সঙ্গিনীর জামা-কাপড়ে তেলকালির দাগ, একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু দেখলাম কর্মযোগের এই দেশে ওসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমার সাময়িক অভিভাবিকা এরই মধ্যে স্বামীকে একবার ফোন করে খবর নিলেন খাওয়া হয়েছে কিনা। নিপুণা বলতে যা বোঝায়! স্বামীকে বললেন, "প্লিজ ওষুধটা সময়মতো খেতে যেন ভুলো না।"

তা হলে! মার্কিনী পুরুষরাও ওষুধ খেতে ভুলে যায়! অথচ স্বাবলম্বী বলে তাদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

অধ্যাপকসায়েব বাড়ি ফেরার পরে আমাকে সস্নেহে বলেছিলেন, "আমি এরকম ছিলাম না। এই ভারতীয় রমণীরত্নই পরনির্ভরতার ভাইরাস আমার দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি শংকর, কয়েক সহস্র বঙ্গ রমণী উপহার দাও আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে, আমরা যাতে আমাদের কমনীয়তা, নমনীয়তা ফিরে পাই! আমরা তোমাদের নানা বৈজ্ঞানিক উপহার দিয়েছি। আমরা না-হলে তোমরা কমপিউটরের খবরও পেতে না, পরিবর্তে আমরাও তো কিছু পাবার যোগ্য!"

মিসেস রোবিনসন কিছুই বলেননি, ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছেন। মিসেস মলিনা রোবিনসনের মেয়েরা যে এমন হবে না তা আমি ইতিমধ্যেই আন্দাজ করতে পারি। অ্যানিটা দেশে ফেরামাত্র নিজের কর্মক্ষেত্রে চলে গিয়েছে।

মিসেস রোবিনসন একসময় চাপা দুঃখ করলেন, "থাকবে না কাছে। বড় হলে, পাখা শক্ত হলে, পাখি থাকে না এ-দেশে। উড়ে চলে যায় নিজের ইচ্ছেমতো।" এটা ভাল কি মন্দ কোনো মন্তব্যই করলেন না তিনি।

রাত্রেও ছাড়লেন না অধ্যাপক রোবিনসন। এক ঘণ্টার মধ্যে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করে ফেললেন নিপুণা মলিনা রোবিনসন।

অধ্যাপক বললেন, "আমরা খাওয়ার সময় খাঁটি বাঙালী। সগর্বে ভগবানের দেওয়া ডান হাত ব্যবহার করি—এটা শিখেছি আমার ডিয়ার-ওল্ড স্ত্রীর কাছে। সাত সপ্তাহের শিক্ষা নিতে হয়েছিল ওঁর কাছ থেকে শুধু শিখতে কী করে একটা হাতের কয়েকটা আঙুলে মাছের কাঁটা বাছতে হয়। ইংরিজি আমেরিকান প্রতিশব্দ হলো 'বোন ম্যানেজমেন্ট'—মলিনা যদি বই লিখতো ওই বিষয়ে তাহলে বেস্ট-সেলার হয়ে যাবার সবরকম সম্ভাবনা ছিল।"

রোবিনসন সায়েব খাওয়ার টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা গল্প করলেন। রসিকতা করলেন, "ভারতীয় মহিলাদের 'প্রজ্ঞা' সারা দুনিয়ায় তুলনাহীন। কিন্তু কী করে আদর্শ স্বামীর প্রতীক হিসেবে সুন্দরী মহিলারা লর্ড শিভাকে নির্বাচন করলেন তা এখনও বুঝি না। শিভা ইজ ওভার-ওয়েট, তাঁর পেট মোটা, তাঁর স্থিতিশীল কাজকর্ম নেই, দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলেও সমাজে তেমন তাঁর সুনাম নেই। তাছাড়া তিনি গাঁজা সিদ্ধি ইত্যাদি নেশায় আসক্ত। আদর্শ স্বামীর এই মডেল পাল্টাবার সময় এসেছে, তোমরা বইতে লেখো। আমার মনে হয়, প্রাচ্যের রমণীয়তার সঙ্গে প্রতীচ্যের পৌরুষের সমন্বয় সাধনার সময় এসেছে—যখন তা সম্ভব হবে তখন আমরা সুন্দর এক সভ্যতার সূর্যোদয় দেখবো।"

রাত্রে রোবিনসন সায়েব আমাকে ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মলিনা রাজী হলেন না। ফিসফিস করে বললেন, "একটু ভুলোমানুষ, চোখেও ইদানিং কম দেখছেন। আমি গাড়ি চালাই, তোমরা গাড়ির পিছনে বসে কথা বলো।"

রোবিনসন বললেন, "এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের প্রতি ইঙ্গিত। তোমরা বাঙালী পুরুষরা এবার থেকে তোমাদের চালাবার দায়িত্বটা মেয়েদের ওপর ছেড়ে দাও।" মলিনা শুনে গেলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মলিনা আমাকে বললেন, "আমার হাতে

যথেষ্ট সময় আছে। যখন প্রয়োজন তখনই খবর দেবেন, আপনাকে তুলে নেবো। যেখানে খুশি সেখানে আমার সঙ্গে ঘুরে আসবেন।"

খুব ভাল লাগলো এই দম্পতিকে। পরস্পরবিরোধী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যেন ওঁদের ড্রইংরুমে মুখোমুখি হয়েছে, তারপর আচমকা যুক্ত-বেণীতে প্রবাহিত হয়েছে অন্দরমহলে।

আমি কথা বলেছি টুপটুপের সঙ্গে। এই দম্পতি সম্বন্ধে তারও খুব ভালবাসা। দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওঁদের একটা দোষ দেখাও অন্তত।

বেচারা টুপটুপ বললো, "ডেভিড প্রাচ্যের সব কিছু মেনে নিয়েছেন অত্যন্ত সহজভাবে ; কিন্তু প্রত্যেকবার বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যদি প্রকাশ্যে মলিনাদিকে চুম্বন না করতেন তা হলে যেন আরও ভাল হতো।"

দৃশ্যটা আমিও দেখেছি। মলিনা কলকাতায় বসবাসকালে প্রকাশ্যে তাঁর স্বামীর চুম্বন গ্রহণ করছেন দৃশ্যটা কেমন হতো আন্দাজ করছি। আরও অনেক কিছু দেখেছি। সাক্ষাতে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি শংকরদা।"

শংকরদা, সমস্ত দেশ টো টো করে ঘুরে অবশেষে আমার কাছে এলেন।

আপনার পাঠানো চিঠিটা খুব উপভোগ করেছি। কিন্তু ওই শেষ বিষয়ে একমত হতে পারিনি। আমি যখন দেখি, অন্য সবার সামনে মলিনা রোবিনসন স্বামীকে ডাকছেন, আদর করছেন, বিদায়কালে চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন, তখন আমি খুব উৎসাহিত বোধ করি। আমার ইচ্ছে হয় সমস্ত বাংলার পুরুষগুলোকে দেখাই মানুষকে কীভাবে ভালবাসতে হয়, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়।

"আপনার মনে হয় না, মুক্তির স্বাদ পেয়েছে মলিনা এই স্বাধীন দেশের মাটিতে?" আমি এবার প্রশ্ন করলাম লেখককে।

ওঁর নীরবতা লক্ষ্য করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি, "আপনি সবটা কী জানেন, এই রোবিনসন সম্বন্ধে?"

শংকরদা এবার খোলা মনেই বললেন, "যা দেখেছি, তার বেশি জানা তো হয়নি তবে এই রকম স্বামী-স্ত্রী দেখলে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে তাদের প্রেমটা কোথায় কীভাবে হলো? মলিনা তো সুন্দরী নন। রঙ চাপা, ছোট্টখাট্ট গড়ন, তবে চোখ দুটি গভীর। দেহ সম্পদ দানে একটু কার্পণ্য করলেও ঈশ্বর হয়তো মানসিক সম্পদ দিয়েছিলেন। মহিলা নিশ্চয় পড়াশোনায় ভাল ছিলেন, বিদেশে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এমন মানসিক উজ্জ্বলতা দেখিয়েছেন যা সায়েবকে কাছে টেনেছিল।"

আমি হাসি চেপে রেখে লেখকের কথা শুনে যাচ্ছি। এবার বললাম, "আপনি যে বুদ্ধি করে ওঁদের অ্যালবাম থেকে কিছু ছবি চেয়ে নিয়েছেন এটা ভাল কথা। ছবিতে আপনি দেখছেন মলিনা পর্বত আরোহণার বেশে চোখে গগলস লাগিয়ে সুইস ট্রেকিং-এ ব্যস্ত। আপনি দেখছেন মলিনা বরফের মধ্যে স্কি করছেন। আপনি দেখছেন, হনলুলুর সমুদ্র সৈকতে সায়েব ও মলিনাদি সামান্য বস্ত্রে সূর্যস্নান করছেন। আপনি দেখছেন, বড়োদিনের উৎসবে অসংখ্য উপহারের ডালি সামনে সাজিয়ে মলিনাদি দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে। আপনি দেখছেন, নয়নাভিরাম লেকের ধারে রঙিন ছাতা টাঙিয়ে মলিনাদি তাঁর বিদেশী স্বামীর সঙ্গে চড়ুইভাতির খাবার সাজাচ্ছেন। আপনি দেখছেন, অধ্যাপক সায়েব জামাইবাবু-স্টাইলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে লাল প্যাণ্ট ও শার্ট-পরা মলিনাদির পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন—আমেরিকা ও ভারতের ভূমিকা বদল হয়ে গিয়েছে। শুধু ঠাকুরঘরের ছবি দেখছি না। শুনে রাখুন, মলিনা রোবিনসন এখনও প্রতিদিন ঠাকুর পুজো করেন। মলিনাদির বাড়িতে প্রতিদিন একবার শাঁখের আওয়াজ হয়—রোবিনসন সায়েব এগুলো খুব পছন্দ করেন।"

এই মলিনা দেবী তো তেমন সুন্দরী নয়। শারীরিক সম্পদের বিশাল ঐশ্বর্যও কোনোদিন তেমন ছিল বলে তো মনে হয় না।

"বাঃ, চমৎকার বর্ণনা দিচ্ছো তুমি", শংকরদা উৎসাহ দিলেন।

আমি এবার সোজাসুজি জানতে চাইলাম, "কিন্তু শংকরদা, চমৎকার এই রোবিনসন দম্পতির সাজানো সংসারের আদিতে যাবার চেষ্টা করে আজকের এই আসরটাকে তেতো করবেন কী?"

গল্পের গন্ধ পেলে লেখকরা আর স্থির থাকতে পারেন না। কিন্তু শুধু মিষ্টি গল্পের খোঁজ করতেই লেখকরা সাগরপারে পাড়ি দেন না, শংকরদা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন।

শংকরদা উৎসাহ না দেখালেও কোনো এক সময়ে মলিনা রোবিনসনের আদি ব্যাপারটা তাঁকে জানিয়ে দিতাম। বাঙালী পুরুষমানুষরা এখনও স্বদেশে কী ভূমিকা পালন করছেন তা চাপা থাকবে কেন?

তাছাড়া শংকরদা, এই মহামানবতীর্থে মুক্তির স্বাদ নারীকে কত পরিবর্তিত করে তা আপনাকে জানতেই হবে। মন্দির বানিয়ে, প্যাণ্ডেল সাজিয়ে, ভোরবেলায় বেতারে মহিষাসুরমর্দিনীর জয়ধ্বনি তুলে, সভাসমিতি করে বাঙালী পুরুষ সারাক্ষণই হামবড়াই করছে—নারীই সমস্ত শক্তির আধার। জগজ্জননী রূপেই তিনি নাকি দিকে-দিকে পূজিতা। কিন্তু আসলে নারীকে কী অবস্থায় রাখা হচ্ছে তা আপনি হাওড়া-কলকাতা-কেষ্টনগর-বর্ধমান-শিলিগুড়ি অথবা ঢাকা-খুলনা-পাবনা-চট্টগ্রামের যে-কোনো গলি ধরে যে-কোনো বাড়িতে কড়া নেড়ে ভিতরে খোঁজখবর করলেই জানতে পারবেন। যেদেশে আপনি এসেছেন সেখানে ওই সব ওং ভোং করে ঘণ্টা নাড়ানাড়ি বা পূজার আয়োজন নেই। কিন্তু নারীর নিত্যপূজা চলেছে এ-দেশের ঘরে-ঘরে। নারী যেখানে কুপিতা সেখানে পুরুষের টিকে থাকার যে কোনো সম্ভাবনাই নেই তা এদেশে কারও অজানা নয়।

আপনি এই মলিনাকে নিয়েই নতুন একখানা আরব্য রজনী লিখতে পারেন, শংকরদা। আবদাল্লা-মর্জিনার ওই থিয়েটারি গানটা মনে

আছে আপনার? আয় বাঁদী তুই বেগম হবি খোয়াব দেখেছি!

আপনার পাড়ার মোক্ষদা, মেনকা, গিরিবালা—যারা সেই সকাল থেকে বাসন মেজে, বাটনা বেটে, উনুন সাফ করে, কয়লা ভেঙে, ঘর ধুয়ে চরম দুঃখের জীবন নির্বাহ করে—যারা ছেঁড়া শাড়ি অথবা থান পরে—তারা যদি আপনাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এখানে চলে এসে গাড়ি ড্রাইভ করে, সাঁতার শেখে, আইস-স্কেটিং করে, এককথায় মলিনা রোবিনসন হয়ে যায় তা হলে কেমন লাগবে আপনাদের বঙ্গীয় সমাজের? সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থা তো রাতারাতি ভেঙে পড়বে যদি ঝি মোক্ষদা রাত সাড়ে-চারটায় বিছানা ছেড়ে বস্তির বারোয়ারি কলঘরে লাইন না মারে!

যুগযুগান্তের পবিত্র পারিবারিক বন্ধন ইত্যাদি নিয়ে আপনারা গত দেড়শ বছর ধরে যেসব অনবদ্য গদ্যপদ্য রচনা করছেন তা মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যাবে যদি রাতের এঁটোবাসন সকাল সাড়ে-আটটাতেও শুকনো কড়কড়ে হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে।

ওই যে ওলাবিবিতলা লেনের মিনতি-অপরেশ বাগচীর সংসার, মিনতির অত অসুস্থতা সত্ত্বেও যে একেবারে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়নি, তার কারণও তো ওই এক মোক্ষদা। অভিনেত্রীর নাম পরিবর্তন হয় কয়েক বছর অন্তর—কিন্তু ভূমিকা একই থেকে যায়—অর্থাৎ প্রতি সংসারে এক মোক্ষদা যায় আর এক মোক্ষদা আসে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর হৃদয়হীন ব্যবহারে অথবা আচরণের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না।

শংকরদা, এবার আপনার বাঙালী পাঠকদের মলিনার অতীত দর্শনের জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে বলুন।

দুটি অসহায় নাবালক সন্তানের মা হয়ে আপনাদের ওই হাওড়াতেই মলিনা ছিল স্বামী পরিত্যক্তা। থাকতো এক বস্তিতে, বিধবা মায়ের সঙ্গে। বাংলাদেশে এটা অবশ্য এমন কিছু অভিনব খবর নয়। কত মেয়েই তো বিয়ের পরে সর্বস্বান্ত হয়ে, একটা দুটো সন্তান কোলে করে

অসহায়ভাবে বস্তিবাড়িতে বাপের, ভায়ের অথবা বিধবা মায়ের আশ্রয়ে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারে দেশের কারও কোনো মাথাব্যথা নেই সমাজও মাথা ঘামায় না, কারণ এইসব অঘটন না-ঘটলে পরিচারিকা মোক্ষদাদের পাওয়া যাবে কোথায় ? কে পরের বাড়ির বাসন মাজবে ?

ছুটি সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে শুধু বাসন মেজে চলে না ঠিকে-ঝি থেকে মলিনা তাই আরও একধাপ উঁচুতে উঠতে চেয়েছিল বাড়িতে সারাক্ষণ কাজকর্মের জন্য সবাই নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা চান— এমন মহিলা যার গতর থাকবে কিন্তু কাজ থেকে অন্যমনস্ক হবার মতন কোনো পিছু-টান থাকবে না। কিছুদিন এক প্রাইভেট নার্সিং হোমে আয়ার কাজ শিখে মলিনা পাড়ি দিয়েছিল দিল্লিতে প্রায় অজানা এক বাঙালী পরিবারে সারাক্ষণ কাজকমের জন্য। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজকম করতেন, আর তাঁদের শিশুটি থাকতো এই মলিনার কাছে সেই সঙ্গে ছিল রান্নাবান্নার দায়িত্ব মলিনার ছেলেমেয়ে পড়ে রইলো মায়ের কাছে আপনাদের ওই হাওড়ার বস্তিতে।

তারপর একদিন ফুলব্রাইট অধ্যাপক ডেভিড রোবিনসন এলেন দিল্লিতে বন্ধুর বাড়িতে। মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারে সপ্তাহ-অন্তের আতিথেয়তা-অভিজ্ঞতা চাইছিলেন তিনি তাপস ও সুনন্দা ব্যানার্জি সানন্দে এঁকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, খাওয়ানো-দাওয়ানোর কোনো চিন্তা তো নেই, মলিনা আছে।

ব্যানার্জিদের ফ্ল্যাটেই রোবিনসন সায়েব মলিনাকে প্রথম দেখলেন, তার নিঃশব্দ সংসার-নৈপুণ্যের নানা পরিচয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। সেবারে যে-ক'সপ্তাহ অধ্যাপক রোবিনসন ভারতবর্ষে ছিলেন তখন মাঝে-মাঝে তাপস ও সুনন্দা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হতো।

মার্কিন অধ্যাপকের দেশে ফিরে যাবার সময় প্রায় আগত রোবিনসন ইতিমধ্যে মলিনার অতীত ইতিহাস জেনে ফেলেছেন। ছুটি সন্তানকে মানুষের মতন মানুষ করে তুলতে সে কতটা আগ্রহিণী তাও বুঝে ফেলেছেন। ব্যানার্জি পরিবারের গৃহকর্ত্রী ছিলেন উদার

মনোভাবের। সুনন্দা একদিন তাঁর দেশ থেকে আসা ঝি-কে বললেন, "সায়েব চমৎকার প্রস্তাব দিচ্ছেন। একটি বালককে নিয়ে মৃতদার সায়েব বেশ বিপন্ন। ছেলেটি এতোদিন ঠাকুমার কাছে থাকতো—কিন্তু ঠাকুমা বেশ অসুস্থ। অপরের ছেলের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।"

হাওড়া বস্তির একজন আয়ার পক্ষে এ এক আশ্চর্য সুযোগ। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "যাও না, দেশটা একবার ঘুরে এসো। কিছু বাড়তি রোজগার করে নাও। পছন্দ না-হলে এক বছর পরে নিজেই ফিরে আসবে। এই এক বছরে যে টাকা তোমার হাতে আসবে তা এখানে রোজগার করতে অন্তত দশ বছর লাগবে।" মিসেস ব্যানার্জি হিসেব করে বুঝিয়ে দিলেন, খাওয়া থাকা ছাড়াও মাসে তিন-চার হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

মলিনা ইংরিজি না-জানার কথা তুললো। রোবিনসন সায়েব বললেন, "সে আমার দায়িত্ব। এক বিন্দু ইংরিজি না-জেনেও এখনও কয়েক লাখ মানুষ মার্কিন দেশে বসবাস করছে। মলিনার যা বুদ্ধি তাতে কাজ চালানোর মতন ইংরিজি শিখতে দু'মাসও সময় লাগবে না।"

পুরুষ সমাজে অনেকদিন নিষ্পিষ্ট হলেও বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়েরা কখনও-কখনও সুযোগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মলিনা সাহস করে পাড়ি দিলো সাতসাগরের পারে।

বিদেশে রোবিনসন সায়েব ক'মাস পরেই মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন মলিনার।

মলিনা লিখেছে—তার আলাদা এয়ারকণ্ডিশন ঘর যা শীতে গরম এবং গরমে ঠাণ্ডা।

মলিনা নিজের দেশে সাদা খোলের মাঝারি পাড়ের শাড়ি পরতো। গৃহবধূরা ঐ রকমই পছন্দ করেন, স্বামী পরিত্যক্তা পরিচারিকার পরিচয় বিধবার মতন হলেই যেন তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ওখানে মলিনা বাধ্য হয়ে বিদেশী জামাকাপড়ও পরছে।

মলিনা লিখেছে, সপ্তাহে তার একদিন পুরো ছুটি। শনিবারে বাড়িতে এসে অধ্যাপক নিজেই সংসারের সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছুটি দিয়ে দেন মলিনাকে নিজের ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াতে। সবচেয়ে যা আশ্চর্য, ছুটির দিনে সায়েব নিজেই রান্না করে মলিনাকে খাওয়ান। খুব লজ্জা লাগে মলিনার। কিন্তু সায়েব কিছুতেই শুনতে চান না।

মলিনা অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইংরিজিতে পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে—সায়েবের জন্য ততটা নয় যতটা মাতৃহারা বালকটির প্রভাবে। তবে মলিনাও তার ছাপ রেখেছে—বালকটি বহু বাংলা কথা শিখেছে—মাঝে-মাঝে সে বাংলা রান্নাও খায়, বিশেষ করে শাকের চচ্চড়ি, রোবিনসন পরিবারে যার নামকরণ হয়েছে গার্ডেন কারি।

আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে। অধ্যাপক রোবিনসন একান্তে তাঁর এক ইণ্ডিয়ান বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। হাওড়ার যে-মানুষটি মলিনা নাম্নী বালিকাকে হেলায় ত্যাগ করে আর এক রমণীর সঙ্গে অন্যত্র বসবাস করছে তার খোঁজখবর নিয়েছেন। এই অবস্থায় একদিন সন্দেহ হয়েছে মলিনার মনে—সায়েব যেন কিছু বলবার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছেন। মলিনা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে—বিদেশে সে এসেছে কিছু টাকা রোজগার করতে, আর কোনো চিন্তা তার মাথায় নেই। বিয়ে, যেটা কপালে ছিল, সেটা তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে।

ভয় পেয়ে মলিনা ছুটলো ক্যাম্পাসের এক ভারতীয় মহিলার কাছে। সে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে।

সব শুনে মিসেস শর্মা বললেন, "বোকামি কোরো না, মলিনা। সায়েব যদি তোমাকে বিয়ে করতে চান, বাধা কোথায়? তোমার মনের অবস্থা বুঝে সোজাসুজি তোমাকে কিছু বলেননি নিজে এখনও পর্যন্ত। সায়েব কিন্তু তোমার সেবায় মুগ্ধ। তুমি তাঁর সন্তানটিকে আপন করে নিয়েছো। সায়েব বলেন, এমন নীরব স্নেহ একমাত্র প্রাচ্যের মেয়েরাই দিতে পারে। কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধে থাকলে সায়েব তোমাকে একটুও জ্বালাতন করতে চান না। ইচ্ছে না থাকলে, ভয়

পেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই—সায়েবের সংসারে পুরনো ব্যবস্থাই চলবে।"

প্রথমে মলিনা খুব কান্নাকাটি করেছিল। তারপর ভাবলো, কেন নেবে না সুযোগ ?

অসুবিধে অনেক। কিন্তু রোবিনসন সায়েব সেসব পেরিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। লম্বা ছুটির সময় কলকাতায় গেলেন। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় থাকলেন।

খুঁজে বের করা হলো ওই স্বামীকে। সে তখন রিকশ চালায়। মামলা শুরু হলো বিবাহবিচ্ছেদের। একটু সময় লাগলো। কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলো।

এক নম্বর স্বামীদেবতাটি তেমন কোনো বাগড়া দেযনি, তবে সুযোগ বুঝে সামান্য কিছু পয়সা চেয়েছিল।

মলিনা কেন বিবাহ ছিন্ন করছে তা তার মা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। বস্তির মেয়ে স্রেফ সিঁদুর মুছে ফেললেই তো কাজ চুকে যায়—তার জন্যে আবার কোর্টঘর করে পয়সা নষ্ট কেন ?

দায়মুক্ত হয়ে মলিনা ফিরে এসেছে এই মার্কিন ক্যাম্পাসে। তার নামের সঙ্গে এতোদিন যে একটা 'হাজরা' শব্দ ছিল তা আগেও কেউ লক্ষ্য করেনি। তারপর একদিন সসম্মানে মলিনা হাজরা হলো মলিনা রোবিনসন।

মলিনা অবশেষে তার ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছে। পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। সে নিজেই তখন রসিকতা করেছে, "বিয়েতে ক্ষতিই হলো। আমার মাস-মাইনের চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে গেলো।"

রোবিনসন সায়েব আস্তে-আস্তে সবাইকে আরও অবাক করলেন। হাওড়া বস্তির যে-দুটি বালক-বালিকা অনাদরে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, কোনো বাড়িতে যথাসময়ে ঝি-চাকর অথবা রিকশওয়ালা হবার জন্যে যারা প্রস্তুত হচ্ছিল তারাই সগর্বে হাজির হলো নতুন দেশ আমেরিকায়। পুত্র অনাদি হলো 'অ্যানডি', আর কন্যা অনীতা হলো

'অ্যানিটা'। আমরা ওই অ্যানিটাকেই তো এরোপ্লেনে দেখলাম। অনেক বছর পরে সে ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিল একজন অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট হিসেবে। ওদের পকেটে এখন মার্কিনী পাসপোর্ট—ওদের ইণ্ডিয়ান নামের গায়ে রোবিনসনের নাম। রোবিনসন এদের দত্তক গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত স্নেহভরে।

রোবিনসন বলেন, "প্রত্যেক পরিবারেই বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ের একসঙ্গে মানুষ হওয়া উচিত। এতে লাভ অনেক।"

রোবিনসন সায়েবের আপন ছেলেটি তো মলিনাকে মা বলতে অজ্ঞান! সে যতই ইণ্ডিয়ান হয়ে যাচ্ছে, হাওড়া থেকে আসা ছেলে-মেয়ে ততই যেন আমেরিকান হচ্ছে।

অনেকদিন আগে রিকশওয়ালা স্বামীর সঙ্গে ডাইভোর্সের ব্যাপারটা ঘটেছে! অপ্রত্যাশিত মুক্তির স্বাদ মলিনা রোবিনসনের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেও বিষণ্ণতা দিয়েছে। রোবিনসন সায়েব এবং ছেলেমেয়ে—এরা ইণ্ডিয়া গিয়েছে—মলিনা কিন্তু যায়নি। মলিনা যায় না এ-জন্যে যে তার ভয় ওখানে কালে বদনাম হবে।

ভগবানের ঠিক-করা বিয়ে ভেঙে ফেলাটা যে ঠিক হয়নি এই কথাই উঠবে কলকাতার বস্তিতে। প্রতিদিন সকালে হাজা হাতে বাসন মাজার অভিজ্ঞতা থেকে মলিনা কেমন করে নতুন জায়গায় পৌঁছেছে তা কেউ ভেবে দেখবে না। ভাববে, সায়েবকে শরীর বেচে এবং তালেগোলে বেঁধে ফেলেই মলিনা নিজের হিল্লে করে নিয়েছে।

"অ্যানিটার সঙ্গে প্লেনে আমাদের ভাবের আদান-প্রদানের কথা মনে পড়ছে, শংকরদা? যদি তার মায়ের জীবনে নাটকীয় কিছু না ঘটতো তা হলে সে কি এমনভাবে কথা বলতে পারতো? অথচ আপনি হিসেব করে দেখুন, বাংলার প্রত্যেক পাড়ার প্রত্যেক মেয়ের বুকের মধ্যে অ্যানিটার মতই ইচ্ছে লুকিয়ে আছে, কিন্তু সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না।"

শংকরদা জানতে চাইছেন, "মলিনা রোবিনসনের দুঃখ কিছু নেই?"

বুঝছি, বাঙালীদের হিসেব অনুযায়ী মলিনা হাজরার জীবনটা বড্ড বেশি সাফল্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে। বোম্বাই সিনেমা ছাড়া অন্য কেউ দেখাতে সাহস পাবে না যে পাড়ার পদ্মা ঝি বড়লোক সায়েবের নজরে পড়ে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়েছে। সারাক্ষণ বাসন না মেজে সে এখন নিজের ড্যাটস্যুন গাড়ি চালায়। এতোটা সৌভাগ্য বাঙালী মহিলা পাঠকদেরও হয়তো ভাল লাগবে না। তাঁরা ওই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থেকেও মাঝে-মাঝে চোখের জলে আঁচল ভেজাতে চান। আমার তো সন্দেহ হয়, আসল দুঃখটা ওঁদের নিজেদেরই। শুধু প্রকাশ্যে কাঁদার জন্যে বাড়তি একটা ছুতো চায় বাঙালী পাঠিকারা। যেখানে যত ভয় যত যন্ত্রণা সব তো আমাদের দেশের মেয়েদেরই। বেইজ্জতী হবার ভয়, কুৎসিত মন্তব্য শোনার ভয়, দুষ্টদের হাতে পাচার হয়ে যাবার ভয়, কনে দেখায় পছন্দ না হয়ে যাবার ভয়, পণের ব্যাপারে পিঁড়ে থেকে বর উঠে যাবার ভয়, শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীতা অথবা জীবন্ত দগ্ধ হবার ভয়, স্বামীর অবজ্ঞা-অবহেলার পাত্রী হবার ভয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তানকে পৃথিবীতে আনার সময় প্রাণহানির ভয়। আর আছে বদনামের ভয়। পাড়ার সন্দেহপ্রবণ মোড়লরা তো মনের আনন্দে ছড়া বেঁধেই বসে আছেন—

"পুড়লো নারী উড়লো ছাই
তবে নারীর গুণ গাই।"

তা বাছাধন, কে তোমার মুখে নারীর গুণগান শুনতে চাইছে? মেয়েদের তোমরা একটু ছেড়ে দাও, তাদের নিজের মতন থাকতে দাও। তারা তো ওই ওলাবিবিতলা লেনের মিনতির মতন স্বপ্ন দেখছে না কবে শরীরের সব জ্বালা জুড়িয়ে আলতা পরে, সিঁদুর ছড়িয়ে, পায়ের গোড়ায় মোচা নিয়ে সেই অনন্তলোকের সন্ধানে বেরুবে যেখানে কোনো বদনামের ভয় নেই।

ওহো, আমার দোষ হয়ে গিয়েছে, নিজের খেয়ালে মেয়েদের দুঃখের ফিরিস্তি গেয়ে চলেছি। অথচ শংকরদা, আপনি নিশ্চয় এখনও মলিনা রোবিনসনের কোনো একটা ব্যর্থতার খোঁজ-খবর করছেন। যখন

চাইছেন আপনি তখন নোটবইতে লিখে নিন।

আপনি অ্যানিটাকে দেখলেন? অনাদি, মলিনা হাজরার যে-ছেলেটি হাওড়া থেকে এখানে এসে অ্যানডি হয়েছিল, তাকে দেখলেন কী? দেখেননি!

সেবার রোবিনসন সায়েবের নিজের ছেলে রোনি ভারতবর্ষে গিয়েছিল। বোকামি করে সে হাওড়ার বস্তিতে গিয়ে মলিনার প্রাক্তন স্বামীর ছবি তুলেছিল। এখানে ভিডিওতে রোবিনসন পরিবার দেখলো, রোগা লিকলিকে মথুরা হাজরা খালিগায়ে চেকলুঙি পরে সাইকেল-রিকশ চালাচ্ছে! ভিডিওতে এই শট দেবার জন্যে মথুরা অবশ্য রোনির কাছে কুড়ি টাকা আদায় করেছিল।

তারপর আমেরিকার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে সেই ছবি দেখে অ্যানডি অথবা অনাদির কি কান্না। সে আমাকে এসে বলে, "কাকু তুমি প্রফেসরকে বলো মথুরাকে এ-দেশে আনিয়ে নিতে। রিকশ টানতে খুব কষ্ট হয়। এখানে কোকাকোলার খালি টিন রাস্তা থেকে কুড়োলেও অনেক বেশী রোজগার করবে।"

আমি অ্যানডিকে বলেছি, "তুমি ব্যাপারটা বোঝো। এইভাবে সবার দুঃখ দূর করে এখানে আনতে হলে ইণ্ডিয়াতে কয়েক শ' টাটা-বিড়লা-সিংঘানিয়া ছাড়া কোনো লোকই থাকবে না। এ-দেশটাও গরীব হয়ে যাবে অসংখ্য অভাগা ভারতীয় মানুষের চাপে।"

অ্যানডি তবুও বোঝে না। তার ধারণা, প্রফেসর রোবিনসন ইচ্ছে করলেই ওর বাবাকে এদেশে আনিয়ে নিতে পারেন। অ্যানডি বোঝে না, স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামীকে আত্মীয় বলে স্পনসর করার স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই।

অ্যানডি তার পরে বেশ কিছুদিন মানসিক বিষণ্ণতায় ভুগেছিল। রোবিনসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এখন অন্য স্টেটে একলা বসবাস করে। আজকাল মাঝে-মাঝে সে আমাকে লং ডিসটান্স ফোন করে।

আমি বলে দিয়েছি, "যত খুশি কালেক্ট কলকোরো আমাকে—আমি

দাম দিয়ে দেবো।" হাজার হোক ওই পরিবার আমার অশেষ উপকার করেছে, আমি চাই ওদের ভাল হোক। অ্যানডির এই প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু বোঝা গেলো না—রক্তের টান বড় আশ্চর্য জিনিস, শংকরদা।

শংকরদার মন্তব্য: "এই এখানকার মুশকিল, সুশোভন। যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সবাই অ্যানডির মতন বেরিয়ে গিয়ে একলা থাকতে চাইছে। সামাজিক বন্ধন যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।"

আমি শংকরদার মুখের দিকে তাকালাম। "আপনি তো টুপটুপের সঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবেন আগামীকাল সকাল থেকে। টুপটুপ তো ওই বিষয়ের গবেষণায় ডুবে আছে। রোবিনসন সায়েবের অধীনেই থিসিস করছে। টুপটুপ অন্য কী একটা বিষয় ঠিক করেছিল। আমি বলেছিলাম, আজেবাজে বিষয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। যখন তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার সময় হবে তখন ইণ্ডিয়াতেও ওই হাওয়া লাগবে—সামাজিক মানুষ বাধ্য হয়েই একলা থাকবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তখন তোমার এখানকার অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যাবে।"

এখন মনের মধ্যে কোনো গর্ব রাখবেন না, শংকরদা। পণ্ডিতরা বলেন, সামাজিক কোনো আচরণকে ভাল-মন্দ বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুদ্ধিমানেরা শুধু আচরণটা কেমন তা লক্ষ্য করে যান। এই ধরুন ইণ্ডিয়াতে পুরুষ ও নারীর বিবাহ সম্পর্কটা—এটা ফেভিকল আঠার মতো দু'জনকে জুড়ে দেয় না, কেবল চিটেগুড়ের মতন চটচট করে রাখে। কাছে এলেও পুরো জোড়া লাগে না, অথচ দূরে সরে গেলেও চিট-চিটে ভাবটা যায় না।

পশ্চিমের সমাজ সে-তুলনায় অনেক আদর্শবাদী বলতে পারেন, শংকরদা। যে-চিনেমাটির বাসন ভেঙে গিয়েছে তাকে কায়দা করে সাজিয়ে রেখে অন্যকে দূর থেকে ঠকানো হয় না।

একবার···আপনাকে একটা ঘটনা বলি। ওই মিনতি ও অপরেশ বাগচীর জীবন নিয়ে আপনার উপন্যাসটা আমি যতটা পারছি নিজেই

সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করছি, শংকরদা। ধরুন, মিনতি ও অপরেশের মধ্যে তখন সম্পর্ক বলতে প্রায় কিছু নেই। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মিনতি চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকে। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন "আমি যখন ছিলাম না, তখন তোর বাবা রাত্রে বাড়ি ফিরতো?" বাবা অনেক সময় ফিরতেন না, কিন্তু ছেলে কী বলবে? সে চুপ করে বসে থাকে।

একদিন বাবা অনেক রাতে মদে টৈ-টম্বুর হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তারপর সে কি কাণ্ড। ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে দিলেন। বউকে বললেন, "তুমিই আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছো।"

ছেলে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাবা-মায়ের এই যুদ্ধে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো।

হঠাৎ ছেলে শুনলো, মা কাঁদতে-কাঁদতে তাকে ঠেলে তুলছেন। "খোকা, তুই ওঠ। খুব দরকার তোকে।"

রাতদুপুরে আধ-জাগা অবস্থায় উঠে ছেলে বুঝলো, অসুস্থ মা এবং মত্ত বাবার ঝগড়া বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। দুজনেই এখন ছেলেকে সালিশী মানতে চাইছেন।

মা বলছেন, "তোর বাবার এতো বড়ো আস্পর্ধা, আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে হাল্কা থাকতে চায়। আমার বংশে কেউ তো পাগল ছিল না। ওই তো আমাকে পাগল করেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কখন বাড়ি ফিরেছে ঠিক নেই, আমি শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছি। তখন কাকে বলেছি, ও মদ খায়? শুধু মদ খেলেও আমি এমন হতাম না। ও আরও যা করে বেড়ায় তা নিজের ছেলের সামনে বলা যায় না। বাদল, তুই বল, ও আমার এই অবস্থা করেছে কিনা?"

তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিনতি বাগচী চিৎকার করেছেন, "আমি তো বলছি, তোমার ছেলে যা বিচার করবে তা মেনে নেবো। ও বলুক কে কার সর্বনাশ করেছে।"

আচমকা আক্রান্ত হয়ে পিতৃদেবও তখন তড়পাচ্ছেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করে বলছেন, "ও বলুক, এ-বাড়িতে যে-ব্যাটাছেলে সংসার করবে তার মাথার ঠিক কি করে থাকবে!"

ছেলের সে কি অসহায় অবস্থা! মিনতি—অপরেশ জানেন না, পৃথিবীর কোনো সমাজেই মা-বাবার দাম্পত্য কলহে ছেলে-মেয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে না মা-বাবার মধ্যে সালিশী করার মতো নিষ্ঠুর দায়িত্ব কোনো সন্তানকে কখনও দেওয়া উচিত নয়। আপনার বইতে এই কথাটা খুব ভাল করে লিখে দেবেন শংকরদা। এতো জেনেশুনেও অনেক বাবা-মা প্রায়ই এই ভুল করে সন্তানদের সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

সেই রাত্রে পুত্র সুশোভন বাগচী আম্পায়ারের ভূমিকা নিয়ে বাবা ও মাকে আলাদা করে দিলো। বললো, "তুজনে তু' জায়গায় শুয়ে পড়ো। একেবারে আলাদা থাকো তু'জনে।"

মায়ের কাছে শুয়েছে ছেলে। গজ-গজ করতে-করতে পিতৃদেব অন্য ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলে বুঝলো মা এখনও ঘুমোননি। তখন সে আলতো করে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। মা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন "ও বলে বেড়াচ্ছে, আমার বংশে পাগল রোগ আছে আমার বাবার বংশে ওই রোগ নেই। ওর জন্যেই যে আমার এমন হয় তা তুই তো একবারও বললি না।"

পুত্র সস্নেহে বললো, "মা, এবার তুমি চোখ বুঁজে ঠাকুরকে ডাকো। তিনি সব যন্ত্রণা কমিয়ে দেবেন।"

কিন্তু মা তখনও চাইছেন, 'তোর বাপকে বিছানা থেকে তোল কথাটার ফয়সালা হওয়া দরকার।"

ভাবা গিয়েছিল পরের দিনই তিক্ত এই দাম্পত্য সম্পর্কের একটা এসপার-ওসপার হবে। কিন্তু সেদিন সকালে হঠাৎ মায়ের একমাত্র মাসীমা বোনঝির খোঁজখবর করতে ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাইলেনের বাড়িতে হাজির হলেন। গরদের শাড়ি পরে সন্দেশের বাক্স হাতে মায়ের মাসীমা রিকশ থেকে নামতে-নামতেই জিজ্ঞেস করলেন, "ও মিন্থু,

তুই কেমন আছিস? জামায়ের খবর পাই না কেন?" বাইরের লোকের সামনে ঘরের কেচ্ছা চাপা দেবার প্রবল প্রচেষ্টায় মুহূর্তে ভাঙা চিনেমাটির ঠুনকো সংসার এমনভাবে সাজানো হলো যেন সব কিছুই জোড়া আছে। কোথাও কিছু চিড় খায়নি।

জননী মিনতি দেবী মুহূর্তে হয়ে উঠলেন আদর্শ গৃহকর্ত্রী, আর বাবা সেই-ধরনের জামাই যিনি কর্তব্য ছাড়া কিছুই বোঝেন না। দাম্পত্য সম্পর্কের যত নোংরামি যেখানে ছিল সব কার্পেটের তলায় অদৃশ্য হলো। স্যরি, কার্পেট কোথায় পাবেন ওলাবিবিতলা লেনে? অনন্তকাল ধরে বাঙালীদের সব নোংরা বিছানার তোশকের তলায় চলে যায়।

মায়ের মাসীমা সারাদিন ওলাবিবিতলায় থাকলেন। লুচি এবং সন্দেশ দিয়ে জলখাবার খেলেন। দুপুরে ভাত খেয়ে জামায়ের-করা বাজারের এবং বোনঝি-র রান্নার প্রশংসা করলেন।

দই দিয়ে শেষপাত খেতে-খেতে মায়ের-মাসী বললেন, "দিদি-জামাইদার দূরদৃষ্টি ছিল গা, ঠিক ঘরেই দিয়েছিলেন মিনতিকে। এমন স্বামী, এমন সন্তান—মিনু, তোর সোনার সংসার চিরদিন সোনার থাক।"

ছেলেটা বোকার মতন একবার বলতে গেলো গতকাল সমস্ত রাত ধরে কা কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু মিনতি এমনভাবে সন্তানের দিকে তাকালেন যে সে চুপ করে গেলো এমন ভাবে যেন কিছুই হয়নি। মিনতি হঠাৎ মাসীকে প্রণাম করে বললেন, "আমার বাবা নেই, মা নেই, তুমিই আমার সব।"

মাসীমা সস্নেহে বকুনি দিলেন, "দূর বোকা, এয়োস্ত্রী মেয়ের হীরে জহরত হলো স্বামী আর সন্তান। অমন শিবের মতন স্বামী হয়েছে, ভগবানের দয়ায় ছেলেটাও বাপের মতন হোক। আর তোর বাপ-মা তো সারাক্ষণ স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করছেনই।"

কী আশ্চর্য! পিতৃদেব ঐদিন মুখে মাদকদ্রব্যের কোনো গন্ধ না নিয়েই অনেক তাড়াতাড়ি কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলেন। শাশুড়ীকে ছাতা হাতে রিকশায় চড়িয়ে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তুলে দিয়ে এলেন। মায়ের-

মাসী দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, "বেঁচে থাকো, সুখী হও।"

নতুন নাটক দেখে পুত্র তাজ্জব। প্রত্যেক বাঙালীই যে অভিনয়ে নামলে ভাল করবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

ডিনার টেবিলে বসে শংকরদা প্রাণখুলে সুশোভন বাগচীর ভারতীয় রান্নার তারিফ করছেন।

আমি হাসছি। বক্তব্য : "প্রত্যেক বাঙালী পুরুষমানুষকে একবার জোর করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা হলে রান্নাটা সড়গড় হয়ে যাবে।"

"তুমি তো বিপদে ফেলবে দেখছি। বিদেশে পাঠালে বাঙালী মেয়েরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে, আর ছেলেরা ঘরসংসারে চৌকশ হচ্ছে—কোটি-কোটি বাঙালীকে মানুষ করার মতন জায়গা বিদেশে কোথায় পাওয়া যাবে ? তার থেকে বরং এমন একটা মতলব আঁটো যাতে বিদেশের হাওয়াটাই বাংলায় চলে যায় !"

"আমি দূর থেকে কিছু-কিছু ভেবেছি, শংকরদা। এই যে বাঙালীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে এর কারণ কি জানেন ?"

"চক্রবৎ পরিবর্তন হয়—এক-একটা সময় আসে যখন সব কিছু পিছিয়ে পড়ে।" শংকরদার মন্তব্য।

"কোষ্ঠির কথা তুলে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না শংকরদা। এই যে খেলার মাঠে, রাজনীতির রণাঙ্গনে, চাকরির বাজারে, শিল্পোদ্যোগে, বাণিজ্যে বাঙালী পুরুষ সর্বত্র ডুবে যাচ্ছে তার কারণ বাড়িতে, যেখানে পুরুষমানুষ পুরুষ হয় সেখানে কোনো গুরুতর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। বাঙালীর সংসারে এতোদিন ধরে মেয়েদের ওপর যেসব অবিচার অত্যাচার চলে আসছে তার ফল তো ফলবেই। মূল গাছ যদি নেতিয়ে যায়

তাতে ফল ভাল হবে কী করে ? দুর্বল রমণীর গর্ভে সবল পুরুষের জন্ম হওয়া তো সম্ভব নয়।"

শংকরদা আমার কথাগুলো এবার বোধ হয় খাতায় লিখে নিলেন। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি বাঙালীদের সম্বন্ধে। বললাম, "আমার অনেক কথা আছে শংকরদা, আমি আপনাদের ওইসব প্রবাসী বাঙালী মিটিং-টিটিং-এ যেতে পারবো না। আমার ওসব তেমন ভাল লাগে না। আপনি কিন্তু চলে আসবেন সব কাজ সেরে প্রতি রাত্রে। আমি আপনাকে আবার যথাস্থানে পৌঁছে দেবো।"

"তুমি সেদিন একটা ক্যামেরা নিয়ে গল্পের পরিস্থিতি তৈরির কথা বলেছিলে, সুশোভন।" শংকরদা ঠিক মনে রেখেছেন।

"আর ঐ গল্প, যেটা আপনাকে বলতে মাঝপথে আটকে রেখেছি— ওই যে ক্যামেরার কথা, ওই যে পিতৃবন্ধুর কথা, ওই যে পিতৃদেবের পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত এসব আপনাকে শুনিয়ে দেবো। আপনার একটা মন্তব্য আমার মায়ের খুব ভাল লেগেছিল—'প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যে একখানা করে উপন্যাস ভগবান নিজে হাতে লিখে রেখেছেন।' এই উপন্যাসগুলোর বেশিরভাগ শ্মশানঘাটে চলে যায়, পোড়ানোর সময় বের করে নেওয়া হয় না।"

"আপনি এদেশে এসেছেন, এদেশ তো দেখবেনই। কিন্তু এদেশী বাঙালীদের চোখেও নিজের দেশটা দেখা প্রয়োজন। আমি যতটা দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি সব আপনাকে শুনিয়ে দেবো। তেমন দরকার হলে আপনাকে অনেকগুলো ঘটনা টেপ রেকর্ড করে দেবো, আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, লিখে নেবার হাঙ্গামা থাকবে না। এখানে একা থাকলে আমি অনেক সময় সামনে টেপ রেকর্ডার রেখে নিজের সঙ্গেই কথা বলি। শুধু আমি নই, অনেকেই নিঃসঙ্গতার বরফে জমে যাবার ভয়ে এদেশে ওই কাণ্ড করে।"

"শংকরদা, সমস্তদিন ধরে বিদেশের পথে-পথে ঘুরে আজ প্রবাসী বাঙালী সমাজের কী ছবি দেখলেন? বলুন। এখানকার বাঙালীরা আপনাকে কিছু চিন্তা-ভাবনার খোরাক জোগাচ্ছে তো?" আমি জানতে চাইছি।

শংকরদা প্রথমে একটু দ্বিধা করছিলেন। তারপর বললেন, "এদেশে যা দেখছি তাই মনের মধ্যে আশার আলো জাগাচ্ছে, সুশোভন। আমাদের মধ্যে যে এতো প্রাণশক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে তা আমরা তো নিজের দেশে বসবাসের সময় কখনও উপলব্ধি করি না। যারা সাধারণ ছেলে যেটুকু অভ্যস্ত, পিছিয়ে পড়াই যাদের ধর্ম হয়ে উঠেছে তারা এখানে অনায়াসে সাফল্যের জয়টীকা পরছে। রোবিনসন সায়েব বললেন, 'বাঙালীরা আরও ভাল করবে, দেখো।' কাজেকর্মে ফাঁকি দেয় বলে যাদের বদনাম তারাই এখানে এসে বিরাট-বিরাট গবেষণার বই লিখছে। প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে না বলে যাদের দুর্নাম তারাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে বড়-বড় প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। ডাক্তারিতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, প্রযুক্তিতে আমাদের যে এতো সুনাম হতে পারে তা তো কখনই জানা ছিল না সুশোভন।"

শংকরদা ইতিমধ্যেই দেশে লিখে পাঠিয়েছেন, "এই বেড়ালই যে বনে গেলে বনবেড়াল হয় তা এবার হাড়ে-হাড়ে বুঝছি।"

"শোনো সুশোভন, যা আমার বিশেষ করে ভাল লাগছে তা হলো বাঙালী মেয়েদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুন্দর মাটিতে, সুন্দর পরিবেশে এঁরা রীতিমত ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছেন।"

"আমি সীমন্তিনী চ্যাটার্জি বলে চমৎকার এক মহিলার আতিথ্য পেলাম এখানে।"

শংকরদার গল্পটা এইরকম: মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রাম থেকে

এদেশে এসে সীমন্তিনী চ্যাটার্জি সুন্দর এক সংসার পেতেছে—স্বামী প্রমথ, কন্যা লিলি। প্রমথবাবু ভাল কাজ করেন, আর সীমন্তিনীও জুটিয়ে নিয়েছে সেলস্-এর চাকরি। শুনলাম, সীমন্তিনী এ-বছর সেলস্ উয়োম্যান অফ দ্য ইয়ার সম্মান পেয়েছে কোম্পানি থেকে। আমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। কাজের সূত্রে ওর সঙ্গে একের পর এক গোটা কুড়ি দোকান ঘুরে বেড়ালাম প্রায় শতখানেক মাইল ব্যাপ্তির মধ্যে। দেখলাম, সীমন্তিনী কী চমৎকার নেতৃত্ব দিচ্ছে আরও এক ডজন মেয়েকে। এই সব জুনিয়র মহিলাদের আদিপুরুষ কেউ গ্রীক, কেউ ইতালীয়, কেউ জার্মান, কেউ রাশিয়ান। সব জাতের এই মিলন-তীর্থে বাঙালী সীমন্তিনী সেই মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে এসে যে নিজেকে ওপরে তুলেছে এটা আমাদের পক্ষে ভীষণ আনন্দের কথা, সুশোভন।"

সীমন্তিনী ও তার স্বামীকে শংকরদা বলেছেন, "আমরা দেশের মানুষরা তোমাদের ডলার চাই না, তোমাদের উপহারও চাই না। আমরা শুধু তোমাদের সাফল্যের অনুপ্রেরণায় নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাই। বাঙালী যে কিছুই পারে না, সে সোনা স্পর্শ করলে তা পিতল হয়ে যায় এই অপবাদ কেবল তোমরাই ঘোচাতে পারো।"

শংকরদা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে চললেন, "একটি মেয়ে, বোধ হয় ইতালীয়। নামটি ভারী সুন্দর—অ্যামাণ্ডা রোমেরো। খুবই কমবয়সী মেয়ে। সে তো আমাকে বলে বসলো, সীমন্তিনী আমার আইডিয়াল—আমি ওই রকম হতে চাই। যিনি একজন জলজ্যান্ত স্বামী সামলাচ্ছেন, একটা মেয়েকে চমৎকারভাবে বড় করে তুলছেন, আবার কোম্পানির বিক্রিতে একের পর এক রেকর্ড করছেন।"

আর একটি মেয়ে, ডনা লোপার, প্রায় ডানাকাটা পরী। সে বললো, "আমি কেবল মনের মতন একজন স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছি। দেখা পেলেই এই চাকরি ছেড়ে দেবো। আমি সীমনের

নতন একের মধ্যে-তিন আশ্চর্য-রমণী হতে পারবো না কোনোদিন।”

অ্যামাণ্ডা রোমেরো হৈ-হৈ করে উঠলো, “তিন নয়, ফোর-ইন-ওয়ান। আমি একদিন সীমনের বাড়িতে গিয়েছিলাম, শনিবারে। শী ওয়াজ ডুইং পূজা।”

“হোয়াট ইজ পূজা ?” চঞ্চলা বিদেশিনীদের মধ্যে প্রবল কৌতূহল জেগে উঠলো।

“গোয়িং টু চার্চ ?” একজন জানতে চাইলো।

অ্যামাণ্ডা রোমেরো বললো, “আমি আমার বয়-ফ্রেণ্ডের কাছে শুনেছি, সীমনের দেশে নিজের বাড়িটাই চার্চ—প্রত্যেক বাড়িই একটা গীর্জা। তুমি নিজেই তোমার পুরোহিত। ডু ইট ইওরসেলফ ধর্ম। তুমি নিজেই ঈশ্বরকে সুখী রাখবে, বাইরের কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।”

সীমন্তিনী আমাকে দুপুরে ম্যাকডোনাল্ডে লাঞ্চ খাওয়ালো। ও আমাকে বড় রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ইণ্ডিয়ান খাবার এদেশে এমন উচ্চস্তরে উঠে গিয়েছে যা মিস করা নাকি বোকামি।

আমি বললাম, “ফাস্টফুডটা আমাদের দেশে তেমন চালু হয়নি, অথচ ম্যাকডোনাল্ড সারা আমেরিকা জয় করে বসে আছে।”

শুনলাম আর এক সংস্থা আছে, কেনটাকি চিকেন ফ্রাই। এই কোম্পানি চিকেনে এমন কিছু মশলা মিশিয়ে দেয় যে একবার খেয়েছে সে মজেছে! বারবার কেনটাকি চিকেন ফ্রাইতে পদধূলি দেবার তাগিদ সে অনুভব করবে।

দোকানে ঢুকে সীমন্তিনীর সহযোগিতায় ফাস্টফুডের একটা বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির চেষ্টা করা গেলো। “দ্রুতখাদ্য শব্দটা বাংলায় তেমন জমছে না,” সীমন্তিনী মিষ্টি হেসে বললো।

আমি মাথা খাটিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের ছাতার তলায় বসে বললাম, “‘নাও-আর-খাও’ কেমন লাগে তোমার ?”

সীমন্তিনী : “চমৎকার! তবে এই যে আপনি দুঃখ করছেন ইণ্ডিয়াতে ফাস্টফুড সংস্কৃতি পৌঁছলো না, এটা কিন্তু ঠিক নয়।

ম্যাকডোনাল্ড তো কালকের শিশু, এর আগের বারে আপনি যখন বিদেশে এসেছিলেন তখনও এই কোম্পানিকে দেখেননি। কিন্তু আমাদের কলকাতায় ম্যাড্রাসি মশলা-দোসা কতদিন থেকে চলছে বলুন ?”

তা ঠিক বলেছে সীমন্তিনী। ভারতের যে-কোনো ম্যাড্রাসি দোকান ফাস্টফুডের বাবা! কোনোরকম যন্তরপাতির সাহায্য না-পেয়েও মাদ্রাজী যুবকরা যে কমপিউটার গতিকে দোসা, সাদা বড়া, মাইসোর বড়া, এটসেটরা সাপ্লাই করে মচমচে অবস্থায় তা দেখলে ম্যাকডোনাল্ডের বড়া ম্যানেজার পর্যন্ত ভিরমি খাবেন!

সীমন্তিনী কাজে-কর্মেই আমেরিকান হয়েছে, কিন্তু স্বভাবে সেই মেড-ইন-বেঙ্গল। কত যত্ন করে খাওয়ালো। বললো, “শংকরবাবু, এখানকার জল খুব হজমি। আপনি ঠিকমতন না খেলে একটু পরেই মনঃসংযোগ করতে পারবেন না। আবার খিদে পাবে।”

লেখকমশাই এবার নিজের মানসিকতার বর্ণনা দিলেন। বললেন, “জানো সুশোভন, বাঙালী মেয়েদের তত্ত্বাবধানে রাস্তায় বেরুতে কেমন যেন একটু ইয়ে-ইয়ে লাগে। দেশের রাস্তায় বেরিয়ে চিরকাল আমরা মেয়েদের বডিগার্ডের কাজ করেছি, আর এখানে ঠিক উল্টো। ড্রাইভিং সিটে বসে মেয়েরা চটপট ট্রাফিক সিগন্যাল অতিক্রম করছে, পার্কিং স্পটে টিকিট কাটছে, বিপুল বিশ্বাসে গাড়ি ব্যাক করছে, আর আমি প্রায় নাবালকের মতন বঙ্গরমণীর শাড়ির আঁচল ধরে এখান থেকে ওখানে এগোচ্ছি এবং শহর দেখছি। পদে-পদে ভয়, এই বুঝি এই বিপুল ঐশ্বর্যের দেশে আমি আশ্রয় হারিয়ে ফেললাম!”

দেশে গিয়ে সীমন্তিনীকে একজন আদর্শ বাঙালিনী চরিত্র বলে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন লেখকমশাই।

আমি আর পারলাম না। মুখ ফসকে বলে ফেললাম, “একটু দেরি

হয়ে গিয়েছে, শংকরদা। সীমন্তিনী এখন আর বঙ্গবালা নয়—সে একজন বামারিকান। বহুপথ, বহু বাধা নিজের চেষ্টায় অতিক্রম করে সে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। মেদিনীপুরে তো ওকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।"

"সীমন্তিনী আপনাকে হয়তো বলতে লজ্জা পাবে, কিন্তু আপনি শুনে রাখুন ব্যাপারটা। বিধবা হয়ে, সাদা থান পরে, কণ্টাই টাউনে একাদশী-অমাবস্যার বন্দিনী জীবনযাপন করছিল সীমন্তিনী। তারপর ইস্কুলের মিস হবার জন্যে কলকাতায় পড়াশোনা করছিল।"

সেই সময় ওর সহপাঠিনী বান্ধবী খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওর হয়ে পত্রালাপ শুরু করলো ডাইভোর্সী প্রমথ চ্যাটার্জির সঙ্গে। প্রমথ মার্কিন মুলুকে মেমসায়েব বিয়ে করেছিল, বউ রাখতে পারেনি। আর একজন কটা রঙের নীলাক্ষ 'ও-য়া-স্-প্' তার প্রথম স্ত্রীকে যথাসময়ে দখল করলো। তা সীমন্তিনার বাবা-মায়ের সে কি দুঃখ, সমাজে মুখ দেখানো নাকি দায় হবে। বিধবা মেয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজের বিয়ের জন্যে পত্রালাপ করছে। তা ভাগ্যে বাপের কথায় সীমন্তিনী কান দেয়নি। কণ্টাই মহকুমায় কে কি বদনাম করলো তাতে পৃথিবীর কী এসে যায়? সীমন্তিনী এদেশে এসে বিয়ে করলো প্রমথ চ্যাটার্জিকে।

আপনি সম্ভব হলে দু'খানা ছবি নিয়ে যাবেন এই সীমন্তিনীর। প্রথমটা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট—বৈধব্যযুগের। সাদা থান পরে দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেলে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সীমন্তিনী। এই সীমন্তিনা তখন একাদশী করতো। অবশ্য মনের দুঃখে ওর মাও একাদশীর দিনে ভাত খেতেন না। সে নিয়ে মায়ের শাশুড়ি আবার রাগ করতেন। এয়োস্ত্রীর আবার একি আচরণ! শেষ পর্যন্ত একটা পথ বের হলো। মা একসময় টুক করে হেঁসেলে ঢুকে মুখে একটুকরো মাছ ফেলে দিতেন নিজের এয়োস্ত্রী মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে। তারপর মেয়ের সঙ্গে বসতেন খাবার টেবিলে একাদশী লাঞ্চের জন্যে।

আর আপনি শুনবেন, কলকাতার হোস্টেলে সীমন্তিনীর পিতৃদেব

কন্যার কাছে দূত পাঠিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "তুমি ভুল পথে এগিও না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। এইভাবে বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।"

সীমন্তিনীর ওই পাঞ্জাবী হোস্টেল-বান্ধবী না-থাকলে হয়তো ফিরেই যেতো কণ্টায়ের সেই কণ্টকারণ্যে।

এখন আপনি আজকের সীমন্তিনীর একটা রঙিন ছবি সংগ্রহ করে নিন। সীমন্তিনী একটি কন্যার জননী হয়েছে—চমৎকার চলছে জীবন। প্রমথ চ্যাটার্জি আগে যা-ই থাক এগারো মাস আমেরিকান বউয়ের সঙ্গে ঘর করে অনেক দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হয়ে উঠেছে। বউ রাখতে গেলে তার জন্যে যে নিজের হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা পাল্টাতে হবে, একটু-আধটু গতর খরচ করতে হবে তা সে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছে: সীমন্তিনীকে সে মাথায় করে রেখেছে।

লেখকমশাই আপনার বিস্ময় যেন বাড়ছে। আপনি এই দেশে এসে যেন বাঙালীদের প্রথম আবিষ্কার করছেন। প্লিজ, মার্কিনীদের বিত্ত-প্রীতির যতই সমালোচনা আপনারা করুন, মনে রাখবেন, এটা বিপ্লবের দেশও বটে। এই দেশের দরজা কতকগুলো পাজি সায়েব যদি ষড়যন্ত্র করে বাঙালীদের জন্য বন্ধ করে না রাখতো, যদি ওই ১৯৪৫ সালের যুদ্ধের পরই প্রবেশের সামান্য সুযোগ দিতো, তা হলে আমাদের অনেক মানুষকে এইভাবে তলিয়ে যেতে হতো না।

শংকরদা বললেন, "এখানকার সাহিত্যসভায় আর একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো—দুর্গাবতী রায়।"

"যে-মাঝবয়সী মহিলাটি নিজেই ভিডিও ক্যামেরা পরিচালনা করছিলেন অশেষ ধৈর্য ধরে। সভা শুরু হয়েছে কোন সকালে, দুর্গাবতীর এক মুহূর্ত ডিউটি থেকে নড়বার উপায় নেই। গভীর নিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছেন। একটি এগারো বছরের ছেলে এসে একবার তাঁকে

ডেকে নিয়ে গেলো।

মধ্যবয়সী মহিলা, বামারিকানদের তুলনায় একটু ওজন বেশি, শরীর অতো সুশাসিত নয়। মৃদু হেসে নমস্কার করে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে সেই সকাল থেকে, কিন্তু নড়বার উপায় নেই। ক্যামেরার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। আমি বনগাঁয়ের মেয়ে।"

বনগাঁ বলতে আমার যে শরীরে শিহরণ হয় তা বুঝতেই পারছো, সুশোভন। বাংলাদেশ সীমান্তে ওই ছোট্ট শহরে অনেক বছর আগে ১৯৩৩ সালে আমার জন্ম। তারপর ভাগ্যসন্ধানে দেশত্যাগ করে আমার পিতৃদেবকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। বনগ্রামে কখনও বসবাসের সুযোগ হয়নি আমার। চালচুলোও সেখানে কিছু নেই। শুধু জন্মস্থানের একটা রোমান্টিক অনুভূতি মনকে এখনও ঘিরে ধরে যখন শুনি কেউ বলে আমিও বনগাঁয়ের লোক। বনগ্রাম আমার সেই 'রুট্‌স্' যেখানে পৌঁছবার জন্যে হাজার-হাজার আমেরিকান এখন আবার উন্মুখ হয়ে উঠেছে।"

এই মহিলাটিকে কেমন লাগলো, জিজ্ঞেস করছো সুশোভন? একেবারে দিশী বাঙালী মেয়েই রয়ে গিয়েছে মনে হলো উইথ পশ্চিমী নৈপুণ্য। সবচেয়ে ভাল লাগলো ছেলেমেয়ে দুটিকে। আমাকে সবাই ওখানে বলেছিল, দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালী একেবারে চোয়াড় আমেরিকান হয়ে গিয়েছে, তারা বাবা-মাকে তোয়াক্কা করে না, সংসারে তাদের টান নেই, তারা মার্কিন জাতটার মতন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—সমস্ত জাতের অধৈর্য ভাবটা এদের মধ্যে প্রতিফলিত। কিন্তু দেখলাম, ছেলে কত আদর করে মাকে দুবার কফি এনে খাইয়ে গেলো। একবার আইসক্রিম আনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো। তারপর লাঞ্চের সময় আমি লক্ষ্য করলাম, যেহেতু যন্ত্রগুলি ছেড়ে মায়ের পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, সে কাগজের প্লেটে খিচুড়ি এনে মায়ের পাশে বসেই লাঞ্চ সারলো। যত্ন করে সবক'টা এঁটো প্লেট দূরে এক লিটার

বিন-এ ফেলে এলো। মাকে জল খাওয়ালো।"

আমি মিসেস রায়কে বললাম, "আমার পিতৃদেব রানীদুর্গাবতী বলে একটি নাটক লিখেছিলেন বনগ্রামে থাকতে। একসময় কোহিনুর থিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল।"

সুরসিক ছেলেটি মায়ের সম্বন্ধে রসিকতা করলো, "দ্যাটস এ গুড ওয়ান। এখন থেকে আমরা মাকে কুইন দুর্গাবতী বলে ডাকতে পারবো। ওই দুর্গাবতী কি আমার মায়ের মতন সাহসিনী ছিলেন ?"

"আঃ খোকা !" মহিলা লজ্জা পেলেন। বললেন, "এখানকার ছেলেরা এইরকম ! গুরুজনদের একেবারে ভয় করে না। তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ ইয়ার্কি করে !"

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বললো, "আমরা আট ঘণ্টা ঘুমোই, চার ঘণ্টা ভারতবর্ষে থাকি, আর বাকি বারো ঘণ্টা আমাদের নিবাস ইউ-এস-এ। আমরা চেষ্টা করলেও তাদের মতন ওয়েল বিহেভ্ড হতে পারবো না যারা চব্বিশ ঘণ্টাই ইণ্ডিয়াতে রয়েছে।"

ছেলেটি আবার মায়ের ইঙ্গিতে আমার জন্যে কফি আনতে ছুটলো। আর দুর্গাবতী বললেন, "আমার ছেলেটি পড়াশোনায় খুব ভাল। মুখে আমাকে রাগায়, কিন্তু মাকে ভীষণ ভালবাসে। আমিই হচ্ছি ওর সেরা বন্ধু !"

আমার খুব ভাল লাগলো বনগাঁর এই মেয়েটিকে। টকটকে লালপাড় শান্তিপুরী শাড়ি পরে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি মনে হচ্ছিল—নিজের দেশেও যা, এখানেও তা।

প্লিজ, প্লিজ, একটু থামুন শংকরদা। আপনি একটা বিপজ্জনক মন্তব্য আলতোভাবে করে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি বললেন, "দুর্গাবতী মাতৃমূর্তি—এখানেও যা দেশেও তা।"

আমি স্যরি, কিন্তু আপনাকে একটু বাধা দিতেই হচ্ছে। দুর্গাবতী আপনার দেশে গেলে ওই টকটকে লালপাড় শাড়ি পরে ভিডিও

ক্যামেরা চালাতে পারতেন না।

দুর্গাবতীর স্বামী মিস্টার রায় এখানে অধ্যাপক ছিলেন। আমেরিক'ন সমাজে এবং ইণ্ডিয়ান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়। আর দুর্গাবতী টিপিক্যাল বনগ্রামের মেয়ে—আমেরিকায় বিয়ে হয়ে স্বামীর সংসার করতে এসেছেন, কিন্তু এখানকার জীবনধারার কিছুই তেমন জানেন না। টিপিক্যাল হোলটাইম হোমমেকার। এখানে গৃহবধু কথাটা তেমন জনপ্রিয় নয়।

তারপর হঠাৎ একদিন অধ্যাপক রায় কলেজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পরের দিন হাসপাতালে অকালমৃত্যু হলো।

দুটি সন্তান নিয়ে সদ্য বিধবার দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল এই উপদেশ অনেকে দিলেন। কিন্তু দুর্গাবতী ততক্ষণে দুঃসাহসিনী হয়ে উঠেছেন। "ছেলেমেয়েকে এমনভাবে মানুষ করার সুযোগ আমি দেশে গিয়ে কোথায় পাবো?"

কয়েকমাস সময় চেয়ে নিলেন দুর্গাবতী। বনগ্রামের যে-মহিলা কোনোদিন পথে বেরোননি তিনিই অবিশ্বাস্য কম সময়ে ইস্কুলে গিয়ে ভিডিও সংক্রান্ত কাজ হাতে-কলমে শিখলেন। এইটাই সবচেয়ে সহজ ছিল। কারণ ইংরিজিটা ওঁর তেমন সড়গড় ছিল না। তারপর শুরু হয়েছে সাধনা।

দুর্গার মতনই দশভূজা হয়ে দুর্গাবতী এখন চাকরি করেন, ছেলে মানুষ করেন কারও ওপর নির্ভর না করে। ওঁর একমাত্র স্বপ্ন স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী ছেলেমেয়েকে ভাল শিক্ষা দেওয়া। এরা সত্যিই ভাল ছাত্র-ছাত্রী। এই দুর্গাবতীই বনগাঁয়ে পৌঁছলে লোকের সমস্ত এনার্জি ব্যয় হতো বিধবা কোন লজ্জায় লালপাড় শাড়ি পরছে এই নোংরা আলোচনায়। দুর্গাবতীকে কেউ তার নিজস্ব কাজটা করতে দিতো না। ওর মধ্যে যে সাহসিনী মানুষটি আছে, দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়ে যে নিজেকে বিকশিত করতে চায় সে বাইরে বেরুবার সুযোগই পেতো না পাড়া-পড়শি এবং আত্মীয়দের মিলিত বিক্রমে।

শংকরদা নিজেই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন। "মুক্তির স্বাদ মানুষকে আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল করে তুলছে দেখতে খুব ভাল লাগে," বলছেন। "সুশোভন, এই সব মহিলাকে ভিড়ের মধ্যে দেখে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারতাম না যদি এঁদের পশ্চাৎপট এইভাবে জানা যেতো।"

এইটাই আমার বিস্ময়, লেখক মহাশয়। এদেশের মাটিতে মেয়েরা প্রাণবতী হয়ে ওঠে। আর যে-দেশে রমণীর মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব সেদেশের সন্তান তো পৌরুষহীন হবেই।

শংকরদা নিজেই এবারে সেই পুরনো গল্পটার কথা তুললেন। বললেন, "ক্যামেরায় কালী ব্যানার্জি লেনের অণুশ্রীর নিষিদ্ধ ছবি তোলার ব্যাপারটা এখনও চিন্তায় রয়েছে। সরস্বতীর কথাও মাথায় নাচছে। ওই যে সরস্বতী, হাড়কাটা গলিতে যাকে একেবারেই বেমানান মনে হয়। সরস্বতীর আসন তো মন্দিরে, মণ্ডপে—পতিতালয়ে নয়। আর ওই ছোকরাটি, যার নাম দেওয়া হলো যেন বাদল।"

"যে-কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে। এই সুশোভন নামটা ব্যবহার করলেও বিন্দুমাত্র এসে যায় না। আসলে আমরা একটা প্রতীক চাইছি—এমন একজন মানুষকে খুঁজছি যে ধড়িবাজ বাঙালী পুরুষ সমাজের ডবল স্ট্যানডার্ডের শিকার হয়ে দাঁড়াবে। জন্মাবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই মাতৃগর্ভে যে সাফার করছে পুরুষের দায়িত্ব-হীনতায়। যে-দায়িত্বহীনতা এখনও পর্যন্ত কেবল আমাদের সোনার বাংলাতেই সহ্য করা হয়ে থাকে, আর কোথাও নয়।"

"ভাল বলেছো, সুশোভন। তুমি যথার্থই খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখিয়েছো—নিজের নামে সবাই নিষ্কলঙ্ক আদর্শবাদী নায়ককে দেখতে চায়। কেউই ব্যর্থতার, যন্ত্রণার, অপমানের পটভূমি হতে চায় না। তুমি বলছো, ব্যবহার করুন আমার নামটাই, আমি কিছু মনে করবো না।"

কারণ একটু তলিয়ে দেখলে আপনার নজরে পড়বে, সুশোভন নামটার পিছনেই এক ধরনের কপটতা রয়েছে। টিপিক্যাল

বেঙ্গলি পুরুষ-হিপোক্রিসি। শুধু শোভন বলেই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে আবার সুশোভন করা হচ্ছে। বাইরে ভদ্রতার বাড়াবাড়ি করে ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই বাঙালীর সামাজিক শক্তির অর্ধেক ব্যয় হয়ে গেলো।"

"ক্যামেরাটা, সুশোভন আমার মনের মধ্যে খেলা করছে। অণুশ্রীর ওখানে সহজেই একটা সংকট বাধিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ওর স্বামীর কাছে ছবিগুলো কোনোভাবে চলে গেলো, বা ওইরকম কিছু। ভীষণ নিগৃহীত হলো ওই ছেলেটি, যে তার অসহায় অসুস্থ মাকে ভালবাসে কিন্তু কোনো কাজে আসে না। আমি সরস্বতীর নিষিদ্ধ পল্লীতে ক্যামেরাকে কীভাবে কাজে লাগাবো তা এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। কিংবা তুমি কি এমন সংকটের কথা ভাবছো যেখানে অণুশ্রীকে তার স্বামী একবস্ত্রে রাস্তায় বের করে দিয়েছে, আর সে বাদলের কাছেই ছুটে এসেছে আশ্রয়ের জন্যে। না, তুমি ভাবছো, সোজা পুলিশের অথবা উকিলের, অথবা গুণ্ডার শরণাপন্ন হয়েছে অণুশ্রীর স্বামী। বিবস্ত্রা রমণীর ছবি আমাদের দেশে দাঙ্গা বাঁধাতে পারে, সুশোভন। কাল রাত্রে আবার তো আসছি, তখন দু'জনে মিলে আবার এই গল্প তৈরির খেলাটা খেলা যাবে। গল্পের পক্ষে এই পরিস্থিতিটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। তুমি একটা কিছু বলতে চাইছো, অথচ ঘটনার মাধ্যমে বক্তব্যটা সাজাতে পারছো না, তাতে কাজ হবে না।"

আমি শংকরদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "শংকরদা, আজ একটু মদ্যপান করবেন? একটু-আধটু ড্রিংকস না করলে কল্পনার জট খুলবে কী করে? আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যারা ওই অপরেশ বাগচীর মতন লুকিয়ে-লুকিয়ে মদ খেয়ে বাইরে ভব্যতা বজায় রাখে তাদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আমি কোনোদিন মার্কিন মুলুকে লুকিয়ে কিছু করিনি—এইটাই এদেশের শক্তি। এখানে চাপাচুপির কারবার নেই—কর্ম অপকর্ম সব খোলাখুলি। এখানকার পুরুষমানুষ খোলাখুলি স্বীকার করে সে

সেক্সি—এদেশের মেয়েমানুষ তার বান্ধবীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে কতজন পুরুষবন্ধুকে সে গত মাসে শয্যাসঙ্গ দান করেছে।

আমি এখন একটু ড্রিংকস করবো। আপনি যখন মদ্যপান করবেনই না ঠিক করেছেন তখন চলুন পানের আসর জমাবার আগে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। এখানে এই এক বিপদ, নিজের বাড়িতে বসে যত খুশি মদ খাও, কিন্তু মদ খেয়ে গাড়ি ড্রাইভিং চলবে না। মদের সঙ্গে গাড়ির আড়ি মিটিয়ে দেবার বৈজ্ঞানিক পথ যেদিন বেরুবে সেদিন এদেশ আরও স্বাধীন হয়ে উঠবে।

শংকরদা ওঁর লেখা দীর্ঘ নোটগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোথাও বেড়াতে গেলে স্মৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজের প্রথম মনোভাবটা শংকরদা প্রথম সুযোগেই কয়েকটা ছোট খাতায় লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। ওঁর মতে, "স্মৃতি মানুষকে কখন ঠকাবে কিছুই ঠিক নেই।"

শংকরদা অবশ্য একটা স্বার্থেই নোটবইগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছেন—যদি আমি কোথাও কোনো সংশোধন প্রয়োজন মনে করি। সংযোজনের স্বাধীনতাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যটা এইরকম : "তোমরা যা বছরের পর বছর ধরে দেখছো তা আমি এক আধদিনে কতটুকু দেখবো এবং দেখলেও কতটুকু বুঝবো? তবু সামান্য কিছু জেনেও যুগযুগান্ত ধরে ভ্রমণকারীকে লিখতে হয় স্রেফ লেখার তাগিদেই। তোমরা যারা অনেকদিন ধরে এদেশে রয়েছো তোমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ই তো লেখকের অক্ষয় ভাণ্ডার।"

আমিও গতকাল ড্রিংক করে শংকরদার জন্যে একখানা টেপ করেছি দেড় ঘণ্টা ধরে। আমার যত কিছু বলার ছিল ওই সুশোভন বাগচী সম্পর্কে সব টেপে ধরে নিয়েছি, সুশোভন বাগচী ইচ্ছে হলেও

আর পালিয়ে বেড়াতে পারবে না।

এখন শংকরদার বানানো নোট আমি পড়ছি মন দিয়ে। সামনে একটা জিন ঢেলে নিয়েছি। তাতে মিশিয়েছি সামান্য লাইম কর্ডিয়াল। হাজার-হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে সুরাপানের রেওয়াজ রয়েছে, কিন্তু এই সুরাশাস্ত্রে ইণ্ডিয়া কিছুই দান করতে পারেনি। এতোগুলো শতাব্দীর সুবিধে পেয়েও ইণ্ডিয়া সেই ধেনোর যুগেই পড়ে রইলো, আর সেদিন মাত্র আরম্ভ করে ইউরোপ একের পর এক আমাদের উপহার দিলো ওয়াইন, জিন, হুইস্কি। খ্রীষ্টের জন্মের ৮০০ বছর আগে থেকে মদিরাচর্চা করেও ইণ্ডিয়া এখনও সেই আরক ও তাড়ির যুগে পড়ে রইলো, আর ইউরোপ এই সেদিন—খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০ সাল নাগাদ—হুইস্কিতে হাতেখড়ি নিয়ে বীরবিক্রমে দুনিয়া জয় করলো। আড়াই হাজার বছরের সিনিয়রিটি কোনো কাজে দিলো না ইণ্ডিয়ার—স্রেফ ওই লুকিয়ে-লুকিয়ে আড়ালে-আড়ালে কম্মো ফতে করবার প্রবৃত্তি থেকে।

আমি এখন যে জিন সামনে নিয়ে বসেছি তার আবিষ্কার সপ্তদশ শতাব্দীতে। আমি জিন সাপোর্ট করি এই জন্যে যে জন্মমুহূর্ত থেকে অধ্যাপক সমাজের সঙ্গে এই মদের ঐতিহাসিক যোগাযোগ রয়েছে। হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত যে সুরসিক ডাচ অধ্যাপকটি এই পানীয়ের আবিষ্কারক তাঁর জীবনকাহিনী আমি পড়েছি। আমি এই ডাক্তার অধ্যাপক সিলভিয়াসের সঙ্গে একমত যে যে জিন একটা ওষুধ—মদ কথাটা বড্ড নোংরা মনে হয় আমার কাছে। অপরেশ বাগচীর তাসের আড্ডায় যা লুকিয়ে-লুকিয়ে বসতো তা ড্রিংকস নয়—মাতলামির আসর। মিনতি বাগচী ন্যায্যভাবেই দুঃখ করতেন, ওই আড্ডায় যে যাবে তার সর্বনাশ হবে।

জিন সহযোগে শংকরদার নোটটা মন দিয়ে পড়া যাক। বাঙালী লেখকদের একটা মস্ত দোষ তাঁরা কিছুতেই প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন না। আর একটা মস্ত দোষ, মুখে যতই তড়পান, বিবাহবন্ধনের বাইরে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক এবং দৈহিক

সম্পর্ক চিত্রিত করতে অস্বস্তি বোধ করেন। সুযোগ পেলেই কোনো একটা বস্তাপচা যুক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ যেসব সম্পর্ক সম্বন্ধে কলম ধরেননি বা মন্তব্য করেননি তা ঠিকমতন ম্যানেজ করতে পারেন না আধুনিক বাঙালী লেখকরা। যে-কোনো পরিস্থিতিতে ঐ তিন জন ভদ্রলোকের একখানা উদ্ধৃতি আধুনিক লেখকদের প্রয়োজন হয় আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে।

আর এক মুশকিল, ইদানীং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে বড্ড বেশি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হচ্ছে—প্রাচীন মুনি ঋষিরা সামগান মুখরিত তপোবনে যেসব ফষ্টিনষ্টি করতেন, যেসব পালিটিক্সে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা প্রযুক্তি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ডুবিয়ে ছিলেন তার কোনো হিসেব-পত্তর নেই। শুধু সামাজিক মানুষের যা অসাধ্য সেইসব আদর্শকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে সবাইকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা 'আমাদের পূর্বপুরুষ সমস্ত দুনিয়াকে কানে ধরে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ এক জায়গায় লিখেছিলেন, এমন কোনো সামাজিক আদর্শকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধোরো না যা সকলের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন। লক্ষ্য এমন হবে যেখানে পৌঁছনো যায়। এই ভুল করেই বুদ্ধদেব এদেশে সুবিধে করতে পারলেন না। কিন্তু দেখুন, সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ইণ্ডিয়ায় এবং আধুনিক লেখকরাও তাতে মনের আনন্দে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

শংকরদা দেশের বাইরে এসেও বিদেশের শিক্ষাটা বোধ হয় মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না, সুযোগ পেলেই এখানকার ভুল খুঁজছেন। ওঁর লেখাটা এইরকম :

অনুরাধা অর্থাৎ টুপটুপ মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ভারী মধুর। সুশোভন যাকে বলে মুক্তির স্বাদ হয়তো তারই ফল।

অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কাজ কী?"

হাল্কা শরীর নাড়িয়ে সে হেসে উত্তর দিলো, "অকাজ!

আমেরিকায় যারা একলা থাকে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর করা। উদ্দেশ্য একটাই—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি সংগ্রহ করা।"

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় সেই বাংলা, আর কোথায় এই ইউ-এস-এ। এখানে তোমার একলা থাকতে ভয় করে না?"

অনুরাধা হাসলো। পিটার ওয়াকার বলে, "একলা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। একলা থাকতে-থাকতেই তো মানুষ একদিন ডাবল হয়!"

এই পিটার ওয়াকারটি যে অনুরাধার সতীর্থ—একই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে, এইমাত্র—অনুরাধার কাছ থেকে সময়োচিত এই ইঙ্গিতটি পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

অনুরাধার সংযোজন: "পিটারের সঙ্গে দেখা হলে সে আপনাকে পরিসংখ্যানগুলো হুড়মুড় করে বলে যাবে। ১৯১১ সালে সাড়ে-চার কোটি আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা একলা থাকতো, ১৯১১-তে এই সংখ্যা দাঁড়ালো সাড়ে-পাঁচ কোটির ওপর, তার পরে প্রতি বছরে আরও বেড়েছে। দেশের মানুষের যা অবস্থা, তাতে অন্যের সঙ্গে ঘরসংসার পাতার হাঙ্গামায় না গিয়ে একলা থাকাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—প্রতি চার জনের মধ্যে একজন একলা থাকছে একটা জাতের, এটা কি ভাবা যায়?

পিটারকেই জিজ্ঞেস করবেন সে নিজে এখনও একলা থাকছে কেন? সোজাসুজি উত্তর পাবেন, "আমি আগামীকালই বিয়ে করবো, যদি আমি মিস্ রাইটকে খুঁজে পাই।"

এই মিস্ রাইট সম্পর্কে পশ্চিমের প্রত্যেক পুরুষমানুষের পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। মিস্টার রাইট সম্পর্কেও প্রত্যেক আমেরিকান মহিলার একই মানসিক প্রস্তুতি। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে কে কি চায়, তা সেই কৈশোরকাল থেকে সকলের মনের মধ্যে স্থির হয়ে থাকছে।

আপনি ভাবছেন, এই মিস্ রাইট কি নিতান্তই দুর্লভ?

মোটেই না। উইক এণ্ডে ডেটিং-এর সময় এদেশের কত পুরুষ এই মিস্ রাইটকে খুঁজে পাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হলো কি, আমি যাকে

চাইছি সে আমাকে মিস্টার রাইট মনে করছে কি না এইটাই সমস্যা।

আসলে প্রায়ই পরিস্থিতিটা এই রকম - মিস্টার এ চাইছেন মিস্ বি-কে, কিন্তু ওই সুন্দরী ছুটছেন মিস্টার সি-এর পিছনে, যদিও মিস্টার সি-র নজর মিস ডি-এর দিকে মিস ডি কিন্তু মনে ধরেছেন মিস্টার এ-কে ফলে দুটি সুখী দম্পতির বদলে আমরা পাচ্ছি চারটি পুরুষ ও নারীকে যাদের প্রত্যেকের কামনা অচরিতার্থ।

অনুরাধা আরও বললো, "না, শংকরবাবু, সান্নিধ্যসন্ধানী এদেশের পুরুষ ও নারীদের জন্যে দিশী পাঠক-পাঠিকাদের চোখের জল ফেলাবেন না যেমন আপনারা দেখান বাঙালী মেয়েদের, বিয়ের ফুল কবে ফুটবে তার জন্যে অধীর অপেক্ষায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে তারা নিজেরাই শুকিয়ে যাচ্ছে এবং গল্প-উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠছে। বিয়ে হচ্ছে না বলে শুধু মনের দুঃখে চোখের জল ফেলছে এবং ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাচ্ছে এটা বাংলা ছাড়া কোথাও সাহিত্যের বিষয় নয়। এখানে এখন বেস্ট সেলার হচ্ছে: 'কেমন করে একলা থাকতে হয়', 'হ্যাণ্ডবুক অফ সিংগলস্', 'যারা ভাগ্যবান তারা সিংগলস্', 'মনের মতন স্পাউস না পেলে একলা থাকা ঢের ভাল'। এই স্পাউস কথাটার বাংলা ঠিক জানা নেই—যা স্বামী অথবা স্ত্রীকে বোঝাবে।"

অনুরাধা বললো, "এ-জাতের প্রাণশক্তিই অন্যরকম। সাবালক অথবা সাবালিকা হওয়ামাত্রই বাবা-মায়ের সংসার ত্যাগ করে নিজের ডেরা বাঁধলো। মায়ের অ্যাপ্রন-দড়িতে বাঁধা পুরুষ ও রমণীকে এই সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে। আমার বান্ধবী পেগি ওয়ারেন, উইক এণ্ডে মায়ের সঙ্গে লম্বা টেলিফোনবার্তায় বয়ফ্রেণ্ডের সব বিবরণ দিতো বলে পুরুষবন্ধুটি হাতছাড়া হয়ে গেলো। নিজের ভবিষ্যৎ স্বামী সংগ্রহে বেশি মন না দিয়ে যে-যুবতী মায়ের সঙ্গে কথা বলায় বেশি গুরুত্ব দেয় তার কিছু গোলমাল আছে—তার ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় পর-নির্ভরশীল। পেগি ওয়ারেন কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে বলে, ভারতীয় ছেলে-

মেয়েদের ভাগ্য খুব ভাল—মাকে ভালবাসলে সবাই ভাল বলে, কেউ কোনো সন্দেহ করে না।"

"অনুরাধা, এই একলা-দোকলার ব্যাপারটা আমাকে ভাল করে বোঝাও।"

অনুরাধা বললো, "এসব এখন যে-কোনো বই খুললে পেয়ে যাবেন। আমরা পড়ি বার্কারের বই. সেই সঙ্গে লিওনার্ড কারগ্যান ও ম্যাথু মেলতোর গবেষণা। আপনি দেখবেন, পঞ্চাশের দশকে এদেশে ছিল পারিবারিক বন্ধনের বন্দনা—ফ্যামিলির জয়গান সবত্র। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যে পারিবারিক ইউনিট তাকেই বিজয়ীর আসনে বসানো হতো। ষাটের দশক হলো প্রতিবাদের দশক—কিছু একটা প্রতিবাদ জানাতেই হবে। সত্তরের দশক হলো—নিজেকে সামলাও নিজের কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো—স্পাউস, সন্তান, ওসব তো তুমি ভাল থাকলে তবে। দরকার হলে রাজনৈতিক মত বদলাও, চাকরি বদলাও, স্পাউস বদলাও—কাউকে তো দাসখত লিখে দাওনি যে সারা জন্ম ক্রীতদাসত্ব করতে হবে। একলা হও—ওটা ভাবনার কিছু নয়। সেই ব্যাপারটাই চলছে, একলা থাকার ভয় ভেঙে গিয়েছে জাতটার। এইভাবে চললে, যারা একলা থাকবে তারাই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে—দোকানদাররা সেই বুঝে টুথপেস্ট, সাবান, ফুড প্যাকের সাইজ নির্ধারণ করবে, ফ্যামিলি সাইজ অথবা জাম্বো প্যাকিং-এর যুগ চিরকাল থাকবে না তা কোম্পানিরা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে।"

"এই একলারা কারা?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

অনুরাধা বললো, "চারটে প্রধান ভাগ। যারা একেবারেই বিয়ে করেনি—যেমন পিটার ওয়াকার। এদের মধ্যে অনেকেই ভীষণ উচ্চাভিলাষী—নিজের লেখাপড়ার স্বপ্ন, নিজের কেরিয়ারের স্বপ্ন সফল না-করে এরা কোনোপ্রকার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। এদেরই একজন রসিকতা করে আমাকে বলেছিল, আপাতত ধরে নাও, আমার গাড়িটাই আমার ওয়াইফ—গাড়ির সঙ্গেই বিবাহ হয়েছে আমার।"

"দু' নম্বর : যারা আদালতের হুকুমে একলা হয়ে পড়েছে। এদের একবার কিংবা একাধিকবার বিয়ে হয়েছে। তারপর বিয়ে ভেঙেছে, একলা হয়ে পড়েছে। আমার হোস্টেলে জুডিথ বলে একটি মেয়ে এসেছে। জুডিথের স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে চলে গিয়েছে। প্রথমে মনোকষ্ট ছিল, এখন ওসব কাটিয়ে জুডিথ খুব কর্মচঞ্চল। নতুন করে পড়াশোনায় মন দিয়েছে।"

"তৃতীয় নম্বর : ভগবান যাঁদের ওপর খাঁড়া মেরেছেন। যাঁদের স্বামী অথবা স্ত্রী অসুখে অথবা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। কম বয়সের অথবা বেশি বয়সের মানুষ দু-ই পাবেন এই দলে। একাকিত্বের ওপর কলকাতায় কাজ করতে গিয়ে পেগি ওয়ারেন এই ধরনের মানুষই বেশি দেখেছে। অনেকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হয়েছে। পেগি পরে এই বিষয়ে বই লিখবে। পেগি বলেছে, তোমাদের দেশে মৃতদারদের থেকে বিধবারা অনেক শক্ত। যদিও ভাগ্যবানের বউ মরে কথাটা কেন জনপ্রিয় তা সে বোঝে না। এ-বিষয়ে সুশোভনবাবুর একটা গল্প আছে, এবারেই পেগিকে বলছিলেন।"

"চার নম্বর : যেখানে দু'পক্ষই একলা—কিন্তু মাঝে-মাঝে ঘর সংসার এক হয়ে যায়। এল-টি-এ কথাটা এদেশে প্রায়ই শুনবেন।"

আমি বললাম, "এল-টি-এ কথাটা আমাদের দেশেও ইদানীং ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অফিসে, কারখানায়, ট্রেনে, হোটেলে সব জায়গায় শুনবেন এল-টি-এ সম্বন্ধে গুঞ্জন।"

পিটার ওয়াকার সেই শুনে উৎসাহ প্রকাশ করলো, "আমি জানতাম। পেগি ও অনুরাধাকে বারবার বলেছি, ভারতবর্ষেও যথাসময়ে এল-টি-এ আসবে। অথচ অনুরাধা আমার কথা শুনে ভীষণ বিরক্ত হলো। বললো, ওইসব নোংরা জিনিস কখনও ভারতবর্ষে জনপ্রিয় হবে না। তার উত্তরে ডক্টর বাগচী বললেন, বাংলায় ধনীদের মধ্যে পয়সা দিয়ে রক্ষিতা রাখার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে—কিন্তু দুটি ছেলে-মেয়ে

বিয়ে না করে সমান-সমান পয়সা ফেলে একসঙ্গে একই ঘরে আছে, এমন ব্যবস্থা ওই ধনীরাও মেনে নেবেন না, বলবেন দেশ ধ্বংস হলো।”

আমি দেখলাম অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। বললাম, 'এল-টি-এ আরম্ভ হয়েছিল বেসরকারী ব্যবস্থায়, এখন সরকারও মেনে নিয়েছেন দরাজ হাতে। ব্যাপারটা নিজেদের কর্মীদের মধ্যেও চালু করে দিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত স্বামী, স্ত্রী এবং ১৮ বছর না-হওয়া পর্যন্ত পুত্র কন্যা এর আওতায় পড়ে।”

পিটার আরও আশ্চর্য! “বলো কি! এখানে আঠারো বছরের পরে এল-টি-এ, ইণ্ডিয়া তাহলে আরও সুবিধে করে দিয়েছে।”

“আমাদের ওখানে এল-টি-এ সুবিধের জন্যে রসিদ জমা করতে হয়—জানাতে হয় কোথায় গিয়েছিলে, কোথায় থেকেছিলে!”

“মানে? সরকার এই প্রথাকে জনপ্রিয় করার জন্যে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন!” পিটার বিস্মিত।

“আপনি কোন এল-টি-এ-র কথা বলছেন?” অনুরাধা এবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

“লিভ-ট্রাভেল-অ্যাসিসটেন্স—বছরে একবার, কোথাও কোথাও তিন বছরে একবার ছুটিতে দেশে বেড়াতে যাবার আয়করমুক্ত খরচ—এল-টি-এ!”

অনুরাধা ও পিটার খুব হাসাহাসি করলো। “এখানকার এল-টি-এ একেবারে অন্যরকম। লিভিং টুগেদার অ্যারেঞ্জমেন্ট—পুরুষমানুষ-মেয়েমানুষ একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকলো, বিয়ে-থার হাঙ্গামায় না গিয়ে। বন্ধনহীন মিলন বলতে পারেন—আইন-আদালত, ডাইভোর্স, খোরপোষ এসবের কোনো হাঙ্গামা নেই। যখন মন চাইবে না তখন তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে যাও। ক'দিনের সংসারটাকে ট্রেনের প্রতীক্ষা গৃহের স্টাইলে চালানো আর কি!”

পেগি জানতে চাইছিল, ভারতীয় বিধবার সংখ্যা কত? আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

"ওসব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে স্বদেশে কারও মাথাব্যথা নেই। কোন ইলেকশনে কে কত ভোট পেয়েছে, কোন টেস্ট ম্যাচে কে কোন রেকর্ড রান তুলেছে, এসবের হিসেব রাখতেই ভারতবর্ষের সব শিক্ষিত লোক হিমশিম খাচ্ছে। তবে পালাপার্বণে আমি যখন গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরি পার হই তখন মনে হয় বিধবারা সংখ্যাহীন। এঁদের সুখ দুঃখ নিঃসঙ্গতা আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা হয় না।"

অনুরাধা জানালো, "এদেশে প্রতি তিনটের মধ্যে দুটো বিয়েই যেমনি ডাইভোর্স কোর্টে যাচ্ছে, তেমনি বিধবার সংখ্যাও অবহেলা করবার নয়। এক কোটির বেশি বিধবা পাবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর প্রতি পাঁচজন বিধবা পিছু একজন মৃতদার।"

পিটারের মা সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন। পিটার বললো, "তুমি শুনে খুশী হবে, মা ৬৫ বছর বয়সে এখন এক ইস্কুলে কোর্স নিচ্ছেন। ওখানে পাঠ্যক্রমের নাম: 'আপনি নিজেই কী করে আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন'।"

এই এক অদ্ভুত দেশ। এখানে বেদান্ত, ইসলাম, ঈশ্বরানুরাগ থেকে শুরু করে টাকে চুল না গজালে যে-বেদনায় আপনি অভিভূত হতে পারেন তার থেকে কী করে কাটিয়ে উঠবেন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে শিক্ষাক্রম রয়েছে। সারা দেশটাই সারাক্ষণ ধরে কিছু না কিছু শিখছে—রান্নাবান্না, ঘর সাজানো, কুকুরের সাইকোলজি, বেড়ালের ফিজিওলজি, ফুল ফোটানো, স্বামীকে বশে রাখা, মেদ নিরোধ, সবরকম বিষয়ে ক্লাশ চলেছে প্রতি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়।

অনুরাধার ডরমিটরিতে বুক ফুলিয়েই চলে এলাম। এখানকার মহিলা হোস্টেলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ নয়।

প্রথমে আমার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। অনুরাধা বললো, "এই কথা শুনলে লোকে এখানে হাসবে।"

দরজার গোড়ায় একটি সুদর্শনা ২৬।২৭-এর স্বর্ণকেশী দাঁড়িয়েছিল। অনুরাধা আলাপ করিয়ে দিলো।

স্বর্ণকেশীর মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠলো। সে বললো, "এ-দেশে হ্যাভ এ গুড্ টাইম।"

স্বর্ণকেশী এবার তার পাঁচ-ছ' বছরের কন্যার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে বললো, "সুযোগ পেলে একবার অবশ্যই ইণ্ডিয়ায় যাবো, আমি দ্য গ্রেট হিমালয়াজ দেখতে চাই। আমি কাঠমাণ্ডুও যাবো।"

কাঠমাণ্ডু যে ইণ্ডিয়া নয় তা বিনীতভাবে মনে করিয়ে দিতে হলো।

এবার অনুরাধা আমার জন্যে চটপট কফি বানালো এবং পরিবেশন করলো কাগজের কাপে। বললো, "এই মস্ত সুবিধে এখানে। কাগজের কাপ ডিশ বাটি সব পাবেন, ব্যবহার করে ফেলে দিলেই হলো, বাসন মাজবার হাঙ্গামা নেই—বিশেষ করে আমাদের যাদের যান্ত্রিক ঝি—'ডিশওয়াশার নেই।"

অনুরাধা বললো, "স্যালিকে দেখলেন তো। এখনও একবারও বিয়ে হয়নি। ওর মেয়েটি পাঁচ বছরের। এখানে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে।"

আমার তো মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে স্বদেশে কী হতো তা কল্পনা করতে পারি। এখানে কিন্তু এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তোমার মেয়ের বাবা কে তা খোঁজখবর করতে কোনো পাড়ার গৃহিণীর উৎসাহ নেই।

"ভাববেন না, মেয়েকে মানুষ করতেই স্যালি লংম্যান নিজের সব শক্তি ব্যয় করে। স্যালি এখানকার কলেজেও পড়ছে, সঙ্গে যেন একটা জীবন্ত ডল রয়েছে এই যা। হিমালয়েও উঠতে চায়, শুনলেন তো!"

এই ডলের লালন-পালনের জন্যে স্যালি খরচ পায় সরকার থেকে। এখানকার ওয়েলফেয়ার বিভাগ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সজাগ। বাপ দেখলো না বলে ছেলেমেয়ের আর্থিক অনটন হবে এই

অবস্থা এখানকার পুঁজিবাদী সমাজও বরদাস্ত করবে না।

অনুরাধার ফাইলে অনেক কাগজ। কয়েক শত পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে সে অধ্যাপক রোবিনসনের তৈরি প্রশ্নপত্র নিয়ে সঙ্গীহীন জীবন সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে।

"এরা এইসব অন্তরঙ্গ ও নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেয়?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুরাধা বললো, "সেইটাই আশ্চর্য দু'একজন অবশ্যই মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু অনেকেই খোলাখুলি কথাবার্তা বলে। কেউ-কেউ নিজের হাতে প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলে, কেউ-কেউ বলে যায়, আমরা লিখে নিই। আমরা অবশ্যই আগাম আশ্বাস দিই, আপনার নাম-ধাম কেউ জানবে না। আমরা চরিত্রে আগ্রহী নই, আমরা ঘটনায় আগ্রহী।

আমরা কী ধরনের সহযোগিতা পাই শুনলে অবাক হয়ে যাবেন প্রশ্নমালার একটি অংশ, দেহ মিলন সম্পর্কে। দশজনের মধ্যে ন'জন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া আমাদের আর একটি আলোচনা চক্র আছে, নাম 'এক্সচেঞ্জ' বা আদান-প্রদান। ওখানে বেশ কয়েকজন সিংগল আমরা প্রশ্নপত্র থেকে যে-সব ইঙ্গিত পাচ্ছি তা কতখানি নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করেন নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে।"

কেন ঘরসংসার না-করে একলা আছেন এর উত্তরে আমেরিকানরা কে কী বলেন তার কিছু নমুনা অনুরাধা আমাকে শুনিয়ে দিলো।

কেউ বলেন, "স্বনির্ভর হয়ে আছি, প্রাইভেসি পাচ্ছি, কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবো?"

একটি মেয়ে বলছে, "আমি বিয়ের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।" একজন ইহুদি ছোকরা স্পষ্ট লিখেছে, "বিবাহিত জীবনে বড্ড খরচা!" আর একজন লিখছে, "এই যে মেয়েরা আমার পিছনে তাড়া করছে, আমি তাদের কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, এই খেলায় নেশা ধরে গিয়েছে। বিয়ে হলেই তো সব স্বাধীনতা শেষ।"

অনুরাধার বান্ধবী পেগি তো সোজাসুজি বলে, "পুরুষরা বিয়ের পরেই ভীষণ একঘেয়ে হয়ে যায়।"

পিটার ওয়াকার বলে, "একাকিত্বের ফলে আমার ঘুম ভাল হয়। পড়াশোনায় এবং গবেষণায় মনঃসংযোগ হয়, তাছাড়া আমি নির্জনতা পছন্দ করি।"

পেগি বলে, "বিয়ে করিনি বলে আমি এলোমেলো থাকতে পারি, ঘরে আর একজন বসবাস করলেই সব কিছু সবসময় পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে।"

"তাছাড়া, যোগ্য পাত্র নির্বাচন করাও এক বিরাট ঝুঁকি—একটু ভুল হলেই তো ডাইভোর্স। যার সঙ্গে খুশি দেহমিলনের অবাধ সুযোগ রয়েছে, জন্মনিরোধক ওষুধপত্তর রয়েছে, শুধু-শুধু বিয়ের ঝামেলায় গিয়ে লাভ? কী এমন অভিজ্ঞতা আছে ওখানে, যা বিয়ের বাইরে পাওয়া যায় না? ইচ্ছে করলে গর্ভে সন্তানও পেতে পারি।"

আর এক মহিলা বলছেন, "পড়াশোনার চাপ খুব। আমাকে পরীক্ষায় ভাল করতে হবে। তার মানে, বাড়িতে ফিরে এসেও অন্তত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা লেখাপড়া, প্রতি শনি-রবিবারে আরও পড়াশোনা। বিয়ে হলে এসব মাথায় উঠতো। যদি কোনো উইক-এণ্ডে মন মেজাজ খারাপ হয় তাহলে পুরুষ বন্ধুদের কাউকে ফোন করি। পছন্দমতো কারও সঙ্গে বেরিয়ে যাই। প্রয়োজনে যৌন সংসর্গও করি। অথচ এইসব সম্পর্কের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি দায়দায়িত্ব নেই। স্বামীর যত্ন, রান্না-বান্না এবং বেবির ন্যাপকিন পরিষ্কারের বাইরেও পৃথিবীতে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে এবং কোথাও একটা দাগ রেখে যেতে হবে।"

পেগি বলে, "বিয়ে করা কেন দরকার তা এখনও কেউ আমাকে পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পারেনি! কেন একলা আছি? আরে! আমি তো সিংগল হয়েই পৃথিবীতে জন্মেছি, একলা থাকাটাই তো স্বাভাবিক।"

যারা একলা থাকতে চায় না তারাও যেসব কথা বলে তা অনুরাধা

শুনিয়ে দিলো। "কারও সঙ্গে সব সুখ সব দুঃখ ভাগ করে নেবার জন্যে মাঝে-মাঝে প্রাণটা ছটফট করে। কে আমাকে দেখবে অসুখ হলে? রাত্রিবেলায় বাড়িটাতে আর একটা মানুষ নেই ভাবলেই কেমন যেন কষ্ট হয়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে প্রতি সপ্তাহে কে এই ডেটিং-এর ব্যবস্থা করে বলো তো? শুক্রবারের রাতে উত্তেজনা না-থাকলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।"

অনুরাধা বললো, "ওই যে স্যালিকে দেখলেন, ওর মনোবৃত্তি একটু পৃথক। ওর সন্তানটি কোনো ভুলের ফলশ্রুতি নয়। ওর মা সারাজীবন স্বামীর হাতে নিগৃহীতা হয়েছিলেন। স্যালি খোলাখুলি বলতো, আমি বেবি চাই, কিন্তু স্বামী চাই না। পুরুষমানুষ সম্বন্ধে মায়ের অভিজ্ঞতা এতো তিক্ত হয়েছিল যে কোনো বিবাহিত পুরুষ দেখলেই বলতেন, ওই চলেছেন আর একটি শোষক ছারপোকা। মায়ের কাছ থেকে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী পেয়েছে স্যালি—প্রত্যেক জননীই শেষ পর্যন্ত সিংগল মাদার, কারণ সন্তান ধারণ ও পালনের সব বোঝা বিয়ে হলেও মাকেই বইতে হয়। পুরুষরা শুধু দেহসঙ্গমের মজা উপভোগ করে।"

অনুরাধার সামনের ঘরে যে-মেয়েটি থাকে তার নাম সুশান কেলি। বয়স ছাব্বিশ।

এই মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলে অনুরাধা বললো, "ডিসপ্লেসড হোমমেকার "

"সে আবার কী জিনিস?"

অনুরাধার সংযোজন, "এখন ডাইভোর্সি কথাটা আমেরিকায় কেউ পছন্দ করে না। ছিন্নমূল গৃহিণী কথাটা জনপ্রিয়।"

হঠাৎ সংসার ভাঙলে মানসিক অবস্থা অবশ্যই শোচনীয় হয়ে পড়ে, বিশেষ করে প্রথম বিচ্ছেদ ও ডাইভোর্সের মধ্যবর্তী সময়ে।

সুশান কেলি যখন এই অবস্থায় পড়েছিল তখন সে দিশেহারা। অথচ সে নিজেই একদিন বিরক্ত হয়ে স্বামীকে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে

বলেছিল। সেই অবস্থায় হঠাৎ মনে পড়লো অনেকদিন আগের প্রথম বয়ফ্রেণ্ডের কথা—যার দেহ-সান্নিধ্যে কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়ে সে প্রথম নারীত্বের উপলব্ধি পেয়েছিল। খোঁজখবর নিয়ে পুরনো বয়ফ্রেণ্ডকেই ফোন করলো সুশান। সেই ছেলেটি তখনও বিয়ে করেনি। বান্ধবীর আমন্ত্রণ পেয়ে সে এলো, কয়েকদিন তাকে সান্নিধ্যও দিলো। কিন্তু সুশান ক্রমশ বুঝতে পারলো, কুমারীত্ব উপহার দিয়েও এক সময় এই ছেলেটিকেই সে নাকচ করেছিল। যেসব কারণে এই বন্ধুটি নাকচ হয়েছিল সে কারণগুলো এখনও পাল্টায়নি। ততক্ষণে সুশান কিছুটা সামলে উঠেছে। ছেলেটিকে সে বিদায় দিযে স্বামীব সঙ্গে ডাইভোর্সের জন্যে তৈরি হলো তারপর এই শহরে সে চলে এসেছে—নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সুশান কেলি।

এই যে আচমকা ঘর-ভাঙার সময় জানাশোনা লোকের সান্নিধ্য কামনা এই মানসিকতার ওপরে বিখ্যাত আমেরিকান চলচ্চিত্র 'ওল্ড বয়ফ্রেণ্ড' তোলা হয়েছিল।

গল্পটা অনুরাধা সুন্দরভাবে বললো। ছবিটা কয়েক বছর আগে মাত্র তৈরি। নিজের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে ভীষণ মুষড়ে পড়লো কমবয়সী নায়িকা। দুঃখ ভুলবার জন্যে একসময় স্মৃতিচারণ আরম্ভ করলো এবং ভাবতে লাগলো কুমারী জীবনের পুরুষবন্ধুদের কথা। তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বের করলো নিজের কলেজ জীবনের ডাইরি। সেই পুরনো ডাইরি সম্বল করে সে বেরিয়ে পড়লো স্মৃতির উজান বেয়ে সেইসব বন্ধুর সন্ধানে যাদের সঙ্গে তার একদিন ভাব ও ভালবাসা হয়েছিল। তারপর অপূর্ব সব দৃশ্য। একজন বন্ধুর খবর নিতে গিয়ে নায়িকা জানলো সে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মারা গিযেছে। তারপব খোঁজ করলো আর একজনের। এই পুরুষবন্ধু বিযে কবেছিল, কিন্তু ডাইভোর্স হয়ে যায়। নিজের ছোট্ট মেয়েকে মানুষ করতে সে ব্যস্ত, তার অতীতের সব প্রাণশক্তি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হযেছে। তারপর দেখা হলো এক কলেজ প্রণয়িণীর সঙ্গে। সে একবার বিয়ে করেছিল, কিন্তু

বিয়ে টেঁকেনি। তারও একটি কমবয়সী শিশু—তাকে নিয়েই সিংগল পেরেণ্ট হিসেবে দিন কাটাচ্ছে। বইটা মিলনাত্মক—এইখানেই নিজেকে সমর্পণ করলো নায়িকা, নতুন করে সংসার গড়বার স্বপ্ন নিয়ে।"

আমি বললাম, "ভাগ্য ভাল, আমাদের ঘর এতো সহজে ভাঙে না।"

"তা এখন বোধ হয় আর বলতে পারা যায় না." অনুরাধার সাবধানবাণী। সূর্যকান্ত পট্টনায়ক বলে কটকের একটি ছেলে এখানে আছে। তার মেল অর্ডারে বিয়ে-করা বউ পদ্মাবতী এলো ওই কটক থেকে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। একেবারে দেশোয়ালী বউ, যাতে বাড়িতে ভারতীয় জীবনযাত্রা বহাল থাকে। সূর্যকান্ত বাইরে খুব আধুনিক, কিন্তু পদ্মাবতীকে রাখতে চায় সেকালের মতন।

দেড় বছর-দু' বছর ওইভাবেই কাটলো, কোনো অসুবিধা হলো না : স্বামীর পূর্ণ প্রভুত্ব মেনেই পদ্মাবতী জীবন চালালো। তারপর একদিন বিস্ফোরণ। এদেশের মুক্তির হাওয়া গায়ে লেগেছে পদ্মাবতীর। সে বললো, রইলো তোমার ঘরসংসার, আমি চললাম। পদ্মাবতী একজন দ্বিতীয় প্রজন্মের গ্রীক যুবকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

সূর্যকান্ত এমন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। প্রথম দিকে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, কারণ ঘরসংসার কিছুই শেখেনি। তারপর এক বন্ধুর পরামর্শে নিজের নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে কারখানায় স্পেশাল ডিউটি আওয়ার করে নিয়েছে, দুপুর দুটো থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করতে-করতেই সময় কেটে যায়। কাজকর্মের এই পিকুলিয়র সময়টাই সূর্যকান্তকে বিচ্ছেদের প্রথম ধাক্কা সামলে নিতে সাহায্য করেছে।

পদ্মাবতী যে-ছেলেটির আশ্রয় নিয়েছে তার বয়স পদ্মাবতীর থেকে কম।

"পাত্রের বয়স থেকে পাত্রী বড় হলে এখানে অসুবিধে হয় না? অনেক দেশেই তো ব্যাপারটা অবাঞ্ছনীয়।"

অনুরাধার উত্তর : "ইংলণ্ডে ব্যাপারটা বেশ চালু হয়ে গিয়েছে ;

বেশি বয়সের কনে এবং কম বয়সের বর এখন ডাল-ভাত। তার অবশ্য একটা কারণ আছে, ইংলণ্ডের আইবুড়ো বাজারে ২০ থেকে ২৪ বছরের মেয়ের তুলনায় হঠাৎ পুরুষের সংখ্যা কয়েক লাখ বেড়ে গিয়েছে। এখানেও হয়তো ওটাই ফ্যাশন হবে কিছুদিন পরে।"

এই পদ্মাবতীকে অনুরাধা ইন্টারভিউ করেছিল। সে অনুরোধ করেছিল, "আমাকে আমার মতন থাকতে দাও। মেয়েমানুষেরও যে নিজস্ব একটা জীবন আছে তা এই প্রথম আমি বুঝতে পারছি।"

শংকরদা তাঁর নোটে লিখছেন:

পেগি ও আমরা দু'জন কিছু কাগজপত্র নিয়ে পথের ধারের এক কাফেতে গিয়ে বসলাম। মুক্তির হাওয়া এখানকার রমণীদের শরীরে ও প্রকৃতিতে এনেছে ঝড়। ভাল না মন্দ তা বলার দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু এরা যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

ডেটিং মানেই বাধা-বন্ধনহীন দেহসংসর্গের উচ্ছৃঙ্খলতা এই কথাটা পেগি স্বীকার করলো না। তার বক্তব্য: "আজই একটি মেয়ের সাক্ষাৎকার নিয়ে এলাম। সে বললো, আমার পুরনো বয়ফ্রেণ্ড আলাপের প্রথম দিন থেকেই দেহ সংসর্গের জন্যে ছটফট করতো। আমি ব্যাপারটায় অস্বস্তি বোধ করেছি। কিন্তু এখন যার সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াই সে অন্য রকম। ছ'বার আমরা একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়েছি। শিল্প, সাহিত্য, থিয়েটার, রাজনীতি, নানা বিষয়ে আমরা তপ্ত আলোচনা করেছি, কিন্তু বন্ধুটি এখনও আমার ব্লাউজের একটা বোতামেও হাত দেয়নি!"

"এখানকার পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে কী খুঁজে বেড়ায়?" আমি প্রশ্ন করেছি।

পেগি হাসলো। "পুরনো সব মিথ ভেঙে গিয়েছে। আমাদের

পড়ার বইতে লেখা থাকতো, প্রথম দর্শনে পুরুষ সন্ধান করে রমণীর দেহসৌন্দর্য, আর নারী সন্ধান করে ব্যক্তিত্ব। কথাটা ঠিক মনে হয় না। যেসব মেয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলি তারা অকপটে স্বীকার করেছে, ব্যক্তিত্ব ছাড়ো, পুরুষের দেহসৌন্দর্যই আমাদের সবচেয়ে বেশী টানে!"

এক সিংগল মহিলা পেগিকে বলেছেন, "বিয়ে ব্যাপারটাই একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠছে। বিয়ে মানেই হলো, যাকে আদৌ সন্তুষ্ট করা যাবে না এমন একজন মানুষকে সন্তুষ্ট করার সামাহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বিয়ের মধ্যে কী এমন আছে যা বিয়ের বাইরে পাওয়া যায় না? সিংগল মানেই তো স্বাধীনতা। এই দেখো, সারাদিন কাজকর্ম করে আমি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আমার যা ইচ্ছে করার এবং যা ইচ্ছে না-করার দুর্লভ সুখ ভোগ করছি। উইক এণ্ডে কারও মানসিক ও শারীরিক সান্নিধ্য আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু বিয়ে করে ফেলেছি, প্রতি রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে আমি একই লোককে দেখছি, দু'জনের রান্নার দায়িত্ব নিচ্ছি, ডবল এঁটো বাসন মাজছি, এই ধরনের চিন্তা আমার পক্ষে খুব সুখের নয়।"

পেগি জানালো, "আর একটি মেয়ে আমাকে বলেছে, সে যখন শেষ পর্যন্ত কাউকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করবে, তখন সে একটা পার্টি দেবে এবং সেখানে নেমন্তন্ন করবে সমস্ত পুরনো পুরুষবন্ধুদের। তারপর সে খুঁটিয়ে দেখবে, হবু বরের ওপর কীরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যদি খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় তা হলে তাকে বিয়ে করবে না।"

"ওই এল-টি-এ সম্বন্ধে কিছু বলো", অনুরাধাকে আমার অনুরোধ।

পেগির বক্তব্য: "এতে ক্ষতিটা কি, শংকর? এদেশের লাখ-লাখ পুরুষ ও নারী তো ভুল করতে পারে না। সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিয়েটাই যে শ্রেষ্ঠ তা এখন আর কোনোক্রমেই ভাবা যাচ্ছে না। সমাজতত্ত্বের আধুনিক বইতে তুমি দেখবে বিয়ে তোমাকে অধিকার দেয়— সেক্সে, সম্পত্তিতে, উত্তরাধিকারে, বংশবৃদ্ধিতে। সেই সঙ্গে তোমার পাওনা কিছু ট্যাক্সের সুবিধে এবং নেওয়ার আছে কিছু বৈবাহিকদায়িত্ব।

উকিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলে, সেক্স ছাড়া সব ব্যাপারেই তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। বছরের পর বছর বিয়ে না-করেই একসঙ্গে আছো, তারপর হঠাৎ কেউ মারা গেলো, তার ওয়ারিশনরা এসে ব্যাংকের, জীবনবীমার সব টাকা নিয়ে নিলো, তোমাকে ভিটেমাটি ছাড়া করলো, এর থেকে বাঁচার পথও বেরিয়েছে। বিয়ে না-করে একত্র বসবাসের সময় ছু'জনে ছু'জনের নামে পাল্টা উইল করো—সব ঠিক থাকবে, অঘটন ঘটলে সম্পত্তির দিকে বাইরের কেউ নজর দিতে পারবে না।"

"সরকারী টাকা-পয়সা? বিয়ে না করলেই বেশি সুবিধে।" পেগির এই কথা সমর্থন করলো অনুরাধা।

এদেশের দাম্পত্য সম্পর্কে টাকার খেলটা কম নয়, তা আমি সহজেই আন্দাজ করেছি। টাকাকড়ির সমস্যা না-থাকলে এদেশে আরও অনেক বেশী ডাইভোর্স হতো। তাছাড়া মিসেস মলিনা রোবিনসন সেদিন পরামর্শ দিলেন, "বিদেশে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে কী করতে হয় এ-বিষয়ে একটা ছোট পুস্তিকা বাংলায় লিখুন। তাতে বলবেন, এখানকার আদালত অনেক সময়ে অন্য দেশের বিয়েতে নাক গলাতে দ্বিধা করে। যারা এ-দেশের ছেলে বিয়ে করবে তারা যেন অবশ্যই এদেশে বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন করায়। তা হলে, ভগবান করুন, বিয়ে ভাঙবার অবস্থা হলে স্ত্রী অনেক বেশী আথিক সুবিধে পাবে।"

পেগি বললো, "শুনুন, এক মধ্য-বয়সিনী ইতালীয় মহিলার কথা। তিনি লিভিং-টুগেদার ব্যবস্থা করেছেন বব-এর সঙ্গে। কেন ববকে বিয়ে করছেন না জানতে চাইলে আমাকে বোঝালেন, পয়সার দিক থেকে এইটাই তো ভাল। আমি রেজিস্টার্ড বিধবা হিসেবে সরকারী অনুদান পাচ্ছি শ' পাঁচেক ডলার। বব মানুষটি খুউব সুইট, কিন্তু রোজগারপাতি তত নেই। আমি জানি, ও আমাকে কখনও পাঁচশ ডলার হাতে তুলে দিতে পারবে না, অথচ বিয়ে হলেই বিধবা ভাতা বন্ধ হবে। তার থেকে আমরা এখন যেমন আছি, তেমন থাকা মন্দ কী? বিয়ে না-করেই তো বিবাহিত জীবনের দেহসুখ, মানসিক সুখ আমরা উপভোগ করছি।"

আমি একই সঙ্গে ওগ্লাবিবিতলা লেনের জীবনের কথা ভাবছি। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সব গুলিয়ে যাচ্ছে, সুশোভন। আমাদের কোন পথে চলা উচিত তা ঠিক করা বেশ শক্ত হয়ে উঠছে।

আমি জানি, এবার তুমি কী উত্তর দেবে। তুমি বলবে, "এইসব সিদ্ধান্ত কে নেবে? অপরেশবাবুদের মতন পুরুষরা? না, মিনতির মতন মহিলারা মুক্তির স্বাদ পাবার পরে স্থির করবেন কোনটা গ্রহণীয় এবং কোনটা বর্জনীয়?"

এসব তর্ক তোলা থাকছে তোমার সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎ-কারের জন্যে। এখন আমি খোঁজখবর করছি, সুখ বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে?

অনুরাধা মেয়েটির বুদ্ধি বেশ পরিণত, বয়সের তুলনায় সে এদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো ভালই বোঝে। সে মৃদু হেসে বললো, "যে সয় সে রয় কথাটা এদেশে অচল, শংকরদা।"

আর পেগি বলে বসলো, "সুখের কথাটা তোলার আগে আমরা খোঁজ করছি, বিয়ের স্পেশাল সুবিধে কি কি এ-সম্বন্ধে একলা অথবা দোকলাদের কী ধারণা? অনুরাধা এবং আমার এই ফাইলগুলো এবং কিছু বই ঘাঁটলে দেখবে, বিবাহবন্ধনে যে-সুখগুলো মানুষ প্রত্যাশা করে তা সেক্স নয়, অর্থ নয়। একজন বলেছে, 'বিয়ের মস্ত সুবিধে এমন একজন থাকবে যার সঙ্গে জীবনের ভাল-মন্দ দুই ভাগ করে নিতে পারবো।' আর একজন বলছে, 'বিয়ে না-করলে প্রতিদিন বাড়ি ফিরে এসে একজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে না।' আর একজনের মতে, 'বিয়েটা হচ্ছে সান্নিধ্য, কারুর সঙ্গে মিলেমিশে পরামর্শ করে ছোট-বড় সিদ্ধান্তগুলো নেবার সুযোগ'।"

'যাকে তুমি ভালবাস তার সঙ্গে নিজের জীবনটা ভাগ করে নেওয়ার সুবিধে।' বলছেন আর একজন।

আর একটি মহিলা (পাঁচ সন্তানের জননী) বলছেন, 'বিয়ে মানে হচ্ছে ভালবাসা এবং ঘর-আলো-করা শিশুদের পৃথিবীতে আনা।

সেইসঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ করে নেওয়া এবং মিলেমিশে কাজ করা।"

অনুরাধা বললো, "মজার ব্যাপার দেখবেন, এখানকার বিয়েতে ভাত-কাপড়ের কথা, শরীরের দেনা-পাওনার কথা উঠছেই না। এসব প্রচুর পাওয়া যায় এখানে, মেয়েরা ওসবের জন্যে স্বামীর ঘর করতে চায় না।"

পেগি বললো, "এইবার হ্যাপিনেসের কথায় আসুন। এখানে প্রথম কথা হলো, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। ভুল সঙ্গীর সঙ্গে জীবনটা নষ্ট করার চেয়ে একলা থাকা ঢের ভাল, এই হচ্ছে এখানকার সামাজিক দর্শন "

পেগি আচমকা অনুবোধ করলো, "দিন না একটা চমৎকার ভারতীয় শিশু। দেশে ওরা কত কষ্ট পাচ্ছে। আমি নিজের মনের মতন একটি শিশুকে মানুষ করবো। আমার অনেক বান্ধবী বলছে, একটা সন্তান জোগাড় করতে পারলে বিয়ের হাঙ্গামায় তাদের জড়াতে হবে না। সবসময় যে নিজের শরীর থেকেই সন্তানের উৎপত্তি হতে হবে তার কোনো মানে নেই।"

আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার বাড়ির সামনেই অসহায় মায়েদের বেশ কয়েকটি করে শিশু আছে—কিন্তু মায়েরা দিশেহারা, তাদের চিন্তা কোথা থেকে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও খাদ্য আসবে?

অনুরাধা বললো, "ওই যে আমাদের দেশে বলে, সুখ হাওয়ার মতন, বইলে বোঝা যায়, কিন্তু দেখা যায় না—একথা এখানে কেউ বিশ্বাস করে না। অন্য বহু জিনিসের মতন সুখকে ওজন করার, মাপবার একটা মান এদেশের পণ্ডিতসমাজে নির্ধারিত হয়েছে। সুখের মধ্যে দশটা ভাগ রয়েছে আমাদের অধ্যাপকদের মতে। আমরা সেই অনুযায়ী নিঃসঙ্গ মানুষদের জিজ্ঞেস করি, তুমি কি (১) ভীষণ সুখী (২) মাঝামাঝি সুখী (৩) সুখীও নয় দুঃখীও নয় (৪) একটু অসুখী (৫) ভীষণভাবে দুঃখী। উত্তরে বেশির ভাগ লোকে বলে, সে মাঝামাঝি সুখী। তারপরের দলেই রয়েছে ভীষণ সুখীরা। শতকরা দু'জন লোকও

স্বীকার করে না সে ভীষণ অসুখী। তুমি জীবন থেকে যথেষ্ট মজা পাচ্ছো তো? এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা আশিজন উত্তর দেয়—অবশ্যই পাচ্ছি।"

"কিন্তু সুখটা মাপা যায় কী করে?"

অনুরাধা বললো. "ডঃ বাগচী আপনাকে বলবেন, যারা জানেই না সুখ কাকে বলে, যেমন আমাদের দেশের মেয়েরা, তারা এ-প্রশ্নের উত্তর দিতেই পারবে না। কিন্তু এখানে অন্যরকম। ওই যে দশ দফা মাপ বলছিলাম, সেগুলো এইরকম:

সুখের এক নম্বরে রয়েছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই সুখ, তা শতকরা আশিজন আমেরিকান হাড়ে-হাড়ে বুঝে নিয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে এদেশের গ্রামেগঞ্জে তাই এতো মাতামাতি। স্বাস্থ্য না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? দেহসৌন্দর্য স্বাস্থ্যেরই একটা অঙ্গ। কুঁড়েমি করে, বেশী খেয়ে, ওজন বাড়িয়ে বেঢপ হয়ে যেও না। মোটা শরীর নিয়ে হঠাৎ সঙ্গী সন্ধানের প্রচেষ্টায় নামতে হলে খুব অসুবিধে হবে।

দু' নম্বর সুখ: বৈবাহিক অবস্থা। বিয়েটা ঠিক জুৎসই না হলে যতক্ষণ বিয়ে না ভাঙছে ততক্ষণ দুশ্চিন্তা।

তিন নম্বর: ছেলেমেয়ে। কিন্তু আমাদের মায়েদের মতন নয়—সন্তানের সুখদুঃখই তো তাঁদের একমাত্র সুখদুঃখ।

চার নম্বর: বন্ধুবান্ধব।

পাঁচ নম্বর: 'লাভ'—বাংলায় যাকে ভালবাসা বলে চালানো হয়।

ছ' নম্বর: সেক্স—এই ব্যাপারটির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়—সে কপালে সিঁদুর থাকুক আর না-থাকুক।

সাত নম্বর: আত্মোন্নতি। সবাই এ-ব্যাপারে খুব সজাগ হয়ে উঠছে। ছেলেপুলের কাঁথা কাচা এবং স্বামী-সেবার জন্যে মেয়েরা এ-পৃথিবীতে আসেনি, বলছে মেয়েরা। চাই আত্মোন্নয়ন।

আরও তিনটি বিষয় হলো—সাফল্য, ধর্ম এবং সমাজের জন্য কিছু করা। ধর্মকর্মে আকর্ষণ ক্রমশই কমছে, প্রায় শেষ স্থানে চলে এসেছে।

আর সমাজের জন্যে, মানুষের জন্যে কী করে গেলাম এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে কে সময় নষ্ট করে? আমাদের ডেটিং আছে, উইক এণ্ড আছে, আমাদের শরীরের এবং মনের সাধ-আহ্লাদ আছে। ওসব মিটলে তবে তো সমাজ!"

সুখকে যে হিসেবের মধ্যে আনা যায় তা এইখানে এসেই শিখলাম, সুশোভনবাবু।

দুপুরের দিকে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খুব মজা হলো। একটি ভারতীয় পদ অর্ডার দিয়েছিলাম। যে-মহিলাটি খাবারের অর্ডার নিচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন—"মাইল্ড, মিডিয়াম, না সুইসাইড?"

আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। তখন অনুরাধা বুঝিয়ে দিলো, "ঝালের মাত্রা জানতে চাইছে—কম, মাঝারি না সুইসাইড।"

আমি সাহস করে একটা সুইসাইড অর্ডার দিয়ে বসলাম! চোখের জলে যখন নাস্তানাবুদ হচ্ছি তখন সুশোভন সম্বন্ধেও কিছুটা কথাবার্তা হলো।

আমি সুশোভন বাগচী সেই থেকে ভাবছি শংকরদাকে আমিও একটা লম্বা চিঠি লিখে বসি। দেশের লোকের মুখোমুখি বসে সব কথা সোজাসুজি বলা যায় না।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, শংকরদা,

সেই থেকেই ভাবছি, মানুষের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে তিনটি দামী কথা আপনি অনুরাধার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে পেয়ে গিয়েছেন—মাইল্ড, মিডিয়াম, সুইসাইড। স্বদেশী সমস্ত মধ্যবিত্তপুঙ্গব ওই তৃতীয় শ্রেণীর—তাদের ভাগ্য ভাল, ভারতীয় মেয়েরা বড্ড মাইল্ড।

এখানে এসে মাইল্ড লঙ্কাও কিন্তু হঠাৎ ঝাল হয়ে যায়। আমি

বুঝতে পারছি না, সূর্যকান্ত ও পদ্মাবতীর ঘটনাটা শুনলেও আপনি প্রমীলা রায়ের খবরটা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন কি না।

প্রমীলাও মাটির মানুষ ছিল. আর তার স্বামীদেবতা অমরনাথ রায় দুর্ধর্ষ এক বাঙালী মধ্যবিত্ত পুরুষ। বিয়ের সময় অনেক টাকা আদায় করেছিল ডাউরি হিসেবে—হাজার হোক ডলারের রোজগার তো। তারপরেও ভাবটা ছিল, বিয়ে করে ধন্য করে দিয়েছি তোমায়। ঐ যে চাতরা শ্রীরামপুর থেকে এই সায়েবদের দেশে আসতে পেরেছো এ-জন্য নিজেকে এবং আমার সাতপুরুষকে ধন্যবাদ দাও।

কিন্তু মার্কিন মুলুকে এসে তুমি চাকরিও করো, সংসারও সামলাও এবং বাকি সময়টুকু স্বামীদেবতার সেবা করো এবং সারাক্ষণ তাঁর খিটখিটিনি শোনো। গোড়ার দিকে প্রমীলা এতোই মাটির মানুষ ছিল যে সব চাপ মুখ বুজে সহ্য করতো। অপরের সামনেও স্বামীর স্ত্রীসম্পর্কিত বক্তৃতা শুরু হলেও মুখ টিপে মিটিমিটি হাসতো।

অমরনাথ ধরে নিয়েছিল এটাও বাংলাদেশ, যেহেতু সে বাঙালী মেয়ে নিয়ে এসেছে সেই চাতরা শ্রীরামপুর থেকে। দিন-রাত খাওয়া এবং আড্ডা দেওয়া ছাড়া জাত-বাঙালীরা এদেশেও আর কোনো আনন্দের খবর রাখে না। বড়জোর তার সঙ্গে একটু পরনিন্দার চাটনি—কার কি করা উচিত ছিল কিন্তু করেনি সে সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অমরনাথ তো এখানেও একটা বাঙালী ঘেটো তৈরির তালে ছিল।

তারপর একদিন অমরবাবুর মোহভঙ্গের মুহূর্ত এলো। বাড়িতে ফিরে এসে সে স্ত্রীর চিঠি পেলো, "আমি চললাম। যথেষ্ট হয়েছে, আমি তো তোমার মনের মতন হতে পারিনি, এবার বেস্ট অফ লাক।"

স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে প্রমীলা প্রথমে উঠেছিল এক অ্যাপার্টমেন্টে। তারপর একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। মনের মতন ছেলে, একবার মেমসাহেবের ডাইভোর্সের ঝাঁটা খেয়ে মেয়েদের মূল্য বুঝতে শিখেছে। প্রমীলা সময়মতন ওকেই বিয়ে করবে।

কিন্তু মজা হয়েছে ওই অমরনাথ রায়কে নিয়ে। প্রমীলার সঙ্গে

তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। অমরনাথ জানে আর একজন পুরুষকে প্রমীলা বিয়ে করতে চলেছে, তবু সময়ে-অসময়ে ফোন করবে উকে [illegible] মুশকিল বেচারা প্রমীলার। প্রাক্তন স্বামী কোন [illegible] বে না— সব ব্যাপারে উপদেশ চাইবে, পরামর্শ চাইবে

প্রমীলা বলছিল, "কী করি বলুন তো দাদা?"

আমার পরামর্শ: "ফোন নামিয়ে দেবে, বলবে আমার সময় নেই।"

কিন্তু প্রমীলা বেচারা পারে না, মন খারাপ করে ফেলে। আমি উপদেশ দিই, "এরকম হবার কোনো কারণ নেই। বরং বঙ্গপুঙ্গবকে জিজ্ঞেস করা উচিত তোমার—বছরের পর বছর যখন চ্যাটাং-চ্যাটাং [illegible] দিয়ে জীবন অসহ্য করে তুলেছিলে তখন কোথায় ছিল তোমার এই বিনয়?"

এখন যা ভয়ে-ভয়ে অমরনাথ সকালে ফোন করে। প্রাক্তন ওয়াইফকে গুড মর্নিং জানায়, ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়। জিজ্ঞেস করে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? তারপর নিজের ব্যাপারে পরামর্শ চায়। আমি প্রমীলাকে বলেছি, "টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালী—শিরদাঁড়া বলে শুধু কিছু নেই, কিন্তু নিরাপদ অবস্থায় থাকলে প্রচুর গলার আওয়াজ আছে। এরা যদি বউয়ের দ্বিতীয় বিয়েতে বরযাত্রী যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে তা হলেও অবাক হবার নয়।"

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যদি প্রতি মাসে কয়েক ডজন মেয়ের স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার ঘটনা ঘটতে থাকে এবং কাগজে যদি একটু প্রচার হয় তা হলে বাঙালী পুরুষের স্বভাব খুব সামান্য সময়ের মধ্যে পাল্টে যাবে। অসহায় গৃহবধূর আত্মহত্যা ঠ্যাঁদড় বাঙালী পুরুষের পক্ষে হজ নো ওষুধ।

প্রমীলা কিন্তু মনের মধ্যে কোনো তিক্ততা পুষে রাখেনি। প্রাক্তন স্বামীর স্পেশাল উৎসাহে মাঝে-মাঝে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে নতুন বন্ধুর কাছে।

আমি প্রমীলাকে বলেছি, "তুমি যেভাবে এগচ্ছো তাতে শেষ পর্যন্ত

একটা ছোট গল্পের বিষয় হয়ে উঠবে। হয়তো ভূতপূর্ব প্রভুকে এমন ভূতলশায়ী হতে দেখে করুণার বশবর্তী হয়ে তুমিই বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর একটি শান্ত, গৃহকর্মনিপুণা, প্রকৃত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী বাঙালী মেয়েকে ভূতপূর্ব স্বামীর জন্যে নির্বাচিত করবে! বাংলা সিনেমাওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে গল্পটা অবশ্য আরও পাল্টে যাবে! ওরা তো একই নারীর জীবনে দুটি পুরুষের ভূমিকা সামলাতে পারবে না। ওরা দেখাবে, যাকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করা হলো সে ছদ্মবেশিনী তুমিই। তারপর চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, কোকিল ভুল করে মাঝরাতে গান গেয়ে উঠবে, আর অমরনাথ রায় বোকা-বোকা হাসিতে মুখ ভরিয়ে পিছন থেকে তোমার হাত দুটো আলতো করে ধরে বলবে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি, প্রমীলাসুন্দরী। আমি এবার থেকে তোমার যোগ্য হাজবেণ্ড হয়ে ওঠবার জন্যে সবরকম মেহনত করবো।”

পরের কথা পরের জন্যেই তোলা থাক, শংকরদা। জানতে ইচ্ছে হয় অনুরাধার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কী আলোচনা করলেন আপনারা?

আপনি নিশ্চয় এতোক্ষণে স্থানীয় বাঙালী মহলে শুনেছেন, আমি একটু বেয়াড়া প্রকৃতির মানুষ। এখানকার বাঙালীবাবুরা আমার আদব-কায়দা, ভাবনা-চিন্তা, কথাবার্তা বরদাস্ত করেন না। আর বাঙালী মহিলাদের প্রতি আমি জন্ম-জন্মান্তারর ভক্তি দেখাতে প্রস্তুত থাকলেও আমাকে দেখে তাঁরা একটু অস্বস্তি বোধ করেন। হয়তো স্বামী দেবতাদের মুখ চেয়েই ব্যাপারটা ঘটে।

আপনি হয়তো এমনও গুজব শুনে থাকতে পারেন, বাঙালীদের সুখের সংসার ভাঙতে আমি নাকি গোপনে-গোপনে মহিলাদের সাহায্য করি।

শুনবেন হয়তো, ওই প্রমীলা রায় যেদিন প্রথম স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সেদিন রাত্রে নিরুপায় হয়ে সে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

আমার আরও বদনাম আছে। আমিই নাকি পদ্মাবতী পট্টনায়কের সঙ্গে ওই গ্রীক যুবকটির প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আমি মিথ্যাচারে বিশ্বাস করি না। আমি স্বীকার করছি. ঐ গ্রীক যুবকটি একদা আমারই ছাত্র ছিল। পদ্মাবতী যখন কাজের সন্ধান করলো তখন বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে ম্যানেজারের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমারই ছিল।

সূর্যকান্ত যখন বলে বেড়ায ব্যাপারটা পুরোপুরি আমারই পরিকল্পনা তখন আমি অবশ্যই আপত্তি করি।

আমি সূর্যকান্তকে একদিন টেলিফোনে বলেছিলাম, "এদেশের জল-হাওযার দিকে নজর দিন, সূর্যকান্তবাবু। কার দোষ তা খুঁজে বের করার চেষ্টায় কিছু লাভ হবে না। এই অদ্ভুত দেশ মানুষকে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেয়নি—সে অনেক দিন আগেকার কথা, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ হযেছে। কিন্তু স্ট্যাচু অফ লিবার্টি মূর্তি সমুদ্রের ধারে খাড়া করেই এরা সমস্ত দায়িত্ব শেষ করেনি। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এরা নিশ্চিত করেছে। তারপর যা হয়েছে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে—নারী পেয়েছে প্রথম মুক্তির স্বাদ।"

আমার সম্বন্ধে আর একটা বদনাম নিশ্চয় আপনার কানে এতো-দিনে পৌঁছে গিয়েছে। আমি মানুষটা ঠিক সুবিধের নই—না আম, না আমড়া!

আমি নিজের দেশে পরীক্ষায় ফেল-টেল করে এদেশে পণ্ডিত হয়েছি, শুনে থাকবেন। যাহা রটে কিছু বটে! আমি ওই যে ওলাবিবিতলা লেন থেকে বেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের আশীর্বাদ সত্ত্বেও হুড়মুড় করে নরকে নামতে লাগলাম তা মিথ্যে নয়।

আমি বকে গিয়েছিলাম একেবারে, শংকরদা। সেই টাইপের বকাটে যারা মদ খায়, মাতাল হয়, যেখানে-সেখানে রাত্রি কাটায়, বাড়ি ফেরে না—যাকে দেখলে বাঙালী বাপেরা আঁতকে ওঠেন, আর বাঙালী মা যার জন্যে সারাক্ষণ চোখের জল ফেলেন।

আমার একটা সুবিধে ছিল, আমি যখন চরম অধঃপতনে নেমে যাচ্ছি তখন আমার মায়ের ঘুমও আসতো না, চোখ দিয়ে জলও পড়তো না। নিজের স্বামীর জন্যে ভেবেই আমার মা কূলকিনারা করতে পারেননি, নিজের অসহায় শরীর ও মনকে তিলে-তিলে নষ্ট করে ফেলেছেন। তখন কেউ যদি তাঁকে বলতো তোমার ছেলেও নরকে নামছে তা হলে মায়ের মাথায় ঢুকতো না। আমার মা তখন মানসিক রোগিণী।

আমি ফেল করেছি। ওই যে কালী ব্যানার্জী লেনের অণুশ্রী বউদি সেও আমাকে দেহ-প্রশ্রয় দেবার মুহূর্তেও বলেছে, "তোমার লেখাপড়ার কী হবে বাদল?"

কী সমস্যা বুঝুন! যেখানে আমি নিজের ওপর অবিচার করে বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই, যেখানে নীতির বন্ধন ছিন্ন করে আমি পরনারীর গৃহে দেহসংসর্গে লিপ্ত, সেখানেও মেয়েরা আমার মঙ্গল চাইছে।

শুধু ওই অণুশ্রী বউদি নন, ওই যে সরস্বতী যে মা সরস্বতীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না-রেখে মা শীতলার কাজকারবারে নাম লিখিয়েছে, সেও একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এখানে তো যখন-তখন দুষ্টুমি করতে আসো! পড়াশোনার কী হচ্ছে?"

পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের উপন্যাসে আপনি এরকম পরিস্থিতি পাবেন না। আমি সমাজবিজ্ঞানের শত-শত রিপোর্ট পাঠ করেছি, আমি এদেশে অধঃপতিতদের মধ্যেও বহু বছর হাতে কলমে কাজ করেছি, আমি রোবিনসনকে জিজ্ঞেস করেছি, এমন কোনো পরিস্থিতি পেয়েছেন কি না যেখানে আপনি যার সান্নিধ্যে নষ্ট হতে এসেছেন সে জিজ্ঞেস করছে, "পড়াশোনাটা কেন ঠিকমতো হচ্ছে না?"

আমি ওই দেশটাকে যতই অপছন্দ করি আমি জানি পৃথিবীতে এইরকম পরিস্থিতি কেবল ওই হাওড়ায়, ওই কলকাতায়, ওই বর্ধমানে, ওই মালদায় ঘটতে পারে। লণ্ডন, পারি, ন্যুইয়র্ক অথবা শিকাগোতে কখনই নয়।

আমি তখন সরস্বতীর শরীর চেয়ে, মুখ বুজে একেবারে অন্ধকার অধঃপতনের গভীরে নেমে যেতে চাই। আমার কেমন ধারণা একদিন এইভাবে যত্র-তত্র বেপরোয়াভাবে ঘুরতে-ঘুরতে পিতৃদেবের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যাবে। যেমন ওই খালাসি টালার শুঁড়িখানার আসরে আমার বন্ধুর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। মুখোমুখি হলে যে খুনোখুনী হবে তাও ঠিক করে রেখেছিলাম। ভাগ্য ভাল পিতৃদেবের দেখা হলো না।

তার বদলে কলকাতায় অধ্যাপক রোবিনসন সায়েবের সঙ্গে দেখা হলো। পরিচয়টা জমে উঠলো কত সহজে। আমার মায়ের অবস্থা এইরকম শুনে বোধ হয় সায়েবের দয়া হয়ে গেলো।

অদ্ভুত এই পশ্চিমের যন্ত্রটা—অসাধারণ ভোগী এবং অসাধারণ ত্যাগী একই কল থেকে একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। রোবিনসন মানুষটা দেবতুল্য বললে কিছুই বলা হয় না। সমাজতত্ত্বের চশমা লাগিয়ে সমস্ত মানব-সমাজকে তিনি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন, ছাত্রদের সাবধান করে দিচ্ছেন সত্য থেকে বিচ্যুত না হতে, কিন্তু গভীর এক শ্রদ্ধা রয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে। ডেভিড রোবিনসন যখন বলেন, পাশ্চাত্যের উন্নয়নের জন্য ভারতীয় নারীর কল্যাণস্পর্শ প্রয়োজন তখন তিনি বক্তৃতা দেন না, ওটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

শংকরদা, যে-ছেলে নিজের দেশে বি-এ পাশের যোগ্য হচ্ছিল না সেই পরের অধ্যায়ে বিদেশের পণ্ডিতসমাজে বিদগ্ধ হয়ে উঠলো। এর জন্যে আমি অবশ্যই সারাজীবন রোবিনসন সায়েবের কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। কিন্তু মজা হলো, এই যে আমার বিকাশ ঘটলো, এই যে আমি সায়েবের আহ্বান সত্ত্বেও এদেশে আদৌ পৌঁছতে পারলাম এর পিছনে কার কতখানি দান আছে সে নিয়ে অনেক দাবী, অনেক আস্ফালন আছে।

আপনি দেশে ফিরে গিয়ে একখানা রিকশ চড়ে একবার শিবপুর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনে হাজির হবেন। দেখা করবেন অপরেশ বাগচী, ফাদার অফ ডঃ সুশোভন বাগচী অফ দ্য

ইউনিভার্সিটি অফ···, ইউ-এস-এ। দেখবেন পাড়া প্রতিবেশী সবাই জানে, স্ত্রীর অসুস্থতা সত্ত্বেও কী করে ছেলে মানুষ করতে হয় তা যদি কেউ এ-শহরে দেখিয়ে থাকেন তাঁর নাম অপরেশ বাগচী। ম্যান মেকার বলতে যদি কাউকে বোঝায় তিনি এই অপরেশ বাগচী—জীবনে নিজে কিন্তু কোনো সুখ তিনি গ্রহণ করলেন না!

অণুশ্রী বউদি এখন কোথায় তা আমার জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর স্বামী যদি জাহাজের চাকরিতে আরও উন্নতি করে থাকেন তা হলে নিশ্চয় হাওড়ার এঁদোগলিতে তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না। অণুশ্রী বউদিকে আমার কোনো খবর দেওয়ার থাকলে তা হলো, আমি আর ছবি তুলি না। ক্যামেরার সঙ্গে আমার সারাজন্মের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। সে অবশ্য ওই সরস্বতী ও অণুশ্রীর দু'জনের জন্যে।

সরস্বতী আমাকে তার ঘরে-টাঙানো ঠাকুর রামকেষ্টর ছবিতে হাত দিয়ে বলেছিল. "ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও এই ক্যামেরার ব্যাপারে থাকবে না।"

আমি ওসব ঠাকুরের পা-টা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সরস্বতীর শরীরটাকে এবং মনটাকে আমি বিশ্বাস করতাম। ওই শরীরটা তো মিথ্যে নয়! আমি মনে-মনে বলেছিলাম, যথেষ্ট হয়েছে, আর কখনও ছবি তোলার মধ্যে আমি নেই। ওই যে আমার ডেনজারাস বন্ধু গোবিন্দ আচার্য!

গোবিন্দ আচার্যর ছিল মুখেন মারিতং জগৎ। মেয়েদের দেহ সম্পর্কে বড্ড বেশী আগ্রহ। দেহ ছাড়া মেয়েদের যে আর কিছু আছে এই জ্ঞান কমবয়সী বাঙালী পুরুষদের আগেও ছিল না, এখনও হচ্ছে না। লেখকমশাই, খুব সাবধান।

কুটনীরূপিনী 'ইম্প্রেসেরিও' নাগরের কাছে নারী-শরীর সম্পর্কে যা বিবরণ দিতো তা নীরদ চৌধুরীর উদ্ধৃতি থেকে স্মরণ করুন:

"কুলকামিনীর অঙ্গে কর নিরীক্ষণ।
সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ॥

ভালে ভালে চন্দননগর শোভা পায়।
চূঁচুড়ার সং দেখ চুলের চূড়ায়॥
সিঁতার বাগানে বাবু যাও নিতি নিতি।
কপাল জুড়িয়া আছে দেখ সেই সিঁতী॥
ভুরুষুট পরগণা ভুরুতে নির্যাস।
তার গুণ কহিব কি ভারতে প্রকাশ॥
কানপুর শুনেছ কেবল মাত্র কানে।
স্বচক্ষে দেখহ বাবু যুবতীর স্থানে॥
শোনা আছে দানাপুর দেখা নাই তায়।
সোনাদানাপুর পাবে নারীর গলায়॥
নগরের মধ্যে এই কলিকাতা সার।
প্রতি পথে কত শত মজার বাজার॥
কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহকার।
বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার॥
এই কলিকাতায় সব দেয় রাজকর।
সেই স্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর॥
কটি আভরণছলে দেখ কাঞ্চিপুর।
চন্দ্রকোণা চন্দ্রহারে দেখিবে প্রচুর॥
অপূর্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা।
শিল্পবিদ্যা সেখানে কত আঁকাবাঁকা॥
কি দেখেছ রসরাজ এ কোন্ নগর।
রমণীর অঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর॥

একবার এক বাংলা পত্রিকায় অবিস্মরণীয় এক কার্টুন দেখেছিলাম —পুরুষের চোখে নারী ও নারীর চোখে নারী। নারীর চোখে নারী বলতে শরীরের কিছুই লক্ষণীয় হচ্ছে না, শুধু শাড়ির ডিজাইন ও অলঙ্কারের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া। আর পুরুষের চোখে নারীর বস্ত্র অলঙ্কার কিছুই নেই, শুধু নগ্ন দেহটি। ছবি দুটি এমনভাবে আঁকা যে

একসঙ্গে জোড়া দিলে তবেই এক স্বাভাবিক রমণী মূর্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।

বাজারে লুকিয়ে-লুকিয়ে হলদে মলাটের যত নোংরা বই পাওয়া যেতো সব পড়তো গোবিন্দ, তারপর স্বপ্ন দেখতো রমণী সান্নিধ্যের; কিন্তু সুযোগ পেতো না বেচারা। যা পাকানো চেহারা, যা চাপা স্বভাব, মেয়েদের নজরেই পড়তো না।

সেই গোবিন্দর সাকরেদ হয়েছি আমি। যখন অণুশ্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা সবিস্তারে বলি, গোবিন্দ প্রথমে বিশ্বাসই করে না। সর্বক্ষেত্রে সদা-পরাজয়ের অধ্যায়ে অণুশ্রীই তখন আমার একমাত্র সাফল্য।

আমার গায়ে একদিন সেন্ট ছড়ানো ছিল। বললাম, "অণুশ্রীর স্বামী বিদেশ থেকে এনেছেন।"

গোবিন্দ ভাবলো, আমি মিথ্যে গল্প বানিয়ে একটা অণুশ্রীকে খাড়া করেছি, স্রেফ বন্ধুর বুকে জ্বালা ধরানোর জন্য। গোবিন্দ বলেছে; "চল একদিন নিয়ে আমাকে, তোর অণুশ্রীর কাছে।"

আমি রাজী হইনি। সমস্ত সম্পর্কটা ভীষণ চাপা। কোথায় যে একটা অন্যায় গন্ধ আছে তা আমি ও অণুশ্রী বউদি বুঝতে পারি। কিছু কিছু যেন করবার নেই। হঠাৎ কীভাবে ছুটো গাড়ির ব্রেক ফেল করেছে। সুবিধে এই, আমার মতন একটা 'নিষ্পাপ' মুখশ্রীর ছেলেকে কেউ সন্দেহ করে না।

অণুশ্রীর স্বামী যখন ছুটিতে এসেছিলেন তখন আলাপও হয়েছিল অণুশ্রী বলেছিল, "এই আমাদের বাদল, আমাকে খুব হেল্প করে।"

কর্তা জাহাজে ফিরে যাবার আগে বলেছিলেন, "তুমি রইলে, একটু কষ্ট করে সময়মত খোঁজখবর রেখো। অণুশ্রীর কখন কি প্রয়োজন হয়, ঠিক নেই।"

"ও ঠিক আমার খবর রাখবে, তুমি ভেবো না", এই বলে অণুশ্রী বউদি হেসে কাঁধ বেঁকিয়েছিলেন। আমি মার্কামারা দু নম্বরী বাঙালীর

মতন কর্তাকে চিপ করে একটা নমস্কারও ঠুকে দিয়েছিলাম।

অণুশ্রী তখন চমৎকার অভিনয়: "আমি কিন্তু মরে গেলেও তোমার নমস্কার নিচ্ছি না।"

অকালপক্ক গোবিন্দ এসব বর্ণনাও বিশ্বাস করে না। শেষে ওর কাছে সাফল্যের প্রমাণ দেবার জন্যে আমার পৌরুষও ছটফট করে উঠলো। গোবিন্দটা ভেবেছে কি?

ওই ক্যামেরাতেই যার শিল যার নোড়া তার দাঁতের গোড়া ভাঙা হলো। অণুশ্রী বউদি ভাবছেন, আমি ওঁর শরীরের ওপরেই হাত পাকাতে চাই। ব্যাপারটা কতখানি গড়াতে পারে তা তাঁর মাথায় ঢোকেনি—ঢোকার জায়গা থাকলে কেউ এই কালা ব্যানার্জি লেনের মতন রক্ষণশীল জায়গায় একটা আধা-জানা ছেলের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে পড়ে?

অণুশ্রী বৌদি নিজেও তখন একটু ঘোরের মধ্যে ছিলেন। বলেছিলেন, "ব্রহ্মচর্য না থাকলে পড়াশোনা খারাপ হয়, আমিই বোধহয় তোমার পড়াটা খারাপ করে দিলাম।"

আমি বলেছি, "ভাবছি, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হবো।"

অণুশ্রীর শরীরের বদান্যতা আমার ঐভাবে অপব্যবহার করা যে ঠিক হয়নি তা ভেবে অনুশোচনায় আমার মন ভরে ওঠে। এদেশে লুকিয়ে রাখা সেই ছবির সেট আজও আমি দেখলাম—আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে, শংকরদা। ঘরের বউকে অযথা বিপদে ফেলে পথে বের করে দেবার ব্যবস্থা আমি প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলাম।

গোবিন্দ আচার্যর কাছে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে আমি অণুশ্রী বউদির দু খানা একান্ত ছবি ওর কাছে পাঠিয়ে দিলাম, দেখে ফেরত দেবার জন্যে। ছবি নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হতে পারে এমন অভিজ্ঞতা তখনও আমার ছিল না।

গোবিন্দর তো প্রথমে চক্ষু ছানাবড়া। তারপর বললো, "খুটিয়ে দেখে, পরীক্ষা করে তবে করমর্দন করবো।"

হ্যাণ্ডশেক তো হলো, কিন্তু ছবি আর ফেরত আসে না! গোবিন্দ এবার ছবির নায়িকার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আমি প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করেছি, কিন্তু গোবিন্দ অটল। আমি বলেছি, "তোমার সাহস বড্ড বেড়ে যাচ্ছে, গোবিন্দ। ভদ্র ঘরের বউ, সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না।" গোবিন্দর হাসিটা ভীষণ নোংরা। আপনি হয়তো বলবেন, "তুমিও কম নোংরা কীসে?"

হয়তো আপনি যা বলছেন তা ঠিক, কিন্তু নিজেকে গোবিন্দর মতন নোংরা ভাবলে আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

আমি দিনের পর দিন অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি গোবিন্দর পিছনে। ওর হাতে ধরে অনুরোধ করেছি, "ভাই, ছবি দুটো ফেরত দাও, যার ছবি তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

গোবিন্দ আচার্য কেবল তার এবড়োখেবড়ো দন্তমালা বিকশিত করে উত্তর দিয়েছে, "আমি যে অনুরোধ করেছি সেটা মিটিয়ে দাও ব্রাদার। একা সব জিনিস খেতে নেই—ভাল জিনিস ভাগ করে নিতে হয়।"

আমার দুশ্চিন্তা ক্রমশ দানা বাঁধছে। আমার অবস্থাটা তখন জটিল। মা আবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বাবার ব্যবসাটা একটু গড়বড় করছে—তাস এবং মদে অত আসক্তি হলে বিজনেসে কী হতে পারে? আমি একবার ফেল করে আবার পরীক্ষায় বসেছি।

অণুশ্রী বউদিও উপদেশ দিয়েছেন, "এই সময়টা মন দিয়ে পড়াশোনা করে নাও। পরীক্ষাটা একবারই আসবে, আর আমার সবই তো তোমার জন্যে তোলা থাকবে।"

কিন্তু ভাগ্য আমার মাথায় উঠবে মনে হচ্ছে! আমার মা তখন একটু ভালর দিকে। হাসপাতালে আমাকে বললেন, "তুই আমার একমাত্র সম্বল বাদল। তোর বাবা আমাকে যা-যা দেয়নি আমি তোর মধ্যেই তা ফিরে পাবো। আমার অনেক কপাল ওই আমেরিকান সায়েব তোকে পছন্দ করেছে। তুই যখন হলি, তখন আমার বাবা পাঁজি দেখে ছক কষে বলেছিলেন, কম বয়সে কিছু কষ্ট আছে, কিন্তু

আসল হীরে, তারপরে জ্বলজ্বল করবে সারাক্ষণ। তোর বাপ আমার মুখ ডুবিয়েছে—মাতাল এবং খারাপ লোকের বউ হয়েছি আমি। তুই আমাকে মস্ত লোকের মা করে দে, বাদল। লোকে যেন তোর নাম শুনে আমার দিকে তাকিয়ে দেখে। তুই শ্যাম ডাক্তারের মাকে রিকশ চড়তে দেখেছিস? বুড়ী রামকেষ্টপুর ঘাটে নামলে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। বউ ঝি সবাই তাকিয়ে দেখে—বলে, ওই এলেন রত্নগর্ভা! শ্যাম ডাক্তারের সারা দেশে নামযশ। ছেলে অত বড়, কিন্তু বুড়ীর স্বামী কী ছিলেন? পোস্টাপিসের মাস্টার—একবার আপিসের টাকা ভেঙে জেলেও গিয়েছিলেন কিন্তু সে সব কে মনে রেখেছে? তুই যে কোনোদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শ্যাম ডাক্তারের মাকে দেখিস।"

আমার শরীর দিয়ে তখন ঘাম বেরোচ্ছে। মা দু'দিন পরেই বাড়ি ফিরে আসছেন। অণুশ্রীর স্বামীও হঠাৎ হাওড়ায় আসছেন কী একটা জরুরি কাজে। কতদিন থাকবেন কে জানে? সেইসঙ্গে আমার পরীক্ষা! আমার বদস্বভাব! আর ওই গোবিন্দ।

আমি দিশাহারা হয়ে বউবাজারের নোংরা পাড়ায় সরস্বতীর ওখানে গিয়েছি। সরস্বতীর ফ্রেণ্ড আমি! এই কথা যখন বলি আমি, ওই বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠা বারাঙ্গনারা হাসাহাসি করেন। সরস্বতী নিজেও বলতো, "আমাদেরও ট্রেনিং বই আছে, পড়াশোনা আছে, পরীক্ষা পাশ আছে মশাই! আমাদের বন্ধু বলে কেউ নেই, একমাত্র ভগবান ছাড়া, এই শিক্ষা নিতে হয়।"

আমি তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে নেওয়া বাংলা বই থেকে সন্দেহের অবসান ঘটলো। নীরদবাবু উদ্ধৃতি দিয়েছেন বৃদ্ধা বারাঙ্গনা শিক্ষয়িত্রীর বক্তব্য থেকে। প্রেমের ধারা সম্পর্কে বাঙালী রমণীর ঐতিহাসিক বক্তব্য: "প্রেম, যাহাকে প্রীতি বলে তাহা ঈশ্বরের সঙ্গেই ভাল···নচেৎ অন্য প্রেম কপট প্রেম, অর্থাৎ স্বকার্যোদ্ধার হেতু যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিতে হয়—তাহা মনুষ্য-সকলের আন্তরিক নহে, প্রায় বাচনিকই।···অতএব, বাছা, আমাদিগের

প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায়, তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়, সেহ কপট প্রেম জানিবা। তুমিও এইপ্রকার প্রেম করিবা, কাহারও দেখে ভুলিবা না। বাবুকে আপনার কাবুেু আনিবা। ইহার পন্থা এই ছ (পঞ্চ মকারের মত) শিখিলে হয়, যথা—ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি।"

সরস্বতী নিজেও নিশ্চয় খুব ভালভাবে ওই শিক্ষা পেয়েছিল। তবু কেন যে সে আমার সম্বন্ধে চিন্তা করতো, অন্তর থেকে চাইতো আমি পড়াশোনায় ভাল করি। অথচ আমি তখনই মিথ্যাচারে ভরা। আমার শরীর, আমার গায়ের রঙ, আমার দেহের বনেদিয়ানাও আমার মিথ্যা ভাষণকে প্রশ্রয় দিয়েছে—আমি সেই যে প্রথম পরিচয়ের সময় বলেছিলাম, আমি বড় ঘরের ছেলে। পারিবারিক সমৃদ্ধি আছে যথেষ্ট, কিন্তু খেয়ালের বশে আমি ঘরছাড়া হয়েছি, আমি সবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বয়ে যাচ্ছি।

সরস্বতীর ঘটনাটাও জেনে নিয়েছি। ভাল ঘরের মেয়ে, ভাল ঘরের বউ-ই ছিল। কিন্তু স্বামীর দোষে এবং অত্যাচারে ঘর ছাড়া হয়ে এই পথে চলে এসেছে। মেয়েদের জন্যে বাঙালী সংসারের দরজাগুলো একমুখো। একবার বেরিয়ে এলে সেই পথ ধরে আর ফেরা যায় না।

আমি অনেকদিন পরে এবার কলকাতায় গিয়ে সরস্বতীর খোঁজ করতে বেরিয়েছিলাম। কতদিন পরে দেশে ফেরা। খারাপ পাড়ার লোকেরা তো আমাকে দেখে অবাক।

অবাক হবার কারণ আছে। কারণ আমি যে-বেশে ওখানে গিয়েছি সে-বেশে ওরা কাউকে কখনও ও-পাড়ায় আসতে দেখেনি। তারা তো ভাবছে আমি নিতান্তই পশু। একজন বৃদ্ধা তো বলেই বসলো, "ঠাকুর, আপনি বাড়ি ফিরে যান। এই বেশে এখানে আসতে নেই বাপমায়ের অমঙ্গল হয়। ঘাট কামান হয়ে যাক, নিয়মভঙ্গ হোক, তারপর তো এ পাড়া রইলই।"

বাপের অমঙ্গল—সে হয় হোক। আমার তাতে কী এসে যায়?

আমার জীবনের যা কিছু অমঙ্গল সব তো ওখান থেকেই শুরু হয়েছে। আমি মায়ের কথা ভাবছি। আমি শুধু ভাবছি, মঙ্গল অমঙ্গল কি স্থানিককালের মধ্যেই সীমিত থাকে?

আপনি হয়তো বলতে পারবেন, শংকরদা। অনেক সাধু এবং পুরোহিত তো আপনার জানাশোনা। নর মানুষের মঙ্গল অথবা অমঙ্গল করা যায়?

আমি আবার আসছি এই ব্যাপারে। ওই যে আপনার বউবাজারের নোংরা গলিতে সরস্বতীর সন্ধানে এলুনো। আমি আপনার কাছে কিছুই লুকিয়ে রাখবো না।

আমার জীবনের ওই অধ্যায়টা আমাকে ভীষণ হতাশায় ভরিয়ে দেয়। যেমন আমার মায়ের অবস্থা হতো। আমার বাবা বলতেন, পাগল হয়ে যাচ্ছে। আমি বাবাকে অনুরোধ করতাম ও কথাটা মুখে এনো না। শুনছো তো ডাক্তার কী বলছেন—'ডিপ্রেসন'। অভিধান খুলে দেখো, তার মানে হলো মানসিক অবসাদ। এই অবস্থায় মানুষ কষ্ট পায়, পথ খুঁজে পায় না বেরুবার। তাই আর একটা শব্দ রয়েছে অভিধানে—উদ্যমহীনতা।

আমারও কী যে হয়! বেশ কিছুদিন আগে কয়েক জনের দয়ায় আমি ওই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছি—ওসাবিবিতস। সেকেণ্ড লেন, অমরেশ বাগচী, ওই হতভাগা গোবিন্দ আচার্য, অণুশ্রী এবং বউবাজারের সরস্বতী এখান থেকে শত সহস্র মাইল দূরে—মাঝে বিরাট-বিরাট সমুদ্র রয়েছে—একমাত্র অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পেরোনই প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার, তার ওপর আছে ইউ. এস ইমিগ্রেশন, তারা যাকে-তাকে এদেশে ঢুকতে দেবে না—তবু কেমন যেন মুষড়ে পড়ি এদের কথা মনে হলেই।

ওই যে অনুরাধাকে দেখলেন, ওর ইতিহাসটা বলি বাবার অংশীদার হারুবাবুর মেয়ে।

যখন আমি চলে এলাম, তখন মা তাঁর গহনাগুলো প্রায় সব বেচে

দিলেন। মাকে বললাম, "দাদু যদি স্বর্গ থেকেও জানতে পারেন যে তাঁর আদরের মেয়েকে দেওয়া গহনাগুলোর জামাই এবং দৌহিত্রর হাতে এই গতি হয়েছে তা হলে রাগে ফেটে পড়বেন।"

মা কিছুতেই শুনবেন না। বললেন, "তোর বাপের সঙ্গে আমার তুলকালাম ঝগড়া হয়েছে। বাপ বলেছে, যে-ছেলে এই ইণ্ডিয়াতেই কিছু করতে পারলো না সে বিদেশে কী করবে? লোকে হাসবে শুনে টেনেটুনে পাশ করা ছোঁড়াও চলেছে আমেরিকায়! ভস্মে ঘি ঢালার কোনো মানে হয় না!"

মা তো যে-কোনো একটা বিষয় পেলেই বাবাকে সন্দেহ করে বসেন! মা জেদ ধরেছেন, আমাকে বিদেশে পাঠাবেনই। তিনি বললেন, "আমি ঐ রোবিনসন সায়েবের মুখ দেখেছি। সাধুর মতো মানুষ। উনিই তোর বেস্পতি গ্রহ! তোর ভাল করার জন্যেই তো উনি এদেশে এসেছিলেন।"

টাকা দিলেন একজন, অথচ হৈ-চৈ তুললেন আর একজন। আমি যখন এদেশে এসে পড়াশোনায় ভাল করলাম, নিজের পায়ে দাঁড়ালাম ওই রোবিনসন সায়েবের দৌলতে, তখন পিতৃদেব সন্তান মানুষ করার সব কৃতিত্ব দাবী করে বসলেন। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু টাকার। প্রায়ই পত্রাঘাত করেন, "টাকা পাঠাও, আরও টাকা ছাড় বাছাধন।"

তারপর সেবার ফোন করে ওভারসিজ ট্রাঙ্ককলে পিতৃদেব বললেন, "বাদল, তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো আর না থাকো, তোমার হারুকাকুর কাছে অবশ্যই আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।" বাবার পার্টনার হারুকাকু কী করে মানুষটাকে এতোদিন সহ্য করেছেন আমি জানি না। পিতৃদেব ঘোষণা করলেন, "তুমি যখন বিদেশে যাও তখন হারুই টাকা দিয়েছিল। আমি কোথায় পাবো? আমার ঘরে চিররুগ্না তোমার মা! তাঁর চিকিৎসা, তাঁর দেখাশোনা—দুনিয়ায় কারও তো জানতে বাকি নেই আমার জীবন।"

হাজার-হাজার মাইল দূরত্ব সত্ত্বেও বাঙালী জীবনের বৈদ্যুতিক শক যেন এপারে টেলিফোন তারের মাধ্যমে আমাকে আক্রমণ করছে। আমি ফোনটা নামিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আমি ভাবতে বসেছি।

আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, আমি মাকে নিয়ে এই দেশে চলে আসি। তার আগে আমার মায়ের উচিত ওই লোকটাকে ডাইভোর্স করা। মায়ের কপালে ওই সিঁদুরটুকু রাখার কোনো মানে হয় না। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের মেয়ে বুঝে গিয়েছে, প্রতি মুহূর্তে স্বামীর অন্যায়ে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বিচ্ছেদ অনেক ভাল। সব দেশেই যে সমাজপতিরা যে বিবাহ বিচ্ছেদের আইনগত ব্যবস্থা করেছিলেন নিশ্চয় তার বিশেষ কারণ আছে।

এর পরেই পিতৃদেবের চিঠি এসে গিয়েছিল। তিনি যে আমার বিদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তিগত লেনদেন করে থাকতে পারেন তা আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, ছেলে বাইরে যাচ্ছে সুতরাং অনেক অর্থ প্রয়োজন এই কথা চালু করে পাটনার হারুকাকুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন পিতৃদেব।

"আমার কাছে যতটা না হোক হারুকাকুর কাছে তোমার অনেক ঋণ রয়েছে", পিতৃদেব লিখছেন! হয়তো হারুকাকুকে দেখিয়েই এই চিঠি ডাকে ফেলেছেন।

হারুকাকু মানুষটি ভাল। সংসারী লোক, নিজের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করেননি। আর অপরেশ বাগচীর মতন অংশীদারকে এতো বছর ধরে সানন্দে বহন করেছেন। অন্য কেউ হলে এতোদিন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে একলাই ব্যবসা চালাতেন।

হারুকাকুর মেয়ে বিদেশে পড়াশোনা করতে চায়। তাকে দেখা-শোনার প্রয়োজন। আমি না বলতে গিয়েও পারলাম না। হারুকাকু না থাকলে গোলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের বাড়ির জন্যে নিয়মিত পুরসভার ট্যাক্সো, ইলেকট্রিক বিলও হয়তো দেওয়া হতো না, মা পথে বসতেন।

কিন্তু আমি ভাবছি, পিতৃদেবের কাণ্ডকারখানা! আমাকে দেখিয়ে কত টাকা হাতিয়েছেন? তার সুদ কত হয়েছে কে জানে? আর আমার মায়ের গহনাগুলো যে বিক্রি হয়ে গেলো তার হিসেব কোথায়?

আমার মা একবার সন্দেহ করে বলেছিলেন, "আমার যেন মনে হচ্ছে আরও গহনা থাকবার কথা। তোর বাপকে আমি কী করে বিশ্বাস করি বল? তুই গহনাগুলো নিজের কাছে রাখলে পারতিস। আমি নিশ্চিন্ত হতাম।"

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম, বলতে সাহস পেলাম না, "তোমার আদরের পুত্রও পিতৃদেবের পথ অনুসরণ করে তোমার অসুস্থতার সময় কয়েকখানা গহনা এদিক-ওদিক করেছে।"

আমি না বলতে পারলাম না অনুরাধার এদেশে আসার ব্যাপারে। মনে হলো, আমাকে যেন আমার অজান্তেই হারুকাকার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

অনুরাধাকে আপনি দেখেছেন। ওর কাটা ঠোঁট অস্ত্রোপচারের পর ঠিক হয়ে গিয়েছে। ঠোঁটে ছোট্ট সরু একটা দাগ অনেকক্ষণ নজর না করলে বোঝা যায় না।

অনুরাধা এদেশে মন্দ করছে না। এদেশের মাটিতে মন দিয়ে কাজ করুক, এদেশের মুক্তির স্বাদ সে উপলব্ধি করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অর্জন করুক, তারপর সে নিজে ঠিক করবে কোন পথে যাবে। দেশে আদৌ ফিরবে কি না। এদেশে অনুরাধার মতন মেয়ের বিবাহ হতে মোটেই সময় লাগবে না।

পিতৃদেবের মনের মধ্যে হয়তো অন্য কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনাও লুকিয়ে ছিল। আমাকে দু'একবার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ঐ অনুরাধাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পার্টনার হারুকাকুর কাছ থেকে আরও কিছু আর্থিক সুবিধে হাতিয়ে নেওয়া।

পিতৃদেব আজকাল বেশ চালু হয়ে গিয়েছেন—ফোন করেন কালেক্ট কল। এই এদেশের সুবিধে। যে কোন রিসিভ করবে সে বিল দেবে,

শুধু অপারেটর জিজ্ঞেস করে নেবে, অমুক আপনার সঙ্গে কালেক্ট কল করতে চাইছেন, আপনি ফোন নেবেন নাকি ?

পুত্রের ঘাড়ে বিলের বন্দুক রেখে পিতৃদেব অনেক লম্বা-লম্বা আলোচনা চালিয়ে যান, বিশেষ করে অনুরাধার প্রতি আমাদের পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধে। আমি এক-এক সময় ভেবেছি, পিতৃদেবের কালেক্ট কল এলে নেবো না। সেবার সত্যিই কল নিলাম না, ইচ্ছে করেই। অনুরাধা এদেশে পা দিয়েছে, বাঙালীদের পাপস্থান থেকে সে বেরিয়ে এসেছে—সে নিজেই এবার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে! নিজের খরচে পিতৃদেবের লেকচার শোনা আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

কল এলো, আর নিলাম না। শংকরদা। কী বোকামি যে করলাম। তার পরের দিন টেলিগ্রাম এলো মা অসুস্থ। খবরটা ২৪ ঘণ্টা আগে জানতে পারার সুযোগ থেকে আমি নিজের দোষেই বঞ্চিত হলাম।

তারপর সবটা জানেন না আপনি। এবার ছুটে গিয়ে মাকে হাসপাতালের জেনারেল বেড থেকে সরালাম। কলকাতার হাসপাতাল-গুলোর কী দুর্গতি হয়েছে! সর্বত্রই বোধ হয় অপরেশ বাগচীর মতন লোক বসে রয়েছে!

হাসপাতালে কেবিনে মায়ের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি আমি। পিতৃদেব সুযোগ পেয়ে দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছেন। হয়তো খালাসীটোলায় গিয়ে গলা ভিজিয়ে নিজেকে হাল্কা করছেন। হয়তো গৃহিণীর গুরুতর অবস্থা দেখিয়ে অংশীদার হারুকাকুর কাছ থেকে আরও কিছু টাকা হাতাচ্ছেন।

মা বলেছিলেন, "শোন বাদল, তোর বাবা আমাকে সেদিন যখন নিয়ে এলো, তখন শুধু তোর কথা মনে হতে লাগলো। আমার কিছুই তো নেই। আমার হাতের বালাটা খুলে রেখে এসেছি তোর কাকিমার কাছে। তুই ওটা নিয়ে নিস—যখন বউ আসবে তখন তাকে দিস।"

বউকে দিতে হয় মায়ের আশীর্বাদ। মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যথা শীঘ্র সম্ভব অলঙ্কার যেন আমার হাতে পৌঁছয়। যত বলি, "মা, তোমার

এখন একটাই কাজ—ভাল হয়ে ওঠা।" মা শুধু চোখের জল ফেললেন। এবার মন নয়, শরীরটাই ভেঙে পড়েছে আমার দুঃখিনী জননীর।

আমি বাড়ি ফিরে কাকিমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কাকিমা খুব লজ্জা পেলেন। তারপর যা বললেন, তার সারমর্ম: পিতৃদেব পরের দিনই বালাটি হাতিয়ে নিয়েছেন। বলেছেন, "হু হু করে খরচ হচ্ছে চিকিৎসাতে। তুমি ভেবো না, খোকার বিয়ের সময় আমি নিজে আরও ভাল বালা গড়িয়ে দেবো, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।"

মাকে এসব বলার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমাকে এমন ভান করতে হলো, জিনিসটা ইতিমধ্যেই আমার হাতে এসে গিয়েছে এবং সম্ভাব্য পুত্রবধূর হাতে স্বর্ণবলয়ের শোভা পাওয়া সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

জন্ম হতে যারা দুঃখিনী তারা জন্মদুঃখিনী, আর বিবাহকাল থেকে যারা দুঃখিনী তারা কি বিবাহদুঃখিনী? স্বামীর সংসারে সারাজীবন ধরে যিনি জ্বলে পুড়ে মরেছেন সেই মা বললেন, "আমাকে তোরা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চল।" কী আশ্চর্য! ওই ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড লেনের বাড়িতে সানন্দে স্মরণ করবার মতন কিছুই তো নেই। তবু মা ওইখানে কেন ফিরতে চান?

পিতৃদেব আবার আমাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শোনালেন। "বাড়িতে এই সব রোগের তদারকী অনেক হাঙ্গামার। সকাল-সন্ধ্যা কে ওই সব হেপা পোয়াবে? যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।"

আমি দেখলাম, মা অস্থির হয়ে উঠেছেন নিজের বন্দীশালায় ফিরতে। উড়ে যাবার আগে আজন্ম বন্দী পাখি কি আবার তার খাঁচাটা দেখতে চায়?

রিস্ক বণ্ড সই করে আমি মাকে ওলাবিবিতলায় ফেরত নিয়ে এলাম। পিতৃদেব আগেই বলে দিয়েছেন, "ভাল করলে না কাজটা।"

আমি শেষ দুটো দিন সারাক্ষণ বসে ছিলাম মায়ের মাথার কাছে। আমার পিতৃদেব তখনও উধাও।

আমি একবার ভেবেছিলাম মাকে বলবো, "তুমি একটু উঠে দাঁড়াও। তারপর ডাইভোর্স করো। তোমার হাতের নোয়াটা খুলে ফেলো চলো আমার সঙ্গে অন্য দেশে, যেখানে মেয়েরা সারাজীবন কোনো অন্যায় সহ্য করে না।"

কিন্তু মা যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন আমাকে ছাড়াও যেন তাঁকে খুঁজলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি তখন পুত্রের ওপর সব দায় চাপিয়ে তাসের আড্ডায় জমিয়ে বসেছেন!

আধঘণ্টা পরে তিনি এলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য গুম হয়ে থেকে মন্তব্য করলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম, হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনাটা ঠিক হবে না।" এটা যে বাদলের অদূরদর্শিতা তা ইতিমধ্যেই বিশ্বসংসার জেনে গিয়েছে। যা জানানো হয়নি, এক গৃহবধু সাংসারিক সমস্ত জীবনের যন্ত্রণা ও চরম অবহেলা সত্ত্বেও বিদায় মুহূর্তে নিজের ঘরে ফিরতে চেয়েছে। মা শুনেছিলেন, হাসপাতালে চরম লগ্নে পাশে কেউ থাকে না।

আমি দেখলাম, পিতৃদেব একটা বিড়ি ধরালেন। উদ্বেগ প্রকাশ করার ওইটাই তাঁর নিজস্ব স্টাইল।

আমি অবশ্য ইতিমধ্যে একটা অপকর্ম করে ফেলেছি। রাগের মাথায় এবং কিছুটা ঘেন্নায় সদ্য পরলোক যাত্রী মায়ের হাত থেকে লোহার বালাটা খুলে পকেটে পুরে ফেলেছি। আমেরিকার কাগজে এই লোহার বালা সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখেছি। বিবাহের রাতে মেয়েদের হাতে স্বামী এই লৌহবলয় পরিয়ে দেন—খুলে নেওয়া হয় বৈধব্যের মুহূর্তে। আর্য জাতিরা সুসভ্য বলে সারাক্ষণ নিজেকে জাহির করছেন, কিন্তু ক্রীতদাসত্বের প্রতীক এই বালা। আমি আশা করছিলাম, অন্তত মানসিক অসুস্থতার কোনো মুহূর্তে মা ঐ বালা ভেঙে ফেলবেন, কিন্তু করেননি। আমি এখনও বলছি, শংকরদা আমাদের মায়েরা, বোনেরা বন্দিনী। ওরা মুক্তির স্বাদ পাক তা কেউ চায় না।

তারপর যথাসময়ে ছোটকাকিমা ঐ মোচার কথা তুলেছেন—

এয়োস্ত্রীর মহাযাত্রা বলে কথা! ভাগ্যবানের বউ মরে।

ভাগ্যবানটি তখন কয়েকজন বন্ধু পরিবৃত হয়ে বাড়ির বাইরে বিড়ি সেবন করছেন। অনেকে বারণ করেছিল, কিন্তু আমি নিজে সাইকেলে চড়ে বাজারে মোচার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। যখন ফিরলাম, পিতৃদেব বললেন, "এতো বড় মোচা কেন আনলি? ছোট একটা হলেই চলে যেতো—দিতে হয় তাই দেওয়া।" আমি ইচ্ছে করেই বাজারের সবচেয়ে বড় গর্ভ মোচাটাই মায়ের পায়ের তলায় দেবার জন্যে এনেছি। সম্ভাবনার অপমৃত্যু—তারই প্রতীক এই গর্ভমোচা।

ঘাট ও শ্রাদ্ধ যথানিয়মে হয়েছে। পিতৃদেব ঐ শ্রাদ্ধের দিনে কাছাকাছি বসে বিড়ি চুষতে-চুষতে আমার ওপর নানা উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন।

হারুকাকু এসেছিলেন ফুল ও মিষ্টি নিয়ে। বাবা চমৎকার অভিনয় করলেন। বললেন, "বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে, হারু।"

হারুকাকা সস্নেহে উত্তর দিলেন, "তা তো লাগবেই। সারাজীবন ধরে অনেক করেছো তুমি। এখন ভেঙে পড়লে চলবে না অপরেশ, মনে রেখো মা-মরা ছেলে রইলো তোমার।"

দার্শনিকের উদাসীনতায় পিতৃদেব বিড়ি টানলেন। ভাবটা এমন যেন সারাজীবন তিনি স্ত্রীর জন্যে যথাসাধ্য করেছেন। হারুকাকু বললেন, "ব্যবসার জন্য চিন্তা কোরো না। যতদিন দরকার বাড়িতে থাকো, ছেলের দেখাশোনা করো।"

পরের দিন নিয়মভঙ্গ। অর্থাৎ আবার ব্যাক টু নর্মাল। হবিষ্যান্ন, নিরামিষ ভক্ষণ, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আবার মাছ-মাংসে প্রত্যাবর্তন। পৃথিবী কাল থেকে আর মনে রাখতে উদ্‌গ্রীব হবে না যে মিনতি বাগচী বলে এক ভারি মিষ্টি কোমল স্বভাবের রমণী

পৃথিবীতে অতি সামান্য প্রত্যাশা নিয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিল, কিন্তু তার কোনো স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

আমি নিয়মভঙ্গের বাজারের সব টাকাকড়ি পিতৃদেবকে দিয়েছি। পিতৃদেবের নির্দেশ, মাছটাছগুলো ভাল জিনিস আসুক। সেই সঙ্গে দই, মিষ্টি, রাবড়ি। রাবড়িটা মায়ের বিয়েতে দাদামশাই করিয়েছিলেন।

আমার হঠাৎ কী যেন খেয়াল হলো। আমি শ্রাদ্ধ শেষ করেই, আচমকা ঘোষণা করলাম, আমি চললাম। নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি না।

পিতৃদেব হুঁশিয়ারি দিলেন, লোকলজ্জার কথা তুললেন। "লোকের মধ্যে কথা উঠবে।"

আমি ওসব উপদেশ মাথার মধ্যে নিলাম না। আমার মনে হলো, "যে-সমাজে অনিয়ম ছাড়া কোনো নিয়ম নেই, সেখানে আবার নিয়মভঙ্গ কী ?" আমি আজই ফিরে যেতে চাই আমার কর্মক্ষেত্রে। বিমানে জায়গা না পেলে আমি এয়ারপোর্ট হোটেলেই পরের ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষা করবো।

আপনাকে বলা হয়নি শংকরদা। প্লেনে যখন আপনার সঙ্গে দেখা হলো তখন আমি শ্রাদ্ধবাসর থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছি—নিয়মভঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছি। আপনাকে কথাটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু তখন বলা হয়নি।

ওহো, আরেকটা কথা। ওখানেও আভাসে ইঙ্গিতে কথা উঠেছিল। এখানে আপনিও যে প্রসঙ্গটা তুলবেন, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি। এর আগের বার যখন এদেশে এসেছিলেন তখন সুচরিতা নাম্নী একটি ভাগ্নীর বিয়ে পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন ডক্টর গাঙ্গুলী নামক যুবকের সঙ্গে। স্বদেশের পাঠকরা ওইরকম একটা কিছু চায়—উদ্বেগ থাকুক, পার্থক্য থাকুক, তিক্ততা থাকুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

যেন একটা মধুর কিছু ঘটে যায়—একটা মিষ্টি বিয়ে-টিয়ের মাধ্যমে।

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করে বসবেন, অনুরাধার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কীরকম? আমি অনুরাধাকে গ্রহণ করে নিলেই তো অনেকের ইচ্ছাপূরণ হয় আর ঐ যে মায়ের লোহার বালাটা সঙ্গে করে এনেছি তারও একটা সদ্ব্যবহার হয়।

দেখুন শংকরদা, অনুরাধা ভাল ঘরের ভাল মেয়ে। ওলাবিবিতলা লেনের যে-বিষ আমাকে জর্জরিত করেছে তা তাকে স্পর্শ করেনি। হারুকাকা অনেক ভাগ্যবান। কিন্তু অনুরাধা আমার সবটুকু জানে না। সে জানে, আমার মায়ের শরীর খারাপ হতো, সেই দুশ্চিন্তায় আমি দেশে একবার পরীক্ষায় খারাপ করেছিলাম, তারপর 'লস' মেক আপ করে রোবিনসন সায়েবের স্নেহপ্রশয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। ও জানে আমার স্বভাবে নিঃসঙ্গতা আছে, কিন্তু যথাসময়ে ওসব কেটে যায়। আমি মাঝে-মাঝে একটু মদ্যপান করি—তা ও জিনিস এখানে এমন কিছু একটা বড় ঘটনা নয়। অনুরাধা হয়তো জানে তার বাবার অর্থ সাহায্য, আমার মায়ের গহনা এবং রোবিনসন সায়েবের কৃপাদৃষ্টি আমাকে নতুন অধ্যায় শুরু করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়, শংকরদা।

ব্যাপারটা নোংরা। কাউকে বলা হয়নি কিন্তু তবু শুনুন।

শ্রাদ্ধের দিনে পিতৃদেব জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, তুই কি বউবাজারের দিকে গিয়েছিলি?" আমি একটু সজাগ হয়ে বসেছিলাম। "হারুর আপিসের কে যেন তোকে ওখানে দেখেছে। অশৌচের বেশে খালি পায়ে ছানাপট্টির সামনে দিয়ে হাঁটছিস। আমি অবশ্য বললাম, নিশ্চয় বাদল কিছু কিনতে-টিনতে বা কাউকে নেমন্তন্ন করতে…"

আমি পিতৃদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। কিন্তু আমি একটা বেয়াড়া কাজ করবার জন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম, শংকরদা। সন্ধ্যে হবো-হবো সময়ে খারাপ পাড়ায় অনেক অতিথির আগমন হয়, কিন্তু গলায় কাছা, হাতে কম্বল, একমুখ দাড়ি অশৌচের অতিথি আপ্যায়ন

করতে এ পাড়ার মেয়েরা অনভ্যস্ত। আমি কিন্তু ওখানে ঢুকে পড়েছি। কত বছর পরে হাড়কাটা গলিতে এলাম। আমি সরস্বতীর খোঁজ চাই। সরস্বতীকে আমার যে বিশেষ প্রয়োজন।

এক তরুণী মহিলা বললেন, "কী গো ঠাকুর, কয়েকদিন পরে এসো গো। আমরা তো কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি না। এ সময় ব্রহ্মচর্য না হলে যিনি গেছেন তাঁর অমঙ্গল হয়।"

আমি তখনও ভাবছি সরস্বতীর কথা। একবার আমার সরস্বতীকে জরুরী প্রয়োজন। ওই গোবিন্দ আচার্যর হাত থেকে সে যদি আমাকে না রক্ষে করতো তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম! অণুশ্রীর স্বামীর হাতে আমার জীবন সংশয় হতো, এখানে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না, আমার বিদেশ যাওয়া ভণ্ডুল হয়ে যেতো। আমার অপরাধে অণুশ্রীরও সর্বনাশ হতো।

ওই গোবিন্দ আচার্য তখন অণুশ্রীর ছবি দুটো নিয়ে প্রতিদিন আমাকে ভীষণ ভয় দেখাচ্ছে। হয় ওকে অণুশ্রীর কাছে নিয়ে চলো, না হলে অণুশ্রীর স্বামী ছবিগুলো পাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি ভীষণ মুষড়ে পড়েছি। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। কেউ আমার সঙ্গে নেই, কার কাছে যাবো? কাকে বিশ্বাস করে পরামর্শ নেবো? নিরুপায় হয়ে একদিন দুপুরে সরস্বতীর ওখানে ব্যাপারটা তুললাম। সরস্বতী আগেই আন্দাজ করেছে, কিছু একটা হাঙ্গামায় পড়েছি আমি। কিন্তু নিজের ব্যাপারেই ওরা ভীষণ জড়িয়ে রয়েছে, ওরা অন্যের কথা ভাববে কী করে?

সরস্বতী বললো, "তুমি ভেবো না। ডেঁপোমি বন্ধ রেখে পড়াশোনা চালাও। ওই বন্ধুটাকে আমার এখানে নিয়ে এসো একদিন, সব ঠিক করে দিচ্ছি। ওই ছোঁড়াটাকে বোলো, সরস্বতী ওকে দেখতে চেয়েছে। সরস্বতী ওকে চায়।"

গোবিন্দ আচার্য তো ভীষণ উত্তেজিত। সরস্বতী নিজে আগ্রহ দেখিয়েছে তার বর্ণনা শুনে! এক টুকরো কাগজে আবার লিখে

পাঠিয়েছে, আসতে হবে। গোবিন্দ আচার্য সঙ্গে-সঙ্গে রাজী।

এর পরের ব্যাপারটা গল্পের মতন শংকরদা। গোবিন্দকে পেয়ে সরস্বতী আদর-আপ্যায়ন শুরু করলো। আমাকে বললো, "কী দাঁড়িয়ে দেখছো? একটু বাইরে যাও।" গোবিন্দ আচার্য হাতে চাঁদ পেয়েছে। আমার ক্যামেরাটা কিন্তু আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। সরস্বতীর ঘরে গোবিন্দকে বসিয়ে আমি বাইরে একটু অপেক্ষা করছি, সেই সময় সরস্বতীর জানাশোনা ও-বাড়ির একটা লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে গোবিন্দ ও সরস্বতীর অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ফেললো। সরস্বতীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। সরস্বতীর উষ্ণ শরীরে তখন কোনো আচ্ছাদন নেই। আর গোবিন্দ আচার্যর অবস্থা বুঝতেই পারছেন।

ব্যাপারটা যে আদৌ আষাঢ়ে গল্প নয় তা আমি ছাড়া কেউ জানলো না। গোবিন্দ আচার্যর ওই প্রথম অভিসার। অনাবৃত শরীর আবৃত করতে-করতে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। বিবস্ত্রা সরস্বতী তাকে শান্ত করলো, কিছু ভয় নেই। আমি ক্যামেরা ধরে বসে আছি। আপনি লক্ষ্মীটি ওই অণুশ্রীর ছবিগুলো ফেরত দিন। গোবিন্দ আচার্য ট্যাক্সি করে বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বমাল ফিরে এলো।

খুব বকুনি দিয়েছিল সরস্বতী আমাকে—"ছিঃ, ঘরের বউকে কখনও বিপদে ফেলতে আছে? যত রাজ্যের নোংরামির জন্যে, দুষ্টুমির জন্যে আমরা তো রয়েছি।"

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। নিজে ঝুঁকি নিয়ে কেউ এইভাবে একজন অকালপক্ক ছেলের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। আমি বেঁচে গেলাম। আমি সরস্বতীকে তখনই বলেছিলাম, "আমি কিন্তু বেশ কিছুদিন আসবো না। আমি বাইরে যাচ্ছি।"

সরস্বতী বলেছিল, "তুমি না এলেও আমাদের চলে যাবে। বিদেশে আবার যেন কোনো মেয়ের সঙ্গে জোড়া ছবি তুলে বোসো না!"

আমি কিন্তু বলেছিলাম, "ক্যামেরাটা আমি ভেঙে ফেলবো।"

সরস্বতী রসিকতা করেছিল, "ভেঙো না, আমার যে-সতীন ওটা

তোমাকে উপহার দিয়েছিল তাকে ফেরৎ দিও।"

মার খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে হাসপাতালে না পড়ে থেকে, অণুশ্রী বউদির ব্যাপারে চরম বদনামে না জড়িয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত আমি যে সসম্মানে বিদেশে যেতে পারলাম এর পিছনে তা হলে আর একজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে, শংকরদা। [illegible]ন সায়েবের দয়া, আমার মায়ের গহনা ও সরস্বতীর বন্ধুত্ব এই [illegible] স্তম্ভের ওপর আমার আজকের এই প্রবাস জীবনটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওই যে অশৌচের বেশে ওই পাড়ায় ঘুরছিলাম, কোনো খারাপ মতলবে নয়, সরস্বতীকে মায়ের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করবো বলে। কিন্তু বাড়িটাই খুঁজে পাওয়া গেলো না।

হাড়কাটা গলির মুখের বেনারসী পানওয়ালা বললো, "আপনি খবর রাখেন না? এখানে একটা খুব পুরনো বাড়ি ছিল, সেবার বর্ষায় গভীর রাতে কিছুটা ভেঙে পড়লো। তারপর কর্পোরেশনের লোকরা এসে বাকি যতটুকু দাঁড়িয়ে ছিল তা ভেঙে দিতে বাধ্য হলো যাতে ফূর্তি করতে এসে লোকে ওখানে চাপা না পড়ে। ভাঙাভাঙির পরে কোঠাবাড়ির মালিক এসে উঁচু পাঁচিল তুলে জায়গা ঘিরে রেখেছে। ঐ দেখুন না। হয়তো ফ্ল্যাটবাড়ি তুলবে।"

দরজায়-দরজায় ঘুরে আমি সরস্বতীকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আপনার তো অনেক জানাশোনা আছে কলকাতা শহরে। যদি পুলিশ-টুলিশ কারও সাহায্যে ওকে খুঁজে বের করতে পারেন আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, শংকরদা। সরস্বতীকে আমি বলতে চাই,"ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে এসো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো—মেয়ে হিসেবে মুক্তির স্বাদ নাও নতুন এই দেশে।"

শংকরদা, প্লিজ, আপনি আবার ওই অনুরাধার প্রসঙ্গ তুলবেন না। আমার অতীত জীবন কতটা নোংরা হয়ে রয়েছে তা ওর বোধ হয় না জানাই ভাল। হারুকাকু আমাদের উপকার করেছেন অনেক, আমি ওঁর মেয়ের ক্ষতি করবো না। অনুরাধা নিজের মতন থাকুক, নিজের

ইচ্ছে মতন নিজেকে বিকশিত করুক। আপনি সম্ভব হলে ওকে বলে দেবেন, আমি মানুষটা সুবিধের নই, আমার অতীতটা মোটেই ভাল নয়। আমার সঙ্গে বেশী জড়িয়ে পড়াটা ওর মতন মেয়ের পক্ষে নিরাপদ হবে না।

আর আমি? ছোটবেলায় একলা থাকতে আমার খুব ভয় করতো। এখন এদেশে অন্য ব্যাপার। অসংখ্য প্রলোভন সত্ত্বেও যে-দেশে প্রতি চারজন মানুষের মধ্যে একজন একলা থাকবে বলে ঠিক করেছে সে-দেশে আমি কেন নিঃসঙ্গতাকে ভয় পাবো? বলুন? মুক্তির স্বাদ পেলে একলা থাকাটা যে কিছুই নয়, তা তো এদেশের কোটি কোটি মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আপনি আমার ভালবাসা জানবেন, ইতি—

সুশোভন বাগচী।

লেখকের নিবেদন

বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে ওলাবিবিতলা সেকেণ্ড বাই লেনে অপরেশ বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাগচী মশাই বললেন, "আমার ছেলেকে দেখলেন তো? কেমন লাগলো? একেবারে হীরের টুকরো নয়?" আমি অবশ্যই একমত হলাম।

তারও এক মাস পরে দুঃসংবাদ পেয়েছিলাম—সুশোভন বাগচী মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। একলা মত্ত অবস্থায় গভীর রাতে আমেরিকার রাজপথে সে যখন গাড়ি চালাচ্ছিল তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল।

এই পথ দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগেই সুশোভন বিমান ডাকযোগে আমাকে 'বাঙালী জীবনে রমণী' বইটা, তার নিজের কণ্ঠস্বরের কয়েকটা ক্যাসেটও কিছু ব্যক্তিগত কাগজ পাঠিয়েছিল।